বাঙ্গালা সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড

(অনুবাদ-সাহিত্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম, এ,
প্রণীত

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—৮৲ টাকা

প্রকাশক—শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪৬

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—রামায়ণ [১—২৪০ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহাভারত [১—১৫৭ পৃঃ]

তৃতীয় অধ্যায়—ভাগবত [১৫৮—৩৫৮ পৃঃ]

বাঙ্গালা সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড



অনুবাদ-সাহিত্য

প্রবেশিকা

সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে সংস্কৃতের প্রভাব অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত সাধারণের নিকট সহজবোধ্য নহে, ইহার মধুরতা আছে বটে, এবং নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ব্যতীতও এই ভাষায় রচিত কাব্য-নাটকাদির অভাব নাই, তথাপি ইহাতে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন না করিলে তাহা কিছুই উপভোগ করা যায় না, আর এইরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করাও সুযোগ ও শক্তির অভাবে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব সাধারণ লোকের ইহার প্রতি আকর্ষণের কারণ না থাকিলেও প্রয়োজন-বোধে ইহার সমাদর হ্রাস হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষ এক বিস্তীর্ণ মহাদেশ স্বরূপ। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ইহার প্রদেশসমূহে নানাপ্রকার ভাষা নিজস্ব বিশিষ্টতার দরুণ বিভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়া থাকে। এইজন্য এক প্রদেশের ভাষা অপর প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে সহজবোধ্য হয় না। ইহা ব্যতীত লিপির বিভিন্নতাও লক্ষ্যনীয়। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এবং বঙ্গলিপিতে লিখিত কোন গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কোন ভাষায় এবং লিপিতে পরিবর্ত্তিত না হইলে তদ্দেশ-বাসিগণের পক্ষে ইহা পাঠ করাই সম্ভবপর নহে। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থও সেইরূপ বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত না হইলে বঙ্গবাসিগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন না। এইজন্য ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বকালেই সকল প্রদেশের ব্যবহারযোগ্য এক ভাষা ও লিপির প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও ইহার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করি। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত জনগণের সম্মুখে কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিলে সকলের বোধগম্য হইতে পারে, ইহা একপ্রকার সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ এখন আমরা ইংরাজীতেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। কিন্তু অতীত যুগেও সাধারণের প্রয়োজন-নির্ব্বাহার্থে ভারতীয় মনীষিগণ এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া বিশেষ বিজ্ঞতার সহিতই ইহার সমাধান করিয়াছিলেন। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম প্রবেশ লাভ করেন তখন তাঁহারা যে ভাষা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমিক পরিবর্ত্তনে সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং ইহা আর্য্যগণের জাতীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ইহাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন। আর্য্যগণের কৃষ্টি ও সভ্যতার সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, আর্য্য বংশধরেরা যেখানে যেভাবেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন স্বীয় কৃষ্টি রক্ষা কল্পে তাঁহারা সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তাঁহাদের কথ্য ভাষার শব্দগুলি যেভাবেই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, তদ্ভব পর্য্যায়েই তাহারা অবস্থান করে। এখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সংস্কৃতের চর্চ্চা প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু না কিছু হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ইহাদের মাতৃমাতামহী স্থানীয়া সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। অতএব সকল ভাষার মূল স্বরূপ সংস্কৃতে গ্রন্থ-রচনা করিলে সকল প্রদেশের লোকের পক্ষেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। এই জন্য বিভিন্ন প্রদেশের কবি ও দার্শনিকগণ সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার প্রচার-ক্ষেত্র বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। এখন বাঙ্গালা কি হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহা লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা উভয়েই প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। অতএব ইহাদের যে কোন একটিকে এই উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত করিলে তাহাতে সমগ্র ভারতের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে না। ভারতীয় মনীষিগণ পূর্ব্বকালে (যখন এই সকল ভাষারও উৎপত্তি হয় নাই) সংস্কৃতকে

"দেবভাষা" রূপে মনোনীত করিয়া প্রভূত দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, আর ইহা লিখিবার জন্য যে লিপি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা এখনও সকল প্রদেশে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে দুইটি শক্তিশালী ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ পালি ও প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল, এবং মহারাজ অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলি একপ্রকার পালিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারাও দেবভাষার প্রভাব প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, কারণ সংস্কৃতকে ভিত্তি করিয়াই ঐ সকল ভাষা লিখিত ও পঠিত হইত। অতএব রাজকীয় সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ দ্বারা সংস্কৃতের প্রভাব প্রকারান্তরে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে, অনেক বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের মহাবস্তু, দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষাতেই প্রচারিত হইয়াছিল। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সংস্কৃতে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে উক্ত দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকেও অবশেষে বাধ্য হইয়া সংস্কৃতের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এই ত গেল অতীত যুগের কথা। ভারতে যখন অহিন্দুগণের আগমন হয় নাই, তখন যে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষাকল্পে হিন্দুস্থানে সংস্কৃতের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আমরা এক সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। বঙ্গদেশে তখন সেনরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গ তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহারা শতাধিক বৎসর স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে এদেশে সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল এখন আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালসেন "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামক গ্রন্থদ্বয়

রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেন নিজেও কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক পদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে (ডাঃ সুশীল দে মহাশয়ের সংস্করণ, ২০২, ২০৬, এবং ২৬০ সং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দ সেই যুগের রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে ধরা যাইতে পারে। গীতগোবিন্দের প্রথম ভাগেই জয়দেব উমাপতি ধর, ধোয়ী প্রভৃতি কবিগণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদের রচিত সংস্কৃত শ্লোক পদ্যাবলীতে সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধের "মৎস্যসূক্ত", "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব", "শৈবসর্ব্বস্ব", "বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব", প্রধান পণ্ডিত পশুপতির "সংস্কারপদ্ধতি", হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশানের "আহ্নিক পদ্ধতি", এবং ধোয়ী কবির "পবনদূত" প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের অমাত্যপুত্র শ্রীধর দাসের "সদুক্তি-কর্ণামৃতে" অনেক কবির সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বল্লাল সেন, লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণের তাম্রশাসন, ও সমসাময়িক শিলালিপি প্রভৃতিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, হিন্দু-রাজত্বের অবসানে এবং মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ কালেও বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ইহার পরে বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণ সংস্কৃতে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। সামাজিক পরিস্থিতির সুযোগ লাভ করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, আবার ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিতুষ্টি সাধনের জন্য হরিশ্চন্দ্র পত্নীপুত্র বিক্রয় করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা প্রচারিত হইবার পরে ধূলিধূসরিত ব্রাহ্মণের

পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া যে হিন্দু নৃপতিগণ কৃতার্থ বোধ করিতেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। গুরু, মন্ত্রী ও উপদেষ্টারূপে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুরাজসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা, ও বুদ্ধির বলে তাঁহারা যে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে সাহায্য করিবার দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাঁহাদের এই প্রাধান্য অব্যাহত থাকিতে পারে নাই। এই নবাগত শাসকগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে তাঁহাদের স্বজাতীয় লোকগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অতএব তখন ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে নবাব দরবারে মৌলবীগণের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এই দুইটি জাতির কৃষ্টির বিভিন্নতার দরুণ পুরাতন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানগণের ধর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি ও ভাষা পৃথক্ হওয়াতে হিন্দুর সনাতন আদর্শের প্রতি তাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। অতএব ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতের প্রভাব রাজদরবারে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে নাই। তথাপি হোসেন সাহের ন্যায় কোন কোন নবাবের সভায় যে রূপসনাতনের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, ব্যক্তিগত কার্য্যদক্ষতার জন্য। ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোকগণও এইভাবে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ ও রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থানীয়। আবার পরাগল খাঁয়ের ন্যায় কোন কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে হিন্দুর কৃষ্টির প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রীতির পরিবর্ত্তে ঔৎসুক্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতিসম্পন্ন আকবর ও দারার ন্যায় ব্যক্তিগণকে বাদ দিলে সংস্কৃত ভাষা যে এই সময়ে উপযুক্তরূপ রাজানুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এইরূপে মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব

খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু রাজত্বে রাজা ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, এবং ব্রাহ্মণগণ সমাজপতি। তাঁহারা বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করিতেন, আর রাজা বা রাজপুরুষগণ তদনুযায়ী শাসন-কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেন। অতএব রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই রাজাকে ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইত। মুসলমান-রাজত্বে ব্রাহ্মণগণের রাজার উপর প্রভুত্ব লোপ পাইলেও সামাজিক প্রতিপত্তি অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং কিছু বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই বিরাট হিন্দু সমাজের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন রাজা। এখন তাঁহার হস্ত হইতে রাজদণ্ড বিচ্যুত হওয়াতে জনসাধারণকে এই দুর্দ্দিনে ব্রাহ্মণের উপদেশের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল, কারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষায় তাঁহারাই ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয়। অতএব সমাজের শাসন, রক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব এখন তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে সমাজের অঙ্গহানি হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ইহাতে আমরা অনেক হারাইয়াছি বটে, কিন্তু অপরপক্ষে ইহারই ফলে ব্রাহ্মণগণ অন্ততঃ একটা কাঠামো রক্ষা করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

সে যাহাই হউক, বিদ্যা সকল অবস্থাতেই শ্লাঘনীয়, কিন্তু অর্থকরী হইলেই ইহার উপার্জ্জনে লোকে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। বিদেশী শাসনের আমলে বিজাতীয় ভাষার সমাদরই বর্দ্ধিত হয়। মুসলমান-রাজত্বে সংস্কৃত বিদ্যায় রাজদ্বারে অর্থাগমের সম্ভাবনা যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, ততই ইহার প্রসারতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। তৎপরিবর্ত্তে যখন বিদেশী ভাষার প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন এই বিজাতীয় ভাষার চর্চ্চা আর সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। যে শক্তিশালী সে ইহা আয়ত্ত

করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে লাগিল। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই এই সুযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। এইভাবে অতীতের কঠোরতা অতিক্রম করিয়া দেশবাসিগণ মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গভাষা স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিবার সুযোগ লাভ করে।

প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার জন্য লোকে বিদেশীভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। আধ্যাত্মিকতা এদেশবাসিগণের এক স্বাভাবিক বিশেষত্ব। হিন্দুগণের যাবতীয় ধর্ম্মপুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। যাঁহারা অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামের চরিতাদি ভাষায় শ্রবণকারিগণের জন্য রৌরব-নরকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখন রাজদরবারে তাঁহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে বিদেশী-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যতই এই নূতন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল, ততই তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীন প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অতএব বৈষয়িক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্যবিধ অভাব স্বাধীনভাবে মোচনের জন্যও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। তাহারা দেখিতে পাইতেছিল যে, সংস্কৃত ব্যতীতও অন্য এক বিদেশী ভাষায় যাবতীয় কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ মুসলমানগণ রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য সহকারী ভাষারূপে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন দলিলাদিতে ফার্সির সহিত বাঙ্গালা অনুবাদও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে হিন্দুগণের মনে মাতৃভাষার প্রবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহারই ফলে পুরাণাদির অনুবাদের প্রেরণা প্রথমতঃ তাহারা লাভ করিয়া থাকিবে।

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে নানাভাবেই অনুবাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির বেদে অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কার্য্য হিন্দুদিগকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই সম্পন্ন করিতে হইত। বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে দেবভাষা প্রয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অনেক সময়ে

পুরোহিত মহাশয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিতেন। কবিরাজ মহাশয় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। এইভাবে সাধারণ লোকেও সংস্কৃত ও তাহার অনুবাদের সহিত একেবারে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু যখন বৈদেশিক শাসনকালে নানাভাবেই পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তখন বাঙ্গালা-অনুবাদে এই সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভেরও প্রবৃত্তি লোকের মনে জাগরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে লোকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য প্রথম আবির্ভূত হইল কথকতা। ইহাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অনুবাদের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি। ভাগবতাদি পুরাণ পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। লোকে পরিতৃপ্তির সহিত ইহার রসাস্বাদন করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যখন তাহারা আর পরের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। ইহারাই ফলে রামায়ণাদি পুরাণের বিষয়ানুবাদের প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদক বটেন, কিন্তু মহাভারতের আদি অনুবাদক সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী বোধ হয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না; আর ভাগবতের আদি অনুবাদক মালাধর বসু ছিলেন কায়স্থ। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা বিদেশী শাসনের ফলে সংঘটিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বঙ্গদেশে বিদেশী-শাসন প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে, আর ভাগবতাদির অনুবাদ আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে অনুবাদের যুগে পৌছিতে প্রায় তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।[১] বিদেশী শাসনের প্রথম যুগে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।

১। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"The shock of the Muhamedan conquest paralysed Eastern India from which it

অনুবাদ-সাহিত্যেও স্তর-বিভাগ লক্ষিত হয়। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবন গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। অতএব ইহাদের প্রতিই লোকের আকর্ষণ প্রথমতঃ পতিত হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য এই যুগের প্রারম্ভে রামায়ণ, মহাভারত, ও ভাগবতের অনুবাদের প্রতিই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল অনুবাদও আবার বিশিষ্টতা সমন্বিত। তখন পুরাণের গল্পাংশ শ্রবণ করিতে পারিলেই লোকের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইত। অতএব সেই প্রাথমিক যুগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদের কোনই প্রয়োজন ছিল না। এইজন্য প্রাচীন কথকতার আদর্শে তখন গল্পাংশের অনুবাদেরই প্রচলন হইয়াছিল। বাল্মীকির রামায়ণ, বা ব্যাসদেবের মহাভারত ও ভাগবতের ন্যায় এক একটি গ্রন্থকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই কবিগণ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ সেই প্রাথমিক যুগে ইহার বেশী লোকের প্রয়োজনের পক্ষে আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির গ্রন্থ বহির্ভূত অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণ হইতে এই সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়া পরবর্ত্তীকালে গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। এই ভাবে বিভিন্ন পুরাণ-বর্ণিত রামায়ণের আখ্যায়িকা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন ইহাকে রাম-চরিত সম্বন্ধীয় এক মহাকোষে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়েও ভাগবত বহির্ভূত দানলীলাদি ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রাচীন পুথিগুলি পাঠ করিলেই এই সকল লীলা কিরূপে ধীরে ধীরে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ অধুনা প্রচলিত রামায়ণাদি গ্রন্থ এক একটি মহাকোষ বিশেষ। ইহা পাঠ করিলেই সর্ব্ব পুরাণ পাঠের ফল

never recovered entirely. The blow stunned literature, prevented its growth during the first two centuries after the conquest, and a partial revival was made only in the 15th century." (The Origin of the Bengali Script, Introduction, p. 3).

লাভ হয়। আবার দেখা যাইতেছে যে, পুরাণের অনুবাদ আরম্ভ হইবার পরে কাব্য গ্রন্থাদির অনুবাদে কবিগণ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কারণ মালাধর বসু বা কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কোন কবির রচিত এই জাতীয় গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ অত্যধিক লোকপ্রিয়তা হেতু আদর্শ স্থানীয় রামায়ণ মহাভারতাদির অনুবাদের পরেই কল্পনা-বিলাসের প্রতীকস্বরূপ কাব্যাদির প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করিবার পরেই বিলাসিতার প্রতি লোকের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদে কোন প্রাচীন কবিই হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাঙ্গালীগণ অত্যধিক ভাবপ্রবণ বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, তথাপি কোন প্রাচীন কবি মেঘদূতের ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক, এবং রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধবাদি গ্রন্থের অনুবাদেই পরবর্ত্তীকালে সাহিত্যের এই শাখা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। চৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে কবিগণ এই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ইহা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে আরম্ভ হইতে পারে নাই। সে যাহাই হউক, এই জাতীয় অনুবাদগ্রন্থ দ্বারা যে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনুবাদের প্রকারভেদও লক্ষিত হয়।

ভাষান্তরিত করিয়া এক গ্রন্থ অবলম্বনে অপর গ্রন্থ রচনাকে অনুবাদ বলে। ইহা প্রধানতঃ ত্রিবিধ—১। আক্ষরিক অনুবাদ; ২। ভাবানুবাদ; এবং ৩। বিষয়ানুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদে আদর্শের শব্দ-সম্পদ্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রায় সমপরিসরে ভাষান্তরিত করিতে হয়। প্রাচীন রচনায় ইহার নিদর্শন স্বরূপ কৈলাস বসু কৃত অদ্ভুত রামায়ণের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

আদর্শ গ্রন্থে আছে—

আরণ্যানাং মুনীনাং বৈ স্তোকং স্তোকঞ্চ শোণিতম্
কলসাপূরিতং ভক্ষেদ্রাক্ষসী যা চ কামতঃ।
তস্যা গর্ভে ভবিষ্যামি তচ্ছোণিত-সমুদ্ভবা॥

কবি ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

অরণ্যনিবাসী যত ঋষী মুনিগণ।
তাঁদের শোণিতে হবে কলসী পূরণ॥
কামনা করিয়া কোন যেই নিশাচরী।
ভক্ষণ করিবে তাহা বিষজ্ঞান করি॥
সেই ত শোণিতে আমি উদ্ভব হইয়া।
জনম লভিব রাক্ষসীর গর্ভে গিয়া॥

বর্ত্তমান যুগে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণে, নবীন দাসের কিরাতার্জ্জুনীয়ের ও রঘুবংশের অনুবাদে, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শকুন্তলাদির অনুবাদে লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঁহাদের রচনার নমুনা এখানে উদ্ধৃত হইল। রামায়ণের—

মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপঙ্ক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য॥

(কিষ্কিন্ধ্যা, ২৮।২৩)

শ্লোকের অনুবাদে রাজকৃষ্ণ রায় লিখিয়াছেন—

বকশ্রেণী ঘনমেঘে আসক্তি আবেশে।
সানন্দে উড্ডীন হ'য়ে বিশাল আকাশে॥
পবনচালিত পদ্মমালার মতন।
শোভা পাইতেছে কিবা, দেখ, রে লক্ষ্মণ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়ের—

ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপচারচক্ষুষো
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ॥

(১।৪)

শ্লোকের অনুবাদে নবীনচন্দ্রদাস মহাশয় লিখিয়াছেন—

চর নৃপতির চক্ষুঃ, তাই ভৃত্যগণ
কার্য্যে রত হয়ে নাহি বঞ্চিবে রাজায়।
ক্ষম, প্রভু, মম প্রিয় অপ্রিয় বচন
হিত মনোহর বাক্য দুর্লভ ধরায় ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও প্রভূত দক্ষতার সহিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। শকুন্তলার পত্র-প্রেরণ উপলক্ষে লিখিত আছে—

তুজ্‌ঝ ণ আণে হিঅঅং, মম উণ মঅণো দিবাপি রত্তিংপি।
নিক্কিব ! দাবই বলিঅং তুঅ হৃত্থমনোরহাই অঙ্গাইম্ ॥

(৩৫৫)

এই শ্লোকটির তিনি এইভাবে অনুবাদ করিয়াছেন—

না জানি, নিদয় ! তোমার হৃদয়
—কি তার ভাব-তরঙ্গ।
এ হৃদি তোমায় নিশিদিন চায়
অনঙ্গে তাপিত অঙ্গ ॥

ভাবানুবাদঃ—আদর্শের ভাব গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে তাহা প্রকাশ করার নাম ভাবানুবাদ। সাধারণতঃ ইহাতে মূলের মর্ম্মার্থই ব্যাঘাত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

আদর্শের—

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো।
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

শ্লোকের ভাবানুবাদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তোমার দর্শন-বিনে অধন্য এই রাত্রি-দিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণাসিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব চাপল মন হইল চঞ্চল
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায়॥

(মধ্যের দ্বিতীয়ে)

প্রকৃতপক্ষে কোন তত্ত্বপূর্ণ ভাবগভীর বিষয়ের অর্থ প্রকাশেই এই জাতীয় অনুবাদের সার্থকতা লক্ষিত হয়। মূলের শব্দ-সম্পদের নিদর্শন ইহাতে থাকে বটে, কিন্তু কবি ভাবার্থ প্রকাশের জন্য ইহাতে স্বাধীনভাবে স্বীয় রচনাও সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই জাতীয় আর একটি পদও এখানে উদ্ধৃত হইল। চিত্রপটে অঙ্কিত কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি অবলোকনে রাধার বিরহাবস্থার বর্ণনায় বিদগ্ধমাধবে আছে—

শিশিরয়দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতেঃ
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাস্থং বিলাসফলকাঙ্কিতঃ।
শিব শিব কথং জানীমস্ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনং॥

(ঐ, বহরমপুর সং, ১০৫ পৃঃ)

ইহারই ভাবানুবাদে লিখিত হইয়াছে—

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি, হরি, এমন কেনে বা হ'ল।
বিষম বাড়ব- অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়সে কিশোর অতি মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
অমিয়া রসের কূপ॥
নিজ পরিজন সে জন আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে না পারি ছাড়িতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলে রাজার ঝি॥

বিষয়ানুবাদ ঃ—আদর্শে বর্ণিত বিষয়ের সার সঙ্কলিত করিয়া স্বাধীনভাবে তাহা প্রকাশিত করাকে বিষয়ানুবাদ বলে। এই জাতীয় রচনায় অনুবাদকের পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিবার সুযোগ রহিয়াছে, কারণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘটনাগুলি নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে হয়। ইহাতে মূলানুরূপ শব্দ-ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও আদর্শের প্রভাব অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া মধ্যে মধ্যে শব্দ-সমন্বয় সংঘটিত করে। কৃত্তিবাসের রচনা হইতে

এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্কলিত হইল। লাঞ্ছিত হইয়া বিভীষণ রাবণকে বলিয়াছেন—

প্রিয়বাদী জন রাজা সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ ॥

(বঙ্গবাসী সং, ২১৭ পৃঃ)।

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণকে উপদেশ প্রদানের কালে মারীচ বলিয়াছিল—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥

(৩।৩৭।২)

ইহারই আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া কবি মারীচের উপদেশ বিভীষণের মুখে প্রদান করিয়াছেন। অন্যত্র রামের আক্ষেপ বর্ণনায় কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥

(বঙ্গবাসী সং, ১৬৮ পৃঃ)

কিন্তু আদর্শে আছে—

নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥

(৪।২৮।::)

কৃত্তিবাস এই উপমায় রাবণের স্থলে রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ানুবাদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা ভিন্ন উপাদানে গঠিত আদর্শের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুবাদে এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। বর্ণিত বিষয়ের সার মর্ম্ম কবিগণ নিজের ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তবে মধ্যে মধ্যে যে তাহাতে আদর্শের ছায়াও প্রতিফলিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। অন্য ভাষায় বিরচিত গ্রন্থের আস্বাদন আমরা অনুবাদের সাহায্যে লাভ করিতে পারি। ইংরাজ কবিগণের প্রতিভায় ইংরাজী সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিলেও অনুবাদ-গ্রন্থের প্রাচুর্য্য হেতু ইহার সম্পদ্ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সম্বন্ধে এখন ইংরাজী ভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। এইরূপে অনুবাদের বহুল প্রচারে জ্ঞান-বৃদ্ধির পন্থা সুগম হইয়া থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সূতিকা গৃহেই আমরা এই অনুবাদের সন্ধান লাভ করিতেছি। ইহারই প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য উত্তরাধিকার সূত্রে সংস্কৃতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে অপরিমিত সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া এখন আমরা ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর পরিমিত সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগ আখ্যায় অভিহিত করা হইলেও রামায়ণাদি গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থগুলিরও উল্লেখ করা আমরা সঙ্গত মনে করি। ইহার কারণ এই যে, অনুবাদের যে প্রাচীন ধারা পঞ্চবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌছিয়াও তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ১৮০০ সাল হইতে অনুবাদের সাহায্যে গদ্য সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। আর ইহার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অনুবাদের সাহায্যেই পদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগণ প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই নব জাগরণে পদ্য সাহিত্যও নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তথাপি প্রাচীন রীতি লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন যুগের শেষ কবি আখ্যায় অভিহিত ঈশ্বর গুপ্তের পরেও অনেকে রামায়ণের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগকেই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগের শেষ কবি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থ

অবলম্বনেই অনুবাদ-যুগের প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে মহাকাব্যের নামকরণে "এপিক" শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রথমেই ইহাদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আলোচনা আমরা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

পাশ্চাত্যমতে এপিক

এপিকের উপাদান

মানব সমাজের ক্রমোন্নতির স্তর নির্দ্দেশ করিবার কালে কল্পনা করিতে পারা যায় যে, আদিম মানব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া বাস করিত। এই সকল ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পরস্পর মিলিত হইয়া এক একটি দলের, এবং এইরূপ বহু দলের সমবায়ে পরবর্ত্তীকালে এক একটি জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার কালে মানবগণ আত্মরক্ষার্থে নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী বিবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। দলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ সকল বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইত, আর ইহার সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই কঠোর শাস্তি ভোগ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।[১] এইজন্য সেই সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই ছিল তাহার দলের প্রতীক মাত্র।[২] এই পরিস্থিতি এখনও তথাকথিত অসভ্যদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপ অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ পরস্পর বিরোধী দলের যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ব্যক্তি-বিশেষের নিপুণতা প্রদর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইয়া

১। That existence, indeed, would find in the assertion of private individuality a serious danger ; and tribal organisation guards against this so efficiently that it is doubtless impossible, so long as there is no interruption from outside. (The Epic by L. Abercrombie, p. 9).

২। Each person is the tribe in little (Ibid).

থাকে। তখন যে ব্যক্তিত্ব সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার কঠোরতার দরুণ পূর্ব্বে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, তাহাই সুপ্রকাশিত হইয়া সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করে, এবং এই ভাবে সমাজের আদিম অবস্থা হইতেই সুগঠিত সমাজ নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় (রামায়ণে এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়) বীরত্বের যুগের (Heroic Age) আবির্ভাব হয়।[১] যাঁহারা এইভাবে শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া জাতির মঙ্গল সাধন করেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রথমতঃ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, পরে ভাটগণ তাহা অবলম্বন করিয়া গাথা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল গাথা সম্ভবতঃ উক্ত বীরগণের আত্মীয়স্বজনের তৃপ্তির জন্যই প্রথমতঃ গীত হইত। আমাদের দেশের ভাট ও রায়বারগণ এই পর্য্যায়ভুক্ত। এদেশেও পূর্ব্বে বিবাহাদি ব্যাপারে পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-গাথা কীর্ত্তিত হইত। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে যখন এই সকল বীরত্বের কাহিনী জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়, তখন জাতির অন্তর্ভুক্ত পদস্থ ব্যক্তিগণের সভাতেও ইহা সম্ভ্রমের সহিত গীত হইতে আরম্ভ করে। তখন একই গাথা বহু ভাট কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে, এবং পরে তাহা সাধারণ জনগণের মধ্যেও বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এই অবস্থায় পৌরাণিক ক্ষুদ্র কাহিনী নানাভাবে পল্লবিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহাই এপিক রচনার উপাদান, আর এই সকল উপকরণ সজ্জীভূত করিয়া পরবর্ত্তীকালে শক্তিশালী কবিগণ যে আদর্শীভূত রচনার সৃষ্টি করেন, তাহাই এপিক কবিতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।[২]

১। It seems as if the long-repressed forces of individuality then burst out into exaggerated vehemence. The result is that a people passes from its savage to its heroic age on its way to some permanence of civilisation. (Ibid).

২। It is quite certain, however, that these poems had not merely been preceeded by a vast number of revisions of the mythological history of the country, but were accompanied by innumerable poems of a similar character.

(Epic, Encyclopædia Britannica, Vol. VIII, p. 646).

এপিকের রচনা-রীতি

একটি সম্পূর্ণাবয়ব ঘটনা অবলম্বনে এপিক রচিত হয়, আর ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত্যের মধ্যে ক্রমবিকাশের স্তর এবং পরিণতি নির্দ্দেশিত থাকে।[১] এপিকের গল্প এমন ভাবে বলিতে হইবে যেন ইহা পাঠ করিলেই কবির রচনার নিপুণতা এবং কল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়।[২] ইহার মধ্যে প্রগাঢ়তা এবং ব্যাপকতা উভয়ই থাকা চাই, আর গম্ভীর ওজস্বী ছন্দপ্রবাহ হইবে ইহার অবলম্বন।[৩] এইজন্য কবির রচনায় যৌগিক শব্দের প্রয়োগ, অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার (মাইকেলের রচনা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে), এবং উপমাদি অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য অতীব প্রয়োজনীয়।[৪] প্রকৃতপক্ষে শব্দ-বিন্যাস-প্রণালীর উপরেই এপিকের সজীবতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, এবং সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা ইহারই স্পর্শ অনুভব করি।[৫] এইজন্য কবিকে কল্পনাকুশল, এবং শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা উভয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ের

The matter of the authentic epic is usually traced to the earlier lays and ballads of the race from which it springs. (English Epic and Heroic Poetry, by W. M. Dixon, p. 71).

১। A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. Aristotles' Poetics, translated by S. H. Butcher, p. 31.

Also—It (Epic poetry) should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle, and an end. (Ibid p. 89)

২। It must be a story, and the story must be told well and greatly. (Epic by Abercrombie, p. 52).

৩। It will tell its tale both largely and intensely, and the diction will be carried on the volume of a powerful flowing metre. (Ibid, p. 61)

৪। Of the various kinds of words, the compounds are best adapted in dithyrambs, rare words to heroic poetry, and metaphors to iambic. In heroic poetry, indeed, all these verieties are serviceable. (Aristotle's Poetic, Ibid, p. 87).

৫। Style is the sign of the poem's spirit, and it is the spirit that we feel; (Epic by Abercrombie, p. 60).

অভাবে এপিকের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কোন কোন কবির কাব্যে এই কারণেই এপিক-প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও মাইকেলের রচনা এপিক পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কল্পনার বিরাটত্বের সহিত প্রকাশ-ভঙ্গীর সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে পাঠকের মনে এপিক-অনুভূতির উদ্রেক হইতে পারে না।[১]

এপিকের অন্যান্য বিশেষত্ব

এপিক চতুর্ব্বিধ—জটিল, সরল, নীতিগর্ভ ও আসক্তিমূলক। জটিলতার সৃষ্টি হয়, যখন ঘটনাবৈচিত্র্যে গল্পাংশের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ইহার পরেই প্রত্যভিজ্ঞান—যে অবস্থায় কবির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের মনে প্রশংসা বা ঘৃণার উদ্রেক করে। জটিল এপিকে ঘটনার বৈপরিত্য এবং প্রত্যভিজ্ঞান উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। যে গল্পাংশে ইহা থাকে না, তাহাই সরল। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত নীতিগর্ভ এপিকের দৃষ্টান্ত। হোমারের ইলিয়ডে অত্যাসক্তির পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে।[২] এপিকের বিষয়-বস্তু বাস্তব জগৎ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। মানব জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত ইহার সংযোগ সংসাধিত না হইলে ইহা অতি কাল্পণিক আরব্যউপন্যাসের গল্পের ন্যায় অলীক প্রতিপন্ন হয়।[৩] যাহা ঘটিতে পারে, কবি এইরূপ সম্ভবতারই বর্ণনা করিতে পারেন, কিন্তু কোন অসম্ভব ঘটনার অবতারণা করিলে তাহাতে এপিকের সংহতি নষ্ট হইয়া যায়।[৪]

১। I use the word "style" of course in its largest sense—the manner of conception as well as manner of composition. (Ibid., p. 51)

২। Epic poetry must have as many kinds as Tragedy. It must be simple or complex, or ethical and pathetic.
(Aristotle's Poetics, Ibid., p. 91).

৩। The prime material of the epic poet, then, must be real, and not invented. It means that the story must be founded deep in the general experience of man. (Abercromcie's Epic, p. 55).

৪। The poet should prefer probable impossibilities to impossible possibilities. (Aristotle's Poetics, p. 95).

এপিকের নায়ক সাধারণতঃ বীর যোদ্ধা হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার বীরত্ব কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়।[১] এপিক যেমন বিরাট, তাহার নায়কেরও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে মহনীয় হওয়া উচিত, এইজন্য সাধারণতঃ কোন বিখ্যাত রাজবংশের আখ্যায়িকা অবলম্বনেই এপিক রচিত হইয়া থাকে।[২] এপিকে এমন কিছু সংঘটিত হয় না, যাহার কোন গুরুত্ব নাই। সমগ্র কাব্য-প্রবাহের অন্তরালে জীবন-পরিণতি সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। ইহাই কাব্যের বিশিষ্টতা, এবং ইহা দ্বারাই কাব্যের অগ্রসর গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।[৩] এপিকে নরক-বর্ণনা, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন দেবতাগণের আবির্ভাবও সূচিত হয়।[৪] এই ভাবে মর্ত্ত্যের ঘটনার সহিত দেবতাগণের সংযোগ সাধন করিয়া কবিগণ এপিকের বিরাটত্বের সংস্থান করিয়া থাকেন।

প্রাচ্যমতে মহাকাব্য

প্রাচ্য মতে এপিকের নামকরণ হইয়াছে মহাকাব্য। ইহার লক্ষণ নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্।
আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বা। অতএব প্রা…

১। The epic hero is always a fighter, a soldier in some good cause. (English Epic and Heroic Poetry, p. 71).

২। Epic in all ages and at all stages of culture reflects the life and manners, the tastes and pursuits of the ruling class. (Ibid. p, 166).

Also —A story weighted with the epic purpose could not proceed at all unless it were expressed in persons big enough to support it. The subject, then, as the epic poet uses it, will obviously be an important one. (Abercrombie's Epic, p. 63-64).

৩। They (the epics) take us into a region in which nothing happens that is not deeply significant ; a dominant, noticeably symbolic, purpose presides over each poem, moulds it greatly and informs it throughout. (Abercrombie's Epic, p. 52).

৪। Other things which epics have been required to contain are a

ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্।
চতুর্ব্বর্গফলোপেতং চতুরোদাত্তনায়কম্॥
নগরার্ণবশৈলর্ত্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ।
উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ॥
বিপ্রলম্ভৈর্বিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ।
মন্ত্রদূতপ্রযাণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈরপি॥
অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাব নিরন্তরম্।
সর্গৈরনতিবিস্তীর্ণৈঃ শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ॥
সর্ব্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরুপেতং লোকরঞ্জকম্।
কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়তে সদলঙ্কৃতি॥ কাব্যাদর্শ।

অর্থাৎ—বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত হইয়া মহাকাব্য রচিত হয়। ইহার লক্ষণাদি এখানে বিবৃত হইতেছে। আশীর্ব্বাদ, নমস্কার এবং বস্তুনির্দ্দেশ দ্বারা ইহার প্রারম্ভ সূচিত হইবে। কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা অথবা কোনও সত্য ঘটনার বর্ণনা ইহার বিষয়ীভূত হইবে। ক্ষমাবান, অতিগম্ভীর, মহাসত্ত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত চতুর, বি[illegible]য়-বস্তু [illegible]ায়িকার আশ্রয় হইবেন। নগর, সমুদ্র, শৈল, ঋতু, চন্দ্রসূর্য্যের উদ[illegible]ার সহি[illegible]হার, সলিলক্রীড়া, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, পুত্রজন্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বর্ণনায় গ্রন্থের বিরাটত্ব সূচিত হইবে। মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ, নায়কের শত্রুপরাজয় প্রভৃতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অলঙ্কার-সমন্বিত, অসংক্ষিপ্ত রচনায় শৃঙ্গার, বীর, শান্তরসের একটিকে প্রধান করিয়া অন্যান্য রসকে তাহার অনুগামী করিতে হইবে। মাধুর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন শ্রুতি-সুখদ ছন্দে রচনাপরম্পরায় সংযোগ রক্ষা করিয়া গ্রন্থ রচিত হইবে। প্রত্যেক সর্গের শেষে নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইবে, এবং পরবর্ত্তী সর্গের সূচনা থাকিবে। উপমারূপকাদি অলঙ্কার-ভূষিত এইরূপ কাব্য কল্পান্তস্থায়ী হয়।

---

descent into hell, and some supernatural machinery. It serves the epic purpose to surround the action with immortals, who are not only interested spectators of the event, but one deeply implicated in it. (Abercrombie's epic, pp. 65, 67).

সমন্বয়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন গাথা অবলম্বনে এপিক কবিতা রচিত হইয়া থাকে। এখানেও "ইতিহাসকথোদ্ভূত" উক্তিতে প্রাচীন আখ্যায়িকাই লক্ষিত হইয়াছে। রামায়ণ যে এইরূপ প্রাচীনগাথা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী আলোচনায় বিবৃত হইবে। চতুরোদাত্ত নায়কের উল্লেখে কাব্যের আশ্রয়ীভূত মহৎ নায়কই লক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ নায়ক অবলম্বন করিয়াই এপিক রচিত হইয়া থাকে। "শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ" উক্তিতে আখ্যায়িকার আদি, মধ্য ও অন্তের সংযোগ, এবং কবির সুচিন্তিত পরিকল্পনার (Style) সন্ধান পাওয়া যায়। লোকের মনোরঞ্জনকারী যে রচনার (লোকরঞ্জকম্) ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে, তাহাতে বিবিধ অলঙ্কার-সমন্বিত চিত্তাকর্ষক রচনাই বুঝাইয়া থাকে। কল্পান্তর স্থায়ী এই জাতীয় রচনা যে শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং গম্ভীরভাবদ্যোতক হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কেরা সকলেই বীর এবং মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। উক্ত উভয় কাব্যেই জীবনাদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবতারাও ঘটনার পরিণতি-সংঘটনে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পাশ্চাত্য এপিকের সহিত প্রাচ্য মহাকাব্যের গঠনমূলক অনেক সামঞ্জস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল সূত্র অবলম্বনে এখন আমরা রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নারদ বাল্মীকির নিকটে উপস্থিত হইয়া রামচরিত্র অবলম্বনে গ্রন্থ রচনার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, রামের আখ্যায়িকা এই ঘটনা হইতেও প্রাচীনতর। ইহা সম্ভবতঃ প্রাচীন গাথার আকারে আমাদের দেশে প্রচারিত ছিল। বাল্মীকি তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া রাবণ ও বানরগণের আখ্যায়িকার সহিত সমন্বয় সাধন করতঃ এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে প্রধানতঃ তিনটি গাথা একত্র সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রামের কাহিনী, দ্বিতীয়তঃ রাবণের কাহিনী, তৃতীয়তঃ বানরগণের কাহিনী। বাল্মীকি যখন গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহার

পূর্ব্বেই রাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আর রাবণ ও বানরগণের আখ্যায়িকা রামের গাথা হইতেও প্রাচীনতর। বাল্মীকি সুকৌশলে এই তিনটি গাথা সংযোজিত করিয়া তাঁহার অমর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। উত্তর ভারতে রামের কাহিনী যেভাবে প্রচারিত ছিল, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে দশরথ-জাতক হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।[১] দশরথ ছিলেন অযোধ্যার রাজা। তাঁহার অনেক মহিষী ছিল। তন্মধ্যে প্রধানা মহিষীর গর্ভে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা জন্মগ্রহণ করেন। রামের মাতার মৃত্যু হইলে দশরথ অন্য এক পত্নীকে প্রধানা মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর তাঁহার গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। অত্যধিক অনুরক্তি বশতঃ দশরথ ভরতের মাতাকে একটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ভরতের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে রাজা করিবার প্রার্থনা করেন। ইহাতে ভীত হইয়া দশরথ রামাদিকে আত্মরক্ষার্থে বার বৎসরের জন্য বনে গমন করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা হিমালয়ের পাদদেশে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার নয় বৎসর পরে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন ভরতকে রাজা করিবার প্রস্তাব উত্থিত হইলে মন্ত্রীগণ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কারণ রামই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ভরত নহেন। ভরতও এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করেন, কিন্তু পিতার নির্দ্দেশিত বার বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অসম্মত হন। তখন রামের পাদুকা সহ লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া ভরত অযোধ্যায় চলিয়া আসেন। বার বৎসর পরে রাম আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন সীতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই আখ্যায়িকায় রাম-রাবণের যুদ্ধের কোন প্রসঙ্গই নাই। শাক্যবংশে ভগ্নী বিবাহের প্রথা বর্ত্তমান ছিল বলিয়া রামের সহিত সীতার বিবাহের পরিকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে।

১। পরবর্ত্তী অংশ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের Bengali Ramayanas হইতে সঙ্কলিত।

দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কাহিনীতে রাক্ষস ও বানরগণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মহাযানী সম্প্রদায়ের লঙ্কাবতার সূত্রে বুদ্ধদেবের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে আলোচনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে রাবণকে অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ রাবণের মৃত্যুতেও বিভীষণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

ধার্ম্মিকগণের সেতু ভগ্ন হয়ে গেল।
ধর্ম্মের স্বরূপ নষ্ট আজি গো হইল॥
বেদবেদান্তেতে এঁর ছিল অধিকার।
মহাতপা ছিলা ইনি পৃথিবী মাঝার॥
অগ্নিহোত্র আদি কার্য্য করিতেন ইনি।
ধর্ম্ম কর্ম্মে খ্যাত ইনি সমস্ত মেদিনী॥

(যুদ্ধকাণ্ড. ১৫২ পৃঃ ; রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ)।

কিন্তু বাল্মীকি রাবণকে সাধারণতঃ পাপাচারী করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। যাহাই হউক, উক্ত লঙ্কাবতার সূত্রে রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণের, এবং পুষ্পক রথেরও উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণ নাই। হেমচন্দ্রের জৈন রামায়ণে রাক্ষস ও বানরগণের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে, কিন্তু রামের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রাবণের পিতা রত্নশ্রবা (রামায়ণে বিশ্রবা), মাতা কৈকসা, ভগ্নী চন্দ্রনখা (রামায়ণে সূর্পনখা) এবং ভাই বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে রাবণের কঠোর তপস্যার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারই প্রতিধ্বনি বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মিলিয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ রামায়ণের পরে রচিত হইলেও রাবণের ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রসিদ্ধি যে দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত ছিল, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। এই সকল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি তাঁহার বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রামের আখ্যায়িকার সহিত রাবণ ও বানরগণের কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে এবং মহাকবি ইহাতে এক নৈতিক মহনীয় আদর্শও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাম ধর্ম্মাত্মা এবং রাক্ষসগণ পাপাচারী এই আদর্শ

গ্রহণ করিয়া সমগ্র রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ইহাতে বাল্মীকি যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক সমালোচকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মহর্ষি নারদ আসিয়া রামচরিত্র বর্ণনা করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলে বাল্মীকি বলিয়াছিলেন যে, রামের সম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁহার জানা নাই। তদুত্তরে নারদ বলিলেন—

—নারদ কহিলা হাসি,—"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম-স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো॥"

[ভাষা ও ছন্দঃ রবীন্দ্রনাথ]

প্রকৃতপক্ষে এই সকল কাহিনীর সমন্বয় সাধন করিবার জন্য বাল্মীকিকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও "বাল্মীকির জয়ে" লিখিয়াছেন—"বাল্মীকি আদর্শ মানুষ, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য এবং আদর্শ শত্রুর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" ইহার মধ্যে রামের কাহিনীতে কতটা সত্য নিহিত আছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু রামায়ণের বর্ণনা হইতে রামকে সর্ব্ববিষয়েই আদর্শ পুরুষ রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহাতেই উক্ত গ্রন্থের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। এই আদর্শই সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া বাল্মীকির রামায়ণ প্রাকৃত এপিক বা মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে।

রামের বনবাসে বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, আর রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ-ব্যাপারে প্রত্যভিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। যে ছন্দে সাধারণতঃ রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তাহা এপিক রচনার সম্পূর্ণই উপযোগী, বাল্মীকির প্রতিভা শব্দ-সম্পদে ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। অতএব এপিকের যাবতীয় বিশেষত্ব ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য ইলিয়ডের ন্যায় রামায়ণও আদর্শ এপিকরূপে গৃহীত হইতে পারে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এপিকের দুইটি বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ Authentic অর্থাৎ প্রাকৃত এপিক, এবং দ্বিতীয়তঃ

Literary অর্থাৎ সাহিত্যিক এপিক। যখন এই উভয় পর্য্যায়ভুক্ত গ্রন্থকেই এপিক বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের মধ্যে এপিকের বিশেষত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার যখন ইহাদের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতারও সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কল্পনার বিরাটত্ব, এবং তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা ও ছন্দের উপরে প্রধানতঃ এপিকের বিশেষত্ব নির্ভর করে। অতএব প্রাকৃত বা সাহিত্যিক এপিক যাহাই রচিত হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে এই বিশেষত্ব বর্ত্তমান থাকাতেই তাহারা এপিক পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। এইজন্য শিল্প-কলার দিক্ দিয়া বিচার করিলে উভয়েই যে সমধর্ম্মী তাহা বুঝিতে পারা যায়।[১] কিন্তু authentic বা প্রাকৃত এপিক যে সমাজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই ধারণা আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। অধুনা কোন বীর ভ্রাতার বক্ষ-বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিয়াছেন, বা পরাজিত শত্রুকে গাড়ীর চাকার সহিত বাঁধিয়া আনিয়াছেন, অথবা হনুমান এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়া লেজের আগুনে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, এইরূপ পরিকল্পনার স্বাভাবিকতা স্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু মহাভারত ও রামায়ণে আমরা এইরূপ বিবরণই পাঠ করিয়া থাকি।[২] ইহার কারণ এই যে, সেই সময়ের সামাজিক অবস্থায় বোধ হয় ইহা সম্ভবপর ছিল, এবং কবিরা তাহাই যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কবিরা এই সকল ঘটনার অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহা বর্ণনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, এবং এইভাবে বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় রচনাকে authentic বা প্রাকৃত এপিক বলা হইয়া থাকে। ঐরূপ সামাজিক অবস্থা হইতে এখন আমরা

১। Then in craftsmanship, the two kinds of epic are equally deliberate, equally concerned with careful art. We may, then, in a general survey, regard epic poetry as being in all ages essentially the same kind of art fulfilling always a similar intension. (The Epic by Abercrombie, p. 47).

২। রামেন্দ্রসুন্দরের "মহাকাব্য" দ্রষ্টব্য।

বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, এবং সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর আদর্শও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে যে এপিকের উদ্ভব হয়, তাহাতে বর্ত্তমান সমস্যাগুলিই আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। প্রাকৃত ও সাহিত্যিক এপিকের মধ্যে বাস্তবতার এই বিভিন্নতার দরুণ প্রধানতঃ পার্থক্য সূচিত হইয়া থাকে। সেই প্রাথমিক যুগে সামাজিক জটিলতা বেশী ছিল না বলিয়া প্রাকৃত এপিকে গল্পাংশ অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায়, কিন্তু জমাটবদ্ধ ভাবে বর্ণিত হয়, আর সাহিত্যিক এপিকে ঐ ভাবেই কোন মহনীয় আদর্শ প্রভৃত আড়ম্বরের সহিত বিবৃত হইয়া থাকে। এইজন্য সাহিত্যিক এপিকে শিল্প-চাতুর্য্য প্রাকৃত এপিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। দ্রষ্টব্য এই যে, প্রাকৃত এপিক সাধারণতঃ আবৃত্তির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, আর সাহিত্যিক এপিক পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। এজন্য ইহাতে মণ্ডন-শিল্পের প্রভৃত আয়োজন সঞ্জীভূত থাকে।[১]

বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র মেঘনাদবধকেই সাহিত্যিক এপিকের পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতে মহাকাব্যের উৎকৃষ্ট আদর্শ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের কবিগণ নিজের ভাষায় কেবলমাত্র গল্পাংশের অনুবাদ করিতে যাইয়া তাঁহাদের গ্রন্থগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা পুরাণে পরিণত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস তাঁহার আত্মবিবরণীতে নিজেকে মহাপণ্ডিতরূপে প্রচারিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামায়ণের মহাকাব্যত্বের বিশিষ্টতা তাঁহার গ্রন্থ পাঠে অনুভব করা যায়

১। As a general rule, 'authentic epic, in response to its surrounding needs, has a simple and concrete subject, and the closeness of the poet to this is therefore more obvious than in 'literary' epic, which (again in response to surrounding needs) has been driven to take for subject some great abstract idea and display this in a concrete but only ostensible manner. Literary epic has achieved a diction much more answerable to the greatness of epic matter than the 'authentic' poems (The Epic by Abercrombie, p. 47). The first epics (authentic) were intended for recitation ; the literary epic is meant to be read. (Ibid. p. 39).

না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙ্গালা পুরাণের আদর্শই প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র মনসামঙ্গলের কাহিনীতেই মহাকাব্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু শক্তির অভাবে কোন কবিই আমাদিগকে মহাকাব্যের আস্বাদন দান করিতে পারেন নাই। এইজন্য বাঙ্গালাভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানাও মহাকাব্য পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে মাইকেল আবির্ভূত না হইলে আমরা সাহিত্যিক এপিকের (মহাকাব্যের নহে) রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইতাম। ভাব, ভাষা ও ছন্দের আদর্শের জন্য তিনি পাশ্চাত্য কবি মিল্টনকেই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং এরিষ্টটলের পয়েটিক্সের বিধি অবলম্বনে কবি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ জাতীয় গ্রন্থের বিধি তিনি অনুসরণ করেন নাই। অতএব প্রাচ্য-মহাকাব্যের আদর্শ অবলম্বনে মেঘনাদ-বধের বিচার করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য মতে প্রাকৃত ও সাহিত্যিক এপিকের পরিকল্পনার বিভিন্নতা এইভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে—প্রাকৃত এপিক (এবং মহাকাব্য—যেহেতু উভয়ই একই পর্য্যায়ভুক্ত) রচয়িতৃগণকে বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণের জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না, কারণ প্রাচীন বাস্তব-জীবনের ঘটনাগুলি তাঁহারা কাব্যোচিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান মাত্র। কিন্তু সাহিত্যিক এপিক রচয়িতৃগণকে প্রথমতঃ বিষয় নির্ব্বাচন করিতে হয়, পরে কল্পনার সাহায্যে যুগোপযোগী করিয়া তাঁহারা গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। নির্ব্বাচিত বিষয়টি নিজের অন্তর-রহস্যের সহিত একীভূত করিয়া বিশিষ্ট অনুভূতির সাহায্যে সাহিত্যিক এপিক রচিত হইয়া থাকে।[১] মাইকেল রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রধান ঘটনা নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন।

১। There was no need for them (the poets of the authentic Epics) to be long choosing and beginning late. For the poet of the literary epic, however, it is his own consciousness that must select the kind of theme which will fulfil the epic intention for his own day. It is his own determination that will draw the theme into the secrets of his being (The Epic by Abercrombie, p. 37).

ইন্দ্রকে পরাজিত করাতে মেঘনাদের বীরত্বের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, অতএব তাঁহার আখ্যায়িকা এপিক রচনার উপযুক্ত বিষয় বটে। ইহার পরে কবি নিজের কল্পনা-বলে সময়োপযোগী পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। বাল্মীকি রাক্ষসগণকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের পারিবারিক জীবনের কোন বিশিষ্ট চিত্র রামায়ণে প্রতিফলিত হয় নাই। এই অভাব মোচন-কল্পে মাইকেল, রাবণকে পুত্রবৎসল পিতা, মেঘনাদকে কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, প্রমীলাকে প্রেমময়ী পত্নী, এবং রাক্ষসগণকে অত্যধিক স্বদেশপ্রিয় করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। রাবণের নিকটে রাম বালক-মাত্র হিরণ্যকশিপুর বধ-সাধন-সময়ে নৃসিংহের হুঙ্কারে এক ব্রাহ্মণীর গর্ভপাত হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণের শাপে রাম পূর্ব্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃতি হইয়াছিলেন। সীতাহরণের পরে লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। এই সকল কারণে "রামচন্দ্র, না বোকচন্দ্র"" এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। বিশেষত ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে এবং বংশগৌরবে রাম অপেক্ষা রাবণ শ্রেষ্ঠতর। মাইকেল এই যুক্তির সারবত্তা বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এইজন্য রামলক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আকৃষ্ট হয় নাই। পিতার বিদ্রোহী পুত্র মাইকেলের পক্ষে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী রামের আলেখ্য শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহা মাইকেলের অন্তরের কথা, এবং তাঁহার বাস্তব-জীবনের ইহা অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। অতএব তাঁহার লেখনীতে যে রামের প্রচলিত আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কবির দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুসরণ না করিয়া কাব্য-পাঠে প্রবৃত্ত হইলে রসাস্বাদন করা যায় না। অতএব রামের চরিত্র উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়াছে, তাহা আমাদের বিচারের বিষয় নহে, কবি যে ভাবে তাঁহাকে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা তাহাই বিচার্য্য বিষয়। মাইকেল যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাঁহার রচনায় যদি সেই আদর্শ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার কাব্যের সার্থকতা সমর্থিত হইতে পারে। অতএব কাব্য-বিচারে তাঁহার এই নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

এপিকে থাকিবে এক বিরাট পরিকল্পনা! একমাত্র প্রমীলার চরিত্র চিত্রনেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায়—

—"কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কূল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম; মেঘনাদ স্বামী;—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"

ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যদি মঙ্গলকাব্যের অথবা কৃত্তিবাসের ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহাতে এপিকের ছাপ আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে পারিত কি? এইভাবে মাইকেল উপমা, অলঙ্কারে সজ্জীভূত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র যে প্রাণের দরদ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতেই মেঘনাদবধ এপিক পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। মাইকেল বহু অপ্রচলিত শব্দ এবং দীর্ঘ সমাস-বদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়া এপিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার রচনার দোষ নহে, এরিষ্টটোলের অনুকরণ মাত্র। রাক্ষসবংশ-সম্ভূত মেঘনাদের প্রাধান্য কীর্ত্তিত করিয়া মাইকেল গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। ইহাতে মহাকাব্য-রচনার বিধি লঙ্ঘিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে কি? সদ্‌বংশজাত চতুরোদাত্ত নায়কের ব্যবস্থাই অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত বিশ্রবার বংশ সদ্বংশ বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে, নতুবা তাঁহার অপরপুত্র কুবের দেবপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারিতেন না। আর রাবণ-বধ জনিত ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য রামচন্দ্রকেও অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। তবে যদি রাক্ষসী-গর্ভে জন্ম হেতু রাবণের বংশ অনার্য্য পর্য্যায়ে গৃহীত হয়, তাহাতেও সাহিত্যিক এপিক রচনার বিধি লঙ্ঘিত হয় না। মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্টের নায়ক সয়তান, মাইকেলের গ্রন্থেরও নায়ক তথাকথিত অনার্য্য বংশ-সম্ভূত মেঘনাদ। কিন্তু নায়ক আর্য্যই হউক, আর অনার্য্যই হউক, তাহাত বিচার্য্য বিষয় নহে, কারণ

প্রাচ্য মতে তাঁহাকে "চতুরোদাত্ত" হইতে হইবে, আর পাশ্চাত্য মতে তাঁহার এমন মহনীয় হওয়া উচিত, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র কাব্যের ঘটনাবলী দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে।[১] অতএব আর্য্য ও অনার্য্যের পরিকল্পনার এখানে কোন সার্থকতাই নাই। মেঘনাদবধে এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।[২]

রামায়ণ

কৃত্তিবাস সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা করেন। তিনি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, কিন্তু অধুনা তাঁহার গ্রন্থ যেভাবে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে বাল্মীকির রামায়ণ ব্যতীতও অন্যান্য গ্রন্থের প্রভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। রামচরিত অবলম্বন করিয়া বাল্মীকিই সর্ব্বপ্রথম রামায়ণ রচনা করেন, কিন্তু তাহার পরে রামায়ণের আখ্যায়িকা লইয়া এদেশে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বিবিধ পুরাণ এবং কাব্য-নাটকাদিতেও রামচরিত বর্ণিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহাভারত, জৈমিনিভারত, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থের প্রভাব পরবর্ত্তী রামায়ণ রচয়িতৃগণের উপরে, এবং অধুনা প্রচারিত কৃত্তিবাসের গ্রন্থেও পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল আদর্শ গ্রন্থে বিবিধ নূতনত্বের সংস্থান রহিয়াছে। অতএব ভাষা রামায়ণ বুঝিতে হইলে এই সকল বিষয়ের সন্ধান করা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়। এইজন্য আমরা এই সকল

১। A story weighted with the epic purpose could not proceed at all unless it were expressed in persons big enough to support it. (The Epic by Abercrombie, pp. 63-64).

২। পঞ্চমখণ্ডে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে।

গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলিত করিয়া কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তন্মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণই আমাদের প্রধান এবং প্রথম আলোচ্য বিষয়। এখন আমরা অনেকেই ভাষা-গ্রন্থ পাঠ করিয়া রামায়ণের রসাস্বাদন করি, অতএব নিতান্ত প্রয়োজন অনুভূত না হইলে মূল গ্রন্থ আমাদের আলোচনার বহির্ভূতই থাকিয়া যায়। অবশ্যই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। বাল্মীকির রামায়ণ লইয়া বিশেষজ্ঞগণ এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহার স্বরূপ ও বিষয়বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আমরা প্রথমে তাহা লইয়াই রামায়ণ-পাঠে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাল্মীকির রামায়ণ

রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—রাম-চরিত অবলম্বনে বাল্মীকি-রচিত গ্রন্থ-বিশেষের নাম রামায়ণ। ইহা রচনা করিয়া তিনি ভারতের আদি কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনা করিয়া বাল্মীকি রামচন্দ্রের পুত্র লবকুশকে শিক্ষা করান। তাঁহারা রামের সভায় যাইয়া রামায়ণ গান করিতেছেন, এইভাবে সমগ্র রাম-চরিত বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে ত্রেতা যুগেই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তথাপি রামায়ণ যে সুপ্রাচীন তাহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহাকে ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কালে স্থাপন করিবার পক্ষপাতী।[১] সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান রামায়ণের উপক্রমণিকা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, পরবর্ত্তী কোন কবি বাল্মীকি-রচিত আদি রামায়ণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

১। Dr. A. B. Keith's article in the Journal of the Royal Asiatic Society, April, 1915.

ইহার প্রারম্ভ এইরূপ ঃ—

নারদ বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাল্মীকি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অধুনা জগতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কে?" উত্তরে নারদ তাঁহাকে সংক্ষেপে রাম-চরিত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। ইহার পরে বাল্মীকি তমসা নদীতে স্নান করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে বিহার-রত ক্রৌঞ্চকে এক ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণে নিহত দেখিয়া তিনি করুণা পরবশ হইয়া বলিলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

সমাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত এই শোক-বাক্যই শ্লোক নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎপর ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে এই ছন্দে রামায়ণ রচনার আদেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া তাহা গান করিবার জন্য কুশীলবকে শিক্ষিত করেন। রামের সভায় তাঁহারা দুই ভাই রামায়ণ গান করিতেছেন, এই ভাবে দশরথের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র রাম-চরিত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজপুত্র লবকুশের রামায়ণ গানের আখ্যায়িকা উত্তরকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, অথচ গ্রন্থের প্রথম ভাগেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহা উদ্দেশ্যমূলক। রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথম কয়েকটি সর্গ, এবং সমগ্র উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তী সংযোজনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।[১] আদিকাণ্ডের চতুর্থসর্গের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥

ইহাতে বাল্মীকিকে "ভগবানৃষি" বলা হইয়াছে। অন্যত্রও তাঁহাকে "মহাপ্রাজ্ঞ" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা কবির নিজের

১। বিশ্বকোষে "রামায়ণ" শব্দ দ্রষ্টব্য। Dr. Dinesh Chandra Sen's Bengali Ramayanas, pp. 55 Seq. ইত্যাদি।

উক্তি নহে, অন্য কেহ বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ প্রচার করিতেছেন ইহা তাহারই নিদর্শন মাত্র। আবার লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগেও গ্রন্থের পরিসমাপ্তিসূচক ফলশ্রুতি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যত্রও রহিয়াছে—

চতুর্ব্বিংশ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥

(ঐ, ১।৪।২)

এখানেও উত্তরকাণ্ডকে পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় কাণ্ড হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। এই জাতীয় বিবিধ প্রমাণ-বলে উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তী সংযোজনা বলিয়া সুধিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাঁহারা এইভাবে গ্রন্থের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তরকাণ্ডও বাল্মীকির রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থের প্রথম ভাগেই লবকুশ কর্ত্তৃক রামায়ণ গানের উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডের প্রধান ঘটনা সীতার নির্ব্বাসন। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া ভাবিতেছেন, কাহা-দ্বারা ইহার প্রয়োগ করিবেন। এমন সময়ে রাজপুত্র কুশীলব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাদিগকেই সর্ব্বপ্রথম রামায়ণ-গান শিক্ষা করাইলেন। ইহা দ্বারা সীতার নির্ব্বাসন ও বাল্মীকির আশ্রমে কুশীলবের জন্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রথমভাগেই উত্তরকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডটি বাল্মীকির রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইহা কৌশল-মাত্র। রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবার ৬০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা যে যুক্তিহীন প্রবাদমাত্র তাহাও উদ্ধৃত উল্লেখ হইতে প্রতিপন্ন হয়।

রামায়ণের কাণ্ডবিভাগ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার পরিকল্পনাও দৃষ্ট হয়। পদ্ম-পুরাণে উত্তরকাণ্ডটি ষট্‌কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণনা করা হইয়াছে, যথা—

ষট্‌কাণ্ডানি সুরম্যাণি যত্র রামায়ণেঽনঘ।
বালমারণ্যকং চান্যৎ কিষ্কিন্ধ্যা সুন্দরং তথা
যুদ্ধমুত্তরমন্যচ্চ ষড়েতানি মহামতে॥

(ঐ, পাতালখণ্ড, ৩৭ম অঃ, ১৬৪ শ্লোক)।

ইহাতে অযোধ্যাকাণ্ডের উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে ভরতের নন্দীগ্রামে আসিয়া বাস করা পর্য্যন্ত ঘটনা বালকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (ঐ, বঙ্গবাসী সং, ৩১৯ পৃঃ)। অর্থাৎ এখানে আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডের সমবায়ে বালকাণ্ড গঠিত হইয়াছে। তৎপর বলা হইয়াছে যে, এই ছয়টি কাণ্ড ২৪ হাজার শ্লোকে রচিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যবদ্বীপে রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল। সেখানে যে রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কাণ্ড-বিভাগ নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, আদি রামায়ণে বোধ হয় কাণ্ডবিভাগও ছিল না, পরবর্ত্তীকালে ইহা ছয়কাণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তাহারও পরে সপ্তমকাণ্ড সংযোজিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ৭৬৪ সর্গ এবং ২৪ হাজারের অধিক শ্লোক দৃষ্ট হয় (বিশ্বকোষ, রামায়ণ শব্দ দ্রষ্টব্য)। অথচ রামায়ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে রহিয়াছে যে, ইহাতে ৫০০ সর্গ ও ২৪ হাজার শ্লোক ছিল (ঐ, ১।৪।২)। এই উক্তি সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু অধুনা প্রচলিত রামায়ণে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত রামায়ণে ৬৯০ সর্গে ২৩৯৫৪ শ্লোক রহিয়াছে (ভট্টশালী সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত রামায়ণের প্রথম ভাগে ৫৬০ সর্গে ২৪ হাজার শ্লোকের নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আদিকাণ্ডে ৬৪ সর্গ এবং ২৮৫০ শ্লোকের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের আদিকাণ্ডে ৮০ সর্গ ও ২৪৭৮ শ্লোক দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আদি রামায়ণের প্রকৃত স্বরূপ বর্ত্তমান যুগেও নির্ণীত হয় নাই।

রামায়ণের নামান্তর :—"রঘুবরচরিতং মুনি-প্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্" (১।২।৪৩), এবং "পৌলস্ত্যবধং ইত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ" (১।৪।৭) প্রভৃতি উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, রঘুবরচরিত, দশশিরবধ, পৌলস্ত্যবধ প্রভৃতি শব্দ রামায়ণের সমনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণের আখ্যায়িকা সর্ব্বজন সুবিদিত, তথাপি ইহার প্রধান প্রধান চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

দশরথ পিতা হইয়াও প্রভূত নিষ্ঠুরতার সহিত রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ীকে বর দানের ফলে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্যবিধ কারণেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকেই তিনি রাজ্যভার প্রদান করিবেন (২।১০৭।৩)। এই জন্যই দশরথ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"ভরতের অনুপস্থিত-কালেই তোমার রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া উচিত" (২।৪।২৫)। যাঁহার পত্নীর সংখ্যা ছিল তিনশত পঞ্চাশ (২।৩৪।১৩), তিনি যে অন্য কোন প্রেয়সীর মনোরঞ্জনের জন্য আর কিছু করিয়া বসেন নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করিবার কালে রামের বয়স ঊনষোড়শ বৎসর হইয়াছিল (১।২০।২)। বিবাহের পরে সীতাদেবী ১২ বৎসর অযোধ্যায় অতিবাহিত করিয়া বনগমন করেন (৩।৪৭।৪), তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১৮ বৎসর (৩।৪৭।১০)। অতএব ৬ বৎসর বয়সের সময়ে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, ইহা জানা যাইতেছে। বনগমনকালে রামের বয়স ছিল প্রায় ২৮ বৎসর। ১৪ বৎসর অন্তে রাবণ বধ করিয়া যখন তিনি অযোধ্যায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪২ বৎসর, সীতার বয়স প্রায় তেত্রিশ। ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পরে সীতার পাতাল-প্রবেশ, অতএব তখন রামের বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর, এবং সীতা ৪৬ বর্ষীয়া (রামায়ণ-তত্ত্ব, ২২৩ পৃঃ)। ইহার পরে রামচন্দ্র আর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন নাই (৭।১১২।৭)।

সীতা কুসুমের ন্যায় কোমলা হইলেও ক্ষত্রিয়া রমণীর উপযুক্ত তেজোবীর্য্য-সমন্বিতা ছিলেন। বনবাসগমন কালে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে তিনি রামকে বলিয়াছিলেন—"আমার পিতা জনক বিবাহের সময়ে তোমাকে আকারে পুরুষ ও কার্য্যে স্ত্রীলোক কল্পনা করিতে পারেন নাই" (২।৩০।৩)। রামের উদ্দেশে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবার কালে তিনি তাঁহার প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে পতিপরায়ণা রমণীর স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় উদ্বেলিত হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কথা

অপেক্ষা উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠতাই লক্ষণীয়। আবার অশোকবনে রাবণ কর্ত্তৃক প্রলোভিতা হইয়া সীতা বলিয়াছিলেন—"আমি মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পবিত্র সূর্য্যবংশের বধূ হইয়া এক পত্নীব্রতে অবস্থিতা রহিয়াছি (৬।২১।৪), অতএব তুমি ধন বা ঐশ্বর্য্য দ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না (৬।২১।১৭)। এখানেই সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অপরিমিত হৃদয়-বলেই তিনি আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছিলেন। রাবণ-বধের পরে রাম যখন সীতার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন দলিতা ফণিনীর ন্যায় সীতা বলিয়াছিলেন—"ভদ্রেতর (প্রাকৃত) ব্যক্তি আর্য্যেতরা মহিলাকে যেরূপ বলিয়া থাকে আপনি আমার প্রতি সেইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিতেছেন (৬।১১৮।৫)। উত্তরকাণ্ডে যখন রাম পুনরায় সীতাকে পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন সেই অপমান আর তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। শপথ গ্রহণের ছলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি যদি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান দান না করিয়া থাকি, তাহা হইলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন (৭।১১০।১৪-১৬)। এইরূপে রামকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতঃ তিনি ভূতলে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা তপোনিরতা বেদবতীকে অপমানিত করায় তিনি অগ্নি-প্রবেশের পূর্ব্বে রাবণকে বলিয়াছিলেন—"তোমারই বধের নিমিত্ত আমি কোন ধর্ম্মাত্মার অযোনিজা কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।" (৭।১৭।৩১-৩৩)। ইনিই জনকনন্দিনী সীতা। স্বীয় কার্য্য সাধনান্তর তিনি এইভাবে পুনরায় মাতৃগর্ভেই প্রবেশ করিয়াছেন।

অশোকবনে রাবণ যে সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করেন নাই তাহার একাধিক কারণের উল্লেখ রহিয়াছে। বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলীকে অপমানিতা করাতে ব্রহ্মা রাবণকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন—"অদ্য হইতে যদি তুমি কোন রমণীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।" (৬।১৩।১৪)। রম্ভাকে ধর্ষণ করাতেও নলকুবের রাবণকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়াছিলেন (৭।৩১।৫৫-৫৬)। রাবণ এই শাপের

কথা শুনিয়া অকামা রমণীগণকে সম্ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (৭।৩১।৫৮-৫৯)।

রাবণ পুলস্ত্যের নাতি এবং বিশ্রবা ঋষির পুত্র, অতএব ব্রাহ্মণ, কিন্তু সুমালী রাক্ষস-দুহিতা কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাক্ষসরূপে পরিচিত হইয়াছেন। রাবণ অনাহারে দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে মনুষ্য ব্যতীত সকলের অবধ্য হইবার বর লাভ করেন (৭।১০।১৬-২০)। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া দেবগণের প্রার্থনায় নারায়ণ মনুষ্যরূপে রাবণ-বধের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (আদির পঞ্চদশ সর্গ)। শিবানুচর নন্দীর বানরমুখ দেখিয়া রাবণ হাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া নন্দী তাঁহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাঁহার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই রাবণের অহঙ্কার ও দৈহিক গর্ব্ব দূর করিবে। (৭।১৬।১৭-১৯)। এইজন্যই নরবানরের নিকট রাবণ পরাজিত হইয়াছিলেন। রাবণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিতেন, এবং তিনি আহিতাগ্নি ও বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন (৬।১১১।২১-২৩)। রাবণাদির বধ জনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যেই রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাবণ শিবভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, অথচ তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষে যখন কৈলাসে গমন করেন, তখন নন্দীর নিকট মহাদেবের কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"শঙ্কর কে?" (৭।১৬।১২)। আবার ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াই তিনি বরলাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় মহাদেবের দ্বারা নির্য্যাতিত হইবার পরে তিনি শিবভক্ত হইয়াছিলেন। নর্ম্মদাতীরে শিবপূজা করিয়া তিনি হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন (৭।৩৬।৪২-৪৪)।

হরি কর্তৃক নিহত হইলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, সনৎকুমারের নিকট ইহা জানিতে পারিয়া রাবণ নারায়ণের অবতার রামচন্দ্রের সহিত বিরোধ করিবার জন্যই সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিলেন (৭।৪৫।৪)।

হনুমান সম্বন্ধীয় অনেক অলৌকিক ঘটনা রামায়ণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এক লম্ফে তিনি সাগর অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং

আবার লঙ্কা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া হিমালয়ে যাইয়া পর্ব্বত সহ ঔষধ লইয়া আসিয়াছেন। পাঠ করিলেই টলষ্টয়ের সেই গল্প মনে পড়ে। এক ধর্ম্মযাজক সমুদ্রপথে গমন করিবার কালে এক দ্বীপবাসী তিনজন যোগীকে উপাসনার প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন তাঁহারা জলের উপর দিয়া হাটিয়া আসিয়া জাহাজের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। আধুনিক যুগেও তত্ত্ব-ব্যাখ্যার জন্য এই জাতীয় রূপকের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বাল্মীকি যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ রামায়ণেই রহিয়াছে। কাব্যে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারবিশেষ, বক্তব্য বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিবার উপায় মাত্র। রামায়ণ-পাঠে আমরা ইহাই মাত্র বুঝিতে পারি যে, হনূমান সুকৌশলে অতি সত্বর এই সকল কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছিলেন। রামায়ণের যাবতীয় বিষাদের কাহিনীর মধ্যে অদ্ভুতকর্ম্মা হনূমানের আখ্যায়িকা চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করে। কাব্য-বিচারে দেখা যায়, এই বীরের পরিকল্পনায় কবি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রামায়ণ ব্যতীত রামচরিত্র অন্যান্য পুরাণেও বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থে যে সকল নূতন তত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভাষা রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনায় ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে, কারণ বঙ্গদেশীয় কবিগণ বাল্মীকির রামায়ণ ব্যতীতও এই সকল আদর্শ হইতে উপকরণ সংগৃহীত করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অদ্ভুত রামায়ণ

বাল্মীকির রামায়ণ ব্যতীত যে সকল গ্রন্থের প্রভাব ভাষা রামায়ণগুলিতে লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের নাম যেমন "অদ্ভুত" ইহার ঘটনাও সেইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ। মূল রামায়ণের পরিশিষ্ট-রূপে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহার বক্তা বাল্মীকি, এবং শ্রোতা তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজ মুনি। ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"শত কোটি শ্লোকপূর্ণ যে

রামায়ণ ব্রহ্মলোকে প্রচলিত আছে, তাহাতে এমন কি কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাহা চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকপূর্ণ মর্ত্ত্যে প্রচলিত রামায়ণে নাই?" উত্তরে বাল্মীকি রামসীতার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া এই অদ্ভুত আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কুর পত্নী নারায়ণের উপাসনা করিয়া একটি ফল লাভ করিলেন। ঐ ফল-ভক্ষণের ফলে তাঁহার অম্বরীষ নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। নারায়ণের উপাসনা করিয়া অম্বরীষ নারায়ণের নিকট হইতে সুদর্শনচক্র লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে শ্রীমতী নাম্নী তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ, ও মুনিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত উভয়েই অভিলাষ প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া অম্বরীষ বলিলেন—"কন্যা তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিবে, তাঁহাকেই তিনি কন্যা দান করিবেন।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে নারদ নারায়ণের নিকট যাইয়া বরলাভ করিলেন যে, স্বয়ম্বরের সময়ে শ্রীমতী যেন পর্ব্বতের মুখ বানরের মুখের ন্যায় দর্শন করে। নারদ চলিয়া আসিলে পর্ব্বত যাইয়া নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনিও এই বর লাভ করিলেন যে, স্বয়ম্বরের সময়ে কন্যা নারদের মুখ গোলাঙ্গুল-মুখবৎ (বানর বিশেষ) দেখিবে। দেবী ভাগবতেও পর্ব্বতের শাপে নারদের বানরমুখ হইবার বিবরণ রহিয়াছে (৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ২৬শ অঃ)। কিন্তু সেখানে রাজার নাম সঞ্জয়, এবং রাজকন্যার নাম দময়ন্তী। যাহাই হউক যথাসময়ে স্বয়ম্বর-সভা অনুষ্ঠিত হইল। কন্যা উপস্থিত হইয়া উভয়ের মুখই বানরের মুখের ন্যায় দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, উভয়ের মধ্যে দ্বিভুজ এক পরমসুন্দর যুবা উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহারই গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নারায়ণ ছদ্মবেশে সভায় উপস্থিত হইয়া এইরূপে শ্রীমতীকে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই নারায়ণের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"ইহা কোন মায়াবীর কার্য্য হইবে।" তখন তাঁহারা পুনরায় অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"স্বয়ম্বর-সভায় আমাদিগকে আহ্বান করিয়া যখন তুমি ছলনা-

পূর্ব্বক শ্রীমতীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ, তখন তুমি মোহ দ্বারা আক্রান্ত হইবে " এই শাপ প্রদান করা মাত্র তমোরাশি উত্থিত হইয়া অম্বরীষকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। এদিকে রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শন চক্র ঐ তমোরাশি ও নারদ এবং পর্ব্বতের প্রতি ধাবিত হইল। আশ্রয় লাভের জন্য তাঁহারা পুনরায় নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া মুনিদ্বয় বলিলেন—"তুমি যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ, সেই মূর্ত্তিতেই তোমাকে অম্বরীষের বংশধর দশরথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তখন এই কন্যা শ্রীমতী ধরণীসম্ভবা হইয়া জনক কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হইবে। তুমি তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু রাক্ষস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তুমি শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ বলিয়া এক রাক্ষস ছলপূর্ব্বক তোমার পত্নীকে হরণ করিবে। আমরা যেমন শ্রীমতীর জন্য দুঃখ পাইয়াছি, তুমিও সেইরূপ তোমার ভার্য্যার জন্য হাহাকার করিয়া রোদন করিবে।" ইহাই রাম-জন্মের মূলীভূত কারণ।

এখন সীতার জন্মহেতু কথিত হইতেছে। সঙ্গীতজ্ঞ কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ হরিগুণ গান করিবার জন্য সশিষ্য বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। একদা তাঁহাদের প্রীতির জন্য স্বর্গে এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইলে লক্ষ্মী দাসীগণ সহ উৎসব-স্থানে প্রবেশ করিলেন। দাসীরা বেত্রহস্তে দেবতাগণকে তাড়না করিলে নারদ কোপিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—"যেহেতু তুমি রাক্ষস-প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া চেড়ীগণ দ্বারা বেত্রাঘাতে আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছ, অতএব আমার শাপে তুমি রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, এবং রাক্ষসীরাও তোমাকে বেত্র দ্বারা তাড়িত করিবে।" লক্ষ্মী নারদের অভিশাপ স্বীকার করিয়া বলিলেন—"যে রাক্ষসী কলসে সংগৃহীত মুনিগণের শোণিত পান করিবে, আমি যেন তাহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করি।"

একদা রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত মুনিগণের শরীর হইতে তিল তিল রক্ত গ্রহণ করিয়া এক কলসীপূর্ণ করিয়াছিলেন। লঙ্কাতে উপস্থিত হইয়া তিনি মন্দোদরীকে বলিলেন—"এই শোণিত বিষ অপেক্ষাও

অধিক বীর্য্যসম্পন্ন, অতএব কাহাকেও পান করিতে দিবে না, এবং নিজেও ভক্ষণ করিও না।" এই বলিয়া তিনি বিহারার্থ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এদিকে মন্দোদরী বিরহে কাতর হইয়া আত্মহত্যার জন্য ঐ শোণিত পান করিয়া গর্ভবতী হইলেন, এবং লোক-লজ্জার ভয়ে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া গর্ভপাত করিয়া ভ্রূণ ভূতলে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। ইহাই জনকের লাঙ্গলের শীষে সীতারূপে উত্থিত হইয়াছিল।

ইহার পরে সীতার বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, রামের বনবাস, সীতাহরণ ও রাবণ-বধ প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনা অতি সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর রামচন্দ্র আসিয়া অযোধ্যায় রাজা হইলেন। একদা মুনিগণ রামের সভায় আসিয়া রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া সীতা হাস্য করিলে মুনিগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সীতা বলিলেন—"জনকের গৃহে অবস্থান কালে এক ব্রাহ্মণের মুখে আমি শুনিয়াছিলাম, দশস্কন্ধ রাবণের সহস্রস্কন্ধ এক বড় ভাই আছে। সে পুষ্কর দ্বীপে বাস করে। তাহাকে বধ করিতে পারিলে রামচন্দ্রের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।" ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে পুষ্কর দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রাবণের সহিত যুদ্ধে তিনি হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন সীতা চণ্ডীর ন্যায় উগ্রমুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করিলে রামচন্দ্রাদি কর্ত্তৃক মুল প্রকৃতিরূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহারা পুষ্করদ্বীপ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাই অদ্ভুত রামায়ণের মুল আখ্যায়িকা।

উপরে সীতার জন্ম-সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার অনুরূপ আখ্যায়িকা অন্যদেশেও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"জাভা দেশের রামায়ণে লিখিত আছে যে, সীতা রাবণ ও মন্দোদরীর কন্যা। গণকেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিল, সীতা অতি দুর্ভাগিনী হইবেন। সুতরাং রাবণ জন্মমাত্র একটি কৌটায় শিশুটিকে আবদ্ধ করিয়া তাহা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেন। জনক ঐ কৌটাটি উদ্ধার করেন। মালয় দেশের

রামায়ণে আছে, সীতা মন্দোদরীর কন্যা, এবং তিব্বতী রামায়ণে সীতাকে রাবণের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।" (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৫২৩)। বহুল প্রচারিত এই আখ্যায়িকা যে একই আদর্শ-সম্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

নারদ ও পর্ব্বত সম্বন্ধীয় এই উপাখ্যান মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে কৃষ্ণ ও নারদ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, বঙ্গবাসী সং ৩০শ—৩১শ অধ্যায়)। কিন্তু ইহাতে রাজার নাম সৃঞ্জয় এবং তাঁহার কন্যার নাম সুকুমারী। অনেক ভাষাগ্রন্থেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত

অধ্যাত্ম রামায়ণ

ইহা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শিব ইহার বক্তা, এবং পার্ব্বতী শ্রোতা। ইহাতে বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে সাতটি কাণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্থানে স্থানে বিবিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ রহিয়াছে। সীতাকে মূল প্রকৃতিরূপে প্রচার করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা যেমন অদ্ভুত রামায়ণের উদ্দেশ্য, রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রচার করাও সেইরূপ অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান লক্ষ্য। অদ্ভুত রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, নারদ কর্তৃক অম্বরীষের প্রতি প্রদত্ত শাপ-প্রভাবে যে তমোরাশি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া নারায়ণ বলিয়াছিলেন—"আমি যখন রামরূপে জন্মগ্রহণ করিব, তখন আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিও।" এইজন্যই রাম-অবতারে তাঁহার আত্ম-স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে দেখা যায়, ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও নারায়ণের আত্মস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। বাল্মীকির রামায়ণে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সত্যনিষ্ঠা, ও দাম্পত্য প্রণয় প্রভৃতি বিবিধ লৌকিক সদগুণের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে এতদতিরিক্ত দুর্ব্বোধ

ভগবত্তত্ত্বও সংক্ষেপে সাধারণের বোধগম্য করিয়া সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই রামায়ণে যে সকল নূতনত্বের সমাবেশ রহিয়াছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তাহা এখানে প্রদর্শিত হইল ঃ—

১। পৃথিবী দশানন প্রভৃতি রাক্ষসগণের ভারে প্রপীড়িত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট গমন করেন, এবং তিনি দেবগণ সহ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে স্তবে পরিতুষ্ট করিলে তিনি দশরথের পুত্ররূপে স্বীয় আত্মাকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। বিষ্ণুমায়া সীতা-রূপে জনক-গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর দেবগণ বানররূপে জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপ দশরথরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (বালকাণ্ড, ৩য় সর্গ)। ভাগবতাদি পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণ-জন্মের আখ্যায়িকার সহিত ইহার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

২। ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে অগ্নিদেব চরু লইয়া আবির্ভূত হন। দশরথ এই চরু কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা নিজ নিজ অংশ হইতে সুমিত্রাকেও চরু প্রদান করেন। রাম শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে কৌশল্যা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, ইহাতে রাম বালকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করেন (ঐ, ৪র্থ সর্গ)। (তুলনীয় ভাগবতের কৃষ্ণজন্ম-বিবরণ)।

৩। শাপপ্রভাবে পিশাচধর্ম্ম-প্রাপ্তা যক্ষী তাড়কা নিহত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল (ঐ, ৫ম সর্গ)।

৪। রামের পাদস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ঐ, ৬ষ্ঠ সর্গ)। বাল্মীকির রামায়ণে পাদস্পর্শের বিবরণ নাই, দর্শনেই অহল্যা শাপমুক্তা হইয়াছিলেন (ঐ, আদির ঊনপঞ্চাশে)।

৫। অহল্যার আশ্রম হইতে মিথিলায় যাইবার কালে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে রামচন্দ্রের সহিত এক নাবিকের কথোপকথন অধ্যাত্ম রামায়ণের কোন কোন সংস্করণে পাওয়া যায় (ঐ, সপ্তম সর্গ)। ইহারই অনুকরণে ভাষা রামায়ণে রামনাবিক কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে।

৬। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে রাবণ-বধ সংঘটিত হইতে পারে না, এজন্য ব্রহ্মার আদেশে নারদ আসিয়া রামচন্দ্রকে রাবণ-বধের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রামও দণ্ডকারণ্যে যাইতে স্বীকৃত হন (ঐ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১ম সর্গ)।

৭। সুরগণের আদেশে দৈবীবাণী অভিষেকের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য মন্থরা ও কৈকেয়ীর শরীরে প্রবেশ করিয়া রামের বনবাস বিধান করেন (ঐ, ২য় সর্গ)।

৮। ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাল্মীকি রামের নিকটে তাঁহার দস্যু-জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন (ঐ, ৬ষ্ঠ সর্গ)। বাল্মীকির রামায়ণে এই আখ্যায়িকা নাই।

৯। জটায়ু রামচন্দ্রের পিতৃসখা (ঐ, অরণ্যকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ)। (তু°—বাল্মীকির রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ১৪।৩)

১০। সূর্পণখা রাবণের নিকটে আসিয়া নিজের অপমানের বিষয় বিবৃত করিলে রাবণ ভাবিয়াছিল—"ব্রহ্মার প্রার্থনায় আমার নিধনের জন্য স্বয়ং বিষ্ণুই আসিয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব বিরোধ বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিব।" (ঐ, ৫ম সর্গ)। ভাষা রামায়ণে যে রাবণের রামভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, অধ্যাত্ম রামায়ণের এই জাতীয় উক্তিই তাহার আদর্শ স্বরূপ।

১১। অপহরণের পূর্ব্বে রামচন্দ্রের আদেশে সীতাদেবী অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক এক ছায়া-সীতা সংস্থাপিত করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ঐ ছায়া-সীতাই মায়ামৃগ দর্শনে মোহিতা হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকেই অশোকবনে রক্ষা করিয়া রাবণ মাতৃবুদ্ধি দ্বারা প্রতিপালন করিয়াছিলেন (ঐ, ৭ম সর্গ)। এই পরিকল্পনায় রাবণ ও সীতার চরিত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতেও এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময়ে মহাপ্রভু দক্ষিণ মথুরার এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহা

ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দুঃখিত চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। মহাপ্রভু তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে, রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তারপর রামেশ্বরে যাইয়া তিনি জানিতে পারেন যে, কূর্ম্ম-পুরাণেও ইহা লিখিত আছে। পুথির যে পত্রে ইহা লিখিত ছিল, তাহা আনিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদানপূর্ব্বক তিনি তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। চরিতামৃতের মধ্যের নবম পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রাবণ-বধের পরে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এই সীতা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখন অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাকে রামের হস্তে প্রদান করেন। (তু°—রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ, আরণ্যকাণ্ড, ১০৪ পৃঃ পাদ-টীকা)।

১২। বিপ্রবেশে হনূমান রামের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন (ঐ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১ম সর্গ ; তু°—বাল্মীকি, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩য় সর্গ)। ভাষা রামায়ণে বর্ণিত শিবরামের যুদ্ধ পালার বিবরণ ইহা দ্বারা সমর্থিত হয় না।

১৩। সেতু-নির্ম্মাণ সমারব্ধ হইলে রামচন্দ্র সেতুর প্রান্তভাগে রামেশ্বর শিব সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন (ঐ, যুদ্ধকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ)। বাল্মীকির রামায়ণে এই সময়ে শিব-স্থাপনার উল্লেখ না থাকিলেও লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রামচন্দ্র সীতাকে বলিয়াছিলেন—"সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে হেথা উমাপতি। হইলেন সুপ্রসন্ন এ দীনের প্রতি ॥" (রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ, যুদ্ধকাণ্ড, ১৭০ পৃঃ)।

১৪। রাবণকে প্রাসাদ-শিখরে উপবিষ্ট দেখিয়া রাম একবাণে তাঁহার কিরীট ও শ্বেতচ্ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন (ঐ, ৫ম সর্গ)।

১৫। হনূমান লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য ঔষধ আনিতে যাইতেছে, ইহা অবগত হইয়া রাবণ কালনেমিকে হনুমানের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন (ঐ, ৬ষ্ঠ-৭ম সর্গ)। ভাষা রামায়ণে ইহারই আদর্শে "কালনেমির রায়বার" রচিত হইয়াছে।

১৬। ইন্দ্রজিৎ-নিধনের পরে শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে রাবণ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বানরগণ তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে (ঐ, ১০ম সর্গ)।

১৭। অভিষেকের পরে সীতা নিজের কণ্ঠহার পুরস্কারস্বরূপ হনূমানকে প্রদান করিয়াছিলেন। (ঐ, ১৬শ সর্গ; তু°—বাল্মীকি, লঙ্কাকাণ্ড, ১৩০ম সর্গ, ৮০-৮৩ শ্লোক)। কিন্তু মতান্তরে দেখা যায় যে, হনূমান ইহা ছিন্ন করিয়া জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার হৃদপদ্মে অধিষ্ঠিত রামসীতার মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, যথা—

তয়া হনূমতে দত্তা সৈব মালা হ্যমূলিকা।
দশনৈঃ শকলীকৃত্য ত্যক্তা তেন জলাশয়ে॥

এবং—

বিদীর্য্য বক্ষঃস্থলমঞ্জনীসুতঃ
প্রদর্শয়ামাস চ রামমদ্বয়ম্।
হৃদম্বুজে সংস্থিতমব্জলোচনং
মহীসুতারাধিত পাদপঙ্কজম্॥

(বলাইচাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক অনুবাদিত অধ্যাত্ম রামায়ণ, ৫৯৫-৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বাশিষ্ঠ রামায়ণ

রাজর্ষি অরিষ্টনেমির প্রশ্নে বাল্মীকি কর্ত্তৃক এই রামায়ণ বিবৃত হইয়াছে। ইহা বশিষ্ঠ-রাম-সম্বাদাত্মক, অর্থাৎ বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের কথোপকথন-মূলক। প্রথমেই বিষ্ণু কিরূপে অভিশপ্ত হইয়া রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ রহিয়াছে। সনৎকুমার ব্রহ্মার সদনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে বিষ্ণু আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সনৎকুমার তাঁহাকে অভিবাদন না করাতে বিষ্ণু এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, সনৎকুমার শরজন্মা (কার্ত্তিকেয়) হইয়া কাম-পরতন্ত্র হইবেন। সনৎকুমারও বলিলেন—"আপনাকেও সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞ জীবের ন্যায় কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিতে হইবে।" (ঐ, বৈরাগ্য প্রকরণ, ১।৬০)। দ্বিতীয়তঃ ভৃগুপত্নী খ্যাতি বিষ্ণু শরীরে লীন হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার প্রার্থনা পূরণ

করাতে ভৃগু মনে করিলেন, বিষ্ণু আমার ভার্য্যার বিনাশ-সাধন করিয়াছেন। অতএব তিনি বিষ্ণুকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—“তুমি যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগ-দুঃখে দুঃখিত করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ভার্য্যা-বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করিতে হইবে।” (ঐ, ১।৬১)। তৃতীয়তঃ জলন্ধরের ভার্য্যা বৃন্দাকে বিমোহিতা করিয়া তাঁহার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করাতে বৃন্দা বিষ্ণুকে এই অভিশাপ প্রদান করেন—“তুমি আমাকে যেরূপ সন্তাপিত করিলে, তোমাকেও স্ত্রীবিয়োগ-নিবন্ধন সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে।” (ঐ, ১।৬২)। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের আখ্যায়িকায় ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ ভগবান নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলে দেবদত্তের গর্ভবতী ভার্য্যা তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে দেবদত্ত এই অভিশাপ প্রদান করেন—“তুমি যেমন আমাকে স্ত্রীবিয়োগে কাতর করিলে, সেইরূপ তোমাকেও কিঞ্চিৎকাল আত্মবিস্মৃত ও স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইতে হইবে।” (ঐ,১।৬৩-৪)। এই দেবদত্তের শাপেই রামচন্দ্রের গর্ভবতী সীতার সহিত বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল। অদ্ভুত রামায়ণে নারদের শাপে বিষ্ণু আত্ম বিস্মৃত হইয়া রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত রহিরাছে (ঐ, চতুর্থ সর্গ দ্রষ্টব্য)। অধ্যাত্ম রামায়ণেও রামের মায়ামনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ঐ, বালকাণ্ড, ২য় সর্গ)। বাল্মীকি রামকে দেবোপম করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সীতার বিরহে যে তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন, বিষ্ণুর অবতার রামের পক্ষে ইহা অশোভনীয়। শাপ-প্রভাবে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া এখানে কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ইহার দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায়, মহর্ষি বাল্মীকি ২৪০০০ শ্লোকে যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা-রামায়ণের পূর্ব্বখণ্ড মাত্র। পরে তিনি ইহার উত্তরখণ্ডরূপে এই বাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনা করেন। রাম বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে (রঘুনন্দনের রামায়ণে রামের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে) পিতার অনুমতি লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় তিনি

মৃগয়ায় বহির্গত হন (রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, এই সময়েই গুহকের সহিত মিত্রতা সংঘটিত হইয়াছিল)। অবশেষে তিনি যাবতীয় বিলাসব্যসনে অমনোযোগী হইয়া চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে গৃহে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার শরীরও ক্রমে ক্রমে কৃশ হইতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থে রামকে গ্রহণ করিবার জন্য দশরথের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রাম-লক্ষ্মণের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ। দশরথ যে রামকে প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, রামের শারীরিক অসুস্থতাও তাহার এক কারণরূপে এই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, অষ্টম সর্গ, ১০-১৩ শ্লোক)। যাহাই হউক, বশিষ্ঠের পরামর্শে অবশেষে রামকে আহ্বান করিয়া সভায় আনা হইলে তাঁহার সহিত বশিষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাই বাশিষ্ঠ রামায়ণে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারত-রামায়ণ

মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্ব্বেও রামায়ণের আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ২৭৩—২৯১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহাতে মার্কণ্ডেয় বক্তা, এবং পাণ্ডবগণ শ্রোতা। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ। ব্রহ্মা রাবণের পিতামহ। ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের গো-নাম্নী পত্নীতে বৈশ্রবণ (কুবের) নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের উপাসনা করিতেন বলিয়া পুলস্ত্য ক্রোধান্বিত হইয়া স্বকীয় আত্মার অর্দ্ধাংশ দ্বারা বিশ্রবা মুনি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে ব্রহ্মা বৈশ্রবণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষগণের আধিপত্য, লঙ্কা-নগরী, এবং পুষ্পক বিমানাদি প্রদান করেন। বৈশ্রবণও বিশ্রবার পরিচর্য্যার জন্য পুষ্পোৎকটা, রাকা, ও মালিনী নাম্নী তিনজন নিশাচরীকে নিযুক্ত করেন। এই পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ জন্ম-গ্রহণ করে। মালিনীর পুত্র বিভীষণ, এবং রাকার খর ও সূর্পণখা নামে এক পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। রাবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। ইহার প্রতিকার কল্পে বিষ্ণু

রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন রূপে দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেবগণের অংশে প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এখানে নূতনত্ব এই যে, ব্রহ্মার আদেশে দুন্দুভী নাম্নী গন্ধর্ব্বী দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কুব্জা মন্থরা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

ইহার পরে বাল্মীকির রামায়ণ-বর্ণিত আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ হইল—

১। জটায়ু যে রামচন্দ্রের পিতৃবন্ধু তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (তু°— বাল্মীকির রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৬৭।২৭)।

২। সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার কালে তারা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাহাকে সুগ্রীবের অনুরাগিণী ভাবিয়া বালী তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল।

৩। রামের হিতকামী অবিন্ধ্য নামক রাক্ষসের উপদেশে ত্রিজটা সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল। এখানে ত্রিজটার স্বপ্ন-বৃত্তান্তও বর্ণিত হইয়াছে। রম্ভার ধর্ষণের পরে নলকুবরের শাপ-প্রভাবে যে রাবণ সীতার প্রতি বল-প্রকাশ করে নাই, ত্রিজটা তাহারও উল্লেখ করিয়াছে।

৪। অঙ্গদ দূতরূপে রাবণের সভায় প্রেরিত হইয়াছিল।

৫। লক্ষ্মণের হস্তে কুম্ভকর্ণ নিহত হয়।

৬। ইন্দ্রজিৎ প্রথমবার যুদ্ধে আসিয়া অদৃশ্য থাকিয়াই রাম-লক্ষ্মণকে পাশাবদ্ধ করে। কিন্তু কুবের-প্রদত্ত জলদ্বারা চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে দেখিতে পান, এবং হস্ত ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। এখানে নিকুম্ভিলা যজ্ঞের উল্লেখ নাই।

৭। ইন্দ্রজিৎ-বধের পরে রাবণ সীতাকে হত্যা করিতে গমন করিয়াছিল, কিন্তু অবিন্ধ্য কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৮। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের অগ্নিতে রাবণ ভস্মীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

৯। রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে দেবগণ সহ দশরথ

প্রত্যক্ষীভূত হইয়া সীতার বিশুদ্ধিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। দশরথের আজ্ঞা ক্রমে রাম পুনরায় অযোধ্যার রাজ্যগ্রহণ করিতে সম্মত হন। এখানে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার উল্লেখ নাই।

১০। রামচন্দ্রের অভিষেকেই এই আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহাতে উত্তরকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত লবকুশের যুদ্ধাদি বর্ণিত হয় নাই।

জৈমিনি ভারত

(২৫শ—৩৬শ অধ্যায়)

অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে লবকুশের যুদ্ধ-বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ-বধ-জনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (ঐ, ২৮১ পৃঃ)। অশ্বরক্ষার ভার শত্রুঘ্নের উপর প্রদত্ত হয় (ঐ, ২৮২ পৃঃ)।

শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধে লব পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন (ঐ, ২৮৯ পৃঃ)। কুশ শত্রুঘ্নকে পরাজিত করিয়া লবকে মুক্ত করেন। তৎপর কুশের নিকটে শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, ভরত, এবং হনুমান-সুগ্রীব-সহ রামচন্দ্র পরাজিত হন। লবকুশ সুগ্রীব ও হনুমানকে বন্দী করিয়া সীতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সীতার আদেশে তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করেন। এদিকে বরুণের যজ্ঞ হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অমৃত-সিঞ্চনে বাল্মীকি সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিলে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। তৎপর লব, কুশ ও সীতা-সহ বাল্মীকি রামের সভায় উপস্থিত হইয়া বালকদ্বয়ের পরিচয় প্রদান করিলে রাম পত্নী-পুত্রকে গ্রহণ করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে সীতার পাতাল-প্রবেশ বর্ণিত হয় নাই।

ভাগবতে রামায়ণ

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে রামলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র দশম অধ্যায়েই বনগমন হইতে আরম্ভ করিয়া

রাবণ-বধের পরে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা শুকদেব কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ইহা রামায়ণের অতি সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ বলিয়া কোন প্রকার নূতনত্বের সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায় না। রাবণ-বধের পরে সীতাকে অতিশয় দীনা দর্শন করিয়াই রামচন্দ্র দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। দুই এক স্থানে এইরূপ কিছু কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।

একাদশ অধ্যায়ে উত্তর কাণ্ডের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিবার কালে স্বকর্ণে সীতার অপবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা শুনিয়াছিলেন। সীতা লবকুশকে বাল্মীকির হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার আশ্রমেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাম ইহা জানিতে পারিয়া সীতার শোকে স্বধামে প্রস্থান করেন। লবকুশের যুদ্ধের বিবরণ ভাগবতে নাই।

ইহা ব্যতীত কয়েকটি প্রধান প্রধান পুরাণ-বর্ণিত রামায়ণের আখ্যায়িকায় যে সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সমাবেশ রহিয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহাদেরও উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। গরুড়পুরাণ

১। রাম সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন।

(পূর্ব্বখণ্ড, ১৪৭ অঃ, ১৫ম শ্লোক)।

২। রাবণ-বধের পরে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্র গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া যথাবিধি পিণ্ডদান করিয়াছিলেন (ঐ, ৪৮-৪৯ শ্লোক)। শিবপুরাণে বনবাসকালে পিণ্ডদানের কথা লিখিত আছে।

২। অগ্নিপুরাণ

১। রামচন্দ্র একদা মন্থরাকে অপমানিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে রামকে বনবাসে পাঠাইবার পরামর্শ দান করিয়াছিল (ঐ, ৬।৮)।

২। বিশ্রবার প্রথমা স্ত্রী পুষ্পোৎকটার পুত্র কুবের, আর দ্বিতীয়া স্ত্রী নৈকসীর পুত্র রাবণাদি। (ঐ, ১২।২)।

সুমালী রাক্ষসের পুষ্পোৎকটা নাম্নী-এক কন্যার সন্ধান পাওয়া যায় (রামায়ণ-তত্ত্ব, ৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৩। শিবপুরাণ

১। বনবাস কালে রামচন্দ্র ফল্গু নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি দ্রব্য-সংগ্রহের জন্য লক্ষ্মণকে গ্রামে প্রেরণ করেন। তৎপর তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তিনি নিজেই গমন করেন। এদিকে সীতা দেখিলেন, শ্রাদ্ধের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন তিনি নিজেই পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণসহ দশরথ জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র আসিয়া সীতার নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হইলেন, কিন্তু মৃত পিতৃগণ আসিয়া সীতার সহিত কথা বলিয়াছেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সীতা ফল্গুনদী, ধেনু, অগ্নি ও কেতকী পুষ্পকে সাক্ষী মান্য করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই ঘটনা অস্বীকার করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল। ইহাতে রামচন্দ্র পুনরায় পিণ্ডদানে প্রবৃত্ত হইলে পিতৃগণ সহ সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইয়া সীতা-প্রদত্ত পিণ্ডের বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া দেন। (ঐ, জ্ঞানসংহিতা, ৩০শ অঃ) ইহাই অবলম্বন করিয়া ভাষা-রামায়ণে রঘুনাথের গয়াপালা রচিত হইয়াছে।

২। রামচন্দ্র সেতুর পুরোভাগে রামেশ্বর শিব স্থাপিত করিয়াছিলেন। নল একদিনে যাহা প্রস্তুত করিতেন, রাক্ষসেরা আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিত। শিব-স্থাপনার পরে তাহারা আসিয়া শিবকে প্রণাম করিয়া যাইত, কিন্তু সেতু ভাঙ্গিত না (ঐ, ৫৭ অঃ)।

৩। দশরথ কামে মোহিত হইয়া কৈকেয়ীকে বরদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, আর তাঁহারই পুত্র রামচন্দ্র সীতার প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতঃ সুগ্রীবের কথায় বালীকে বধ করেন (ঐ, ধর্ম্মসংহিতা, ১৪ শ অঃ)।

৪। কালিকাপুরাণ

দুর্গা-পূজার বিবরণ ঃ—রামের প্রতি অনুগ্রহ, এবং রাবণ-বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে এই মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। প্রবোধিত হইয়া তিনি রামের বাসভূমি লঙ্কায় গমন করেন, এবং স্বয়ং অন্তর্হিত থাকিয়া রাম-রাবণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। এই যুদ্ধ সপ্তাহাধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। সপ্তরাত্র অতীত হইলে নবমীতে মহামায়া রামের দ্বারা রাবণের বধ-সাধন করেন। নবমীতে ব্রহ্মা নিখিল দেবগণের সহিত তাঁহার বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর দশমীতে দেবী বিসর্জ্জিত হন। (ঐ, ৬০ম অধ্যায়, ২৬-৩৮ শ্লোঃ)। ইহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাষা-রামায়ণে রামের দুর্গাপূজার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

৫। পদ্মপুরাণে রামচরিত

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (বঙ্গবাসী সং, ৩৫-৩৮ অঃ), উত্তরখণ্ডে (ঐ, ২৪২-২৪৪ অঃ), এবং পাতাল খণ্ডে (ঐ, ১-৩৮ অঃ) রাম-চরিত বর্ণিত রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশ বিবরণই বাল্মীকির রামায়ণে পাওয়া যায়, তথাপি মধ্যে মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সৃষ্টিখণ্ড

১। রামের প্রতি অগস্ত্যের উক্তি—"তুমি সীতারই ওজোবলে রাবণকে নিহত করিয়াছ (ঐ, ৩৫ অঃ, ৪৩৬ পৃঃ)। আবার উত্তরখণ্ডেও শিব কর্তৃক পরমা প্রকৃতি সীতার স্তব-বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ৯৬৭ পৃঃ)। প্রকৃত পক্ষে ইহাই অদ্ভুত রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। রাম কর্তৃক কান্যকুব্জে বামন-বিগ্রহ স্থাপন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, একদা রাম ভরত-সহ লঙ্কা পুরীতে গমন করিয়া বিভীষণের নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাম বেলাবনে আগমন করিয়া উমাপতির পূজা করেন। সেখানে তৎকর্ত্তৃক রামেশ্বর শিব স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে উভয়ে উভয়ের স্তুতি-পাঠ করিয়াছিলেন (ঐ, ৩৮ অঃ)। ভাষা-

রামায়ণে এই ঘটনা সেতু-বন্ধের প্রাক্কালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। (তুং—কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ২১শ অধ্যায়)।

পাতালখণ্ড

১। রজকের মুখে সীতাপবাদ শ্রবণ করিয়া রাম তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। (ঐ, ৩য় অঃ, ১০০ম শ্লোক)।

২। বিশ্রবার দুই পত্নী—মন্দাকিনী ও কৈকসী। মন্দাকিনীর পুত্র কুবের, আর কৈকসীর পুত্র রাবণাদি (ঐ, ৪ অঃ)।

৩। বিশ্রবার পুত্র বলিয়া রাবণাদিও ব্রাহ্মণপদবাচ্য। অতএব তাহাদের হত্যাজনিত ব্রহ্মবধপাতক হইতে নিষ্কৃতির জন্য অগস্ত্যের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল (ঐ, ৪র্থ অঃ)। বাল্মীকির রামায়ণে লক্ষ্মণের পরামর্শে ইহা অনুষ্ঠিত হয় (ঐ, উত্তরকাণ্ড, ৯৭-৯৯ম সর্গ)। বাল্মীকির রামায়ণে লবকুশের যুদ্ধ-বিবরণ বর্ণিত হয় নাই। বাল্মীকির সহিত যজ্ঞস্থলে রামায়ণ গান করিতে আসিয়া তাঁহারা রামের সহিত পরিচিত হন। কিন্তু পদ্মপুরাণে ইহার পরে ৩৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে এই যজ্ঞের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রামায়ণে লক্ষ্মণকে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার ভার প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু পদ্মপুরাণে শত্রুঘ্ন এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে জৈমিনি-ভারতের আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

লব শত্রুঘ্নের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু কুশ সকলকে পরাজিত করেন। অবশেষে রামের সহিত সীতার মিলন হয়। ভাষা-রামায়ণে ইহাই অবলম্বন করিয়া লবকুশের যুদ্ধ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে সীতার পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হয় নাই।

উত্তরখণ্ড

১। স্বায়ম্ভুব মনু নারায়ণকে তপস্যায় পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিবার বর লাভ করেন। তিনিই দশরথরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী সং, ৯৪২ পৃঃ)।

২। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৩। দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে চরু বণ্টন করিয়া দেন। পরে তাঁহারা আপন আপন ভাগের অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে প্রদান করেন। ভাষা-রামায়ণে এই ভাবেই চরু-বণ্টন বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে দশরথ নিজে তিন রাণীকে চরু ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন (ঐ, আদিকাণ্ড, ১৬ শ সর্গ ২৭-২৯ শ্লোঃ)।

৪। কৌশল্যা রামের শরীরে বিবিধ চিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার জন্মের পরেই তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। ইহাতে রাম মায়া মনুষ্যত্ব অবলম্বন করিয়া শিশুভাবে অবস্থান করেন (ঐ, ৯৪৭ পৃঃ)। তুলনীয়,—ভাগবতের কৃষ্ণজন্ম-আখ্যায়িকা। অধ্যাত্ম রামায়ণেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (ঐ, বালকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ)।

৫। নিহত হইয়া তাড়কা দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল (ঐ, ৯৪৯ পৃঃ)। অধ্যাত্ম রামায়ণেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (ঐ, বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ)।

৬। বিবাহের পরে রামচন্দ্র ১২ বৎসর অযোধ্যায় থাকিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। বাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখা যায়, প্রায় ষোল বৎসর বয়সের সময় রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন (ঐ, বৈরাগ্যপ্রকরণ, ৫ম সর্গ)। অতএব প্রায় ২৮ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহারা বনবাসে গমন করেন। ইহার ১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাম অযোধ্যায় রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন সীতার বয়স ৩৩ বৎসর হইয়াছিল (ঐ,পাতালখণ্ড,২১।৭৭)। লঙ্কাযুদ্ধের স্থিতিকাল ৮৭ দিন (ঐ, ২১।৬৮)। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সীতা স্বীয় পরিচয়-প্রসঙ্গে রাবণকে বলিয়াছিলেন—

বিবাহের পর আমি স্বামীর ভবনে।
দ্বাদশ বৎসর থাকি দিব্য সুখসনে॥

তৎপর বনগমন কালে—

তখন রামের বয়ঃ পঁচিশ বৎসর।
অষ্টাদশ বর্ষ মোর, ওগো দ্বিজবর॥

(রামকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ, আরণ্যকাণ্ড, ৮৪-৮৫ পৃঃ)

এই হিসাবে বিবাহের সময়ে সীতার বয়স ছয়, এবং রামের বয়স তের বৎসর ছিল। অতএব ৩৯ বৎসরে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তখন সীতার বয়স ৩২।

৭। রাম সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন (৯৫৭ পৃঃ)!

৮। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পরে রণজয় করিবার কামনায় রাবণ এক অভিচার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বানরগণ তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে (ঐ, ৯৬১ পৃঃ)। অধ্যাত্ম রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-বধের পরে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (যুদ্ধকাণ্ড, ১০ম সর্গ)।

৯। রাবণের কাটামুণ্ড পুনঃপুনঃ তাহার স্কন্ধে উত্থিত হইয়াছিল (ঐ, ৯৬২ পৃঃ)। বাল্মীকির রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ড, ১০৯ সর্গ) এবং অধ্যাত্ম রামায়ণেও (যুদ্ধকাণ্ড, ১১শ সর্গ) ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

৬। কূর্ম্মপুরাণ

১। পার্ব্বতী জনকের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক রূপলাবণ্যবতী কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনিই সীতা। (ঐ, পূর্ব্বভাগ, ২১শ অঃ, ২১ শ্লোক)।

২। রামচন্দ্র সেতুবন্ধে মহাদেবের পূজা করিয়া শিব স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন,—"যাহারা এই শিবদর্শন করিবে, তাহারা মহাপাতক হইতে মুক্ত হইবে।" ইত্যাদি (ঐ, ৪১-৫৩ শ্লোক)।

৭। দেবী ভাগবত

১। রামচন্দ্র ষোড়শ বৎসর বয়সের সময়ে বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন (ঐ, ৩।২৮।৭)।

২। ইন্দ্র সীতাদেবীর জন্য প্রতিদিন অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ অশোক বনে প্রেরণ করিতেন (ঐ, ৩।৩০।১৬)। (তু° —বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং রাম-রসায়ণ)।

৩। বালীবধের পরে এবং সেতুবন্ধের পূর্ব্বে নারদের উপদেশে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন (ঐ, ৩।৩০ অঃ)। ইহাতে রাবণবধের পূর্ব্বে পূজারও উল্লেখ রহিয়াছে।

৪। হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা এই গ্রন্থের ৭ম স্কন্ধের ১৮-২৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে।

৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ

কৃত্তিবাস-বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান এই গ্রন্থেরও সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

৯। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (পূর্ব্বখণ্ড)

১। মহাদেব হনূমানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ঐ, ১৮।৩৬)।

২। রাবণ ভিক্ষুকের বেশে সীতাকে বলিয়াছিলেন—"কৌশল্যা দেবী তোমাকে দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি অবিলম্বে আগমন কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া প্রস্থান করেন (ঐ, ১৯।৫০-৫১)।

৩। ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে গুপ্তভাবে গমন করিয়া সীতাকে দিব্য চরু ভোজন করাইয়াছিলেন। এইজন্য লঙ্কায় অবস্থান কালে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হন নাই (ঐ, ১৯।৫৭)। রামরসায়নে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (ঐ ২৭১ পৃঃ)।

বাল্মীকির রামায়ণেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। নিশাকর নামক মুনি সম্পাতিকে বলিয়াছিলেন—

গভীর বিষাদে নিমগ্ন হইয়া
অনাহারে সীতা নিয়ত র'বে।
পরে ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া
পরমান্ন তাঁরে পাঠা'য়ে দিবে॥

(রামকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৯৩ পৃঃ)।

৪। রাবণ-বধ করিয়া যাইবার কালে রাম সেতুর উপরে শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন (ঐ, ২২।৫১)।

৫। রামের জয়ার্থে ব্রহ্মাদি দেবগণ অকাল বোধন করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন (ঐ, ২২ অধ্যায়)।

৬। সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে অশোক বনস্থিত এক মন্দিরে হনূমানের সহিত চণ্ডিকার কথোপকথন হইয়াছিল। তৎপর তিনি লঙ্কা পরিত্যাগ করেন। (ঐ, ২০শ অধ্যায়)।

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত একটি আত্মবিবরণী দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আত্মবিবরণীটি যথাযথ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি ॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসার বিদিত ॥
জ্যৈষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি ॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি-প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস ॥

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বইন হৈল সতাই-উদর ॥
মলিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
সূর্য্য-পণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্য-পুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার ॥
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য-গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ॥

দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়-গঙ্গা পার ॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা-সাঙ্গ করিতে প্রথম হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা-সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উম্মাকর।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুর স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
রাজ-পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম।
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা-পূজিত তেঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্য-গীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥

রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম চারি হাত অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর-পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
যত যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥

চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত !
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া-পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি ।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণি ॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা দান ।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত ।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

ইহাই যদি কবির আত্মবিবরণী হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কবি একটি তারিখ-শূন্য চেক দিয়া আমাদিগকে বিদায় করিয়াছেন। কারণ আত্মবিবরণীতে কবি ইহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদিত্যবার পূর্ণ (মতান্তরে পুণ্য) মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিনে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, অথচ সনের উল্লেখ করেন নাই! আবার ইহাও তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চ-গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে কবি ভাষা-রামায়ণ রচনার আদেশ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ রাজার নামের উল্লেখ করেন নাই। এই দুই কারণে তাঁহার আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় গণনা করিয়া প্রথমতঃ স্থির করিয়াছিলেন যে, কৃত্তিবাস ১৩৫৩ শকে ২৯শে মাঘ (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, পৃঃ ৩১৭)। পরে রাজা গণেশের সভায় কবি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তিনিই তাঁহাকে রামায়ণ রচনার আদেশ প্রদান করেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি "পূর্ণ" শব্দকে "পুণ্য" রূপে গ্রহণ করিয়া স্থির করিয়াছেন, কৃত্তিবাস ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও নিজ ধারণার সমর্থক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (তৎকর্তৃক সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা, ৵০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই উভয় তারিখের মধ্যে

৩৪ বৎসরের ব্যাবধান রহিয়াছে। "পুণ্য" শব্দ ধরিয়া গণনা করিলে সমগ্র মাঘ মাসের মধ্যে শ্রীপঞ্চমীযুক্ত রবিবারের সন্ধান করিতে হয়, আর "পূর্ণ" শব্দ গ্রহণ করিলে কেবল ঐরূপ মাঘ-সংক্রান্তির দিনই বুঝা যায়। শেষোক্ত গণনায় অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত বৎসর নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, কবির যে আত্মবিবরণী অবলম্বনে তাঁহার সময় সম্বন্ধে গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতেই আছে যে, কবির বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ ওঝা "বেদানুজ" রাজার সভাসদ ছিলেন। ইহাকে "দনুজ" রূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সুধিগণ কবির সময় নিরূপণে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরাও এখন এই পাঠ গ্রহণ করিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইতিহাসে দুইজন দনুজ রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যিনি প্রাচীনতম তাঁহার নাম দনুজ রায়, বা দনুজ মাধব বা দনৌজামাধব। বলবনের রাজত্ব কালে পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ২য় সং, ১৫৪ পৃঃ, এবং ২য় ভাগ, ২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। তুঃ—Elliot's Muhammadan Historians of India, Vol. III, p. 116)। দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাঁহার নাম দনুজমর্দ্দন দেব। চট্টগ্রাম, মালদহ ও সুবর্ণ গ্রামে ইঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। প্রথমতঃ আমরা দনুজমর্দ্দনকে লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই দনুজ মর্দ্দনকে কেহ কেহ রাজা গণেশের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাদিগকে পৃথক্ ব্যক্তিরূপেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের জন্ম-শক স্থির করিবার উদ্দেশ্যে এই মত-বিভিন্নতা অগ্রাহ্য করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, কারণ উভয়েই প্রায় সমসাময়িক। গণেশের রাজত্বের সময় ১৪১৪ হইতে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ (১৩৩০ সালের প্রবাসী দ্রষ্টব্য), আর দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার তারিখও ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ যদি দনুজমর্দ্দনের পাত্র হন, তাহা

হইলে গণেশের রাজত্বকালে তাঁহার নিকট হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার নির্দ্দেশ পাওয়াও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসের নিজের উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি দনুজমর্দ্দন বা রাজা গণেশের অনেক পরবর্ত্তী-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ দনুজমর্দ্দনের সমসাময়িক।

এখন দনৌজামাধব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক! ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বর্ত্তমানতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে যদি কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ বর্ত্তমান থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কৃত্তিবাস ইহার প্রায় একশত ষাট বৎসর পরে (তিন পুরুষে এক শত বৎসর) বর্ত্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে। অতএব ১২৮০+১৬০=১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসকে পাওয়া যাইতেছে। রাজা গণেশের সময় ইহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব তাঁহার সভায় কৃত্তিবাসের উপস্থিত থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কৃত্তিবাস রাজা গণেশের উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার আদেশকারীকে (বর্ত্তমানে ইহাও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে) কেবল "গৌড়েশ্বর" আখ্যায় অভিহিত করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশের অভাব সত্ত্বেও তিনি গৌড়েশ্বরের সভার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় কিনা, এখন আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥

*　　*　　*

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥ ইত্যাদি

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মুকুন্দকে রাজার প্রধান পণ্ডিত, এবং জগদানন্দকে মহাপাত্রের পুত্র বলা হইয়াছে। কুলগ্রন্থের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ভাতুড়ী তাহেরপুরের রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্যা এবং কংসনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মুকুন্দ ভাতুড়ী, এবং তিন পুত্রের নাম সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ, ও জগদানন্দ রায়।[১] কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে জগদানন্দকে মহাপাত্রের পুত্র বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাতুড়ীই "গৌড়েশ্বরের" মহাপাত্র ছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ছিলেন প্রধান পণ্ডিত। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সম্পর্কান্বিত এই সকল ব্যক্তিগণের উল্লেখ দৃষ্টে আমাদের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ কংসনারায়ণ রাজা গণেশের বহু পরবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের গণেশের সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের পুত্র জগদানন্দের উপস্থিত থাকাত সম্পূর্ণই অসম্ভব! গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর ভ্রাতা গোবিন্দ বসুর উপাধি ছিল গন্ধর্ব্ব খাঁ। তিনি প্রায় হুসেন সাহের (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক। আত্মবিবরণীতে গন্ধর্ব্ব রায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। ইঁহারা সকলেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব রাজা গণেশের সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি নাম-সাদৃশ্য হেতু তাঁহাদিগকে কংসনারায়ণের সম্পর্কান্বিত বলিয়া গ্রহণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। বস্তুতঃ প্রাচীন এবং আধুনিক যুগে বাঙ্গালীগণের মধ্যে এই জাতীয় নামের অভাব নাই! কিন্তু আত্মবিচরণীতে

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কিভাবে ইঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাই অনুধাবনের বিষয়। প্রথমতঃ পরস্পর সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণের সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায়, কারণ জগদান্দকে মহাপাত্রের পুত্র বলা হইয়াছে। অতএব পিতাপুত্রের ঐ সভাতে বর্ত্তমানতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত মুকুন্দেরও উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা পরস্পর সম্পর্কান্বিত। কেদার খাঁর সহিত নারায়ণের উল্লেখ একই পঙ্‌ক্তিতে দৃষ্ট হয়। কুলগ্রন্থের প্রামাণে জানা যায়, জগদানন্দের ভ্রাতা কেশব খাঁর এক জামাতার নাম ছিল নারায়ণ (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব নারায়ণ ও জগদানন্দ সমসাময়িক। শুধু তাহাই নহে, যেখানে দনুজ বেদানুজে পরিণত হইতে পারে, সেখানে কেসব যে কেদারে পরিণত হয় নাই, তাহাও নিশ্চয় করিয়া অস্বীকার করা যায় কি? প্রাচীন লিপিতে দ ও স এর বিভিন্নতা বড় বেশী নহে। অনেক সময়েই অর্থগ্রহণ করিয়া ইহা পাঠ করিতে হয়। তাহা হইলে শ্বশুর জামাতারও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কেশবকে বাদ দিলেও জগদানন্দ ও নারায়ণে ঐ সম্পর্কই হয়। অন্যান্য ব্যক্তিগণের নামের ঠিক পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। যাঁহারা "শ্রীবৎসকে" "শ্রীকৃষ্ণে" পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন, তাঁহারাও একেবারে যুক্তিহীন নহেন। তারপর "গৌড়েশ্বরের" নাম নাই, তাঁহার আবার "ধর্ম্মাধিকারিণী" ও "মহাপাত্র"! ইহা কাল্পনিক সৌধ বলিয়াই মনে হয়। সে যাহাই হউক, মুকুন্দ, জগদানন্দ, কেশব খাঁ, নারায়ণ প্রভৃতি পরস্পর সম্পর্কান্বিত সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সন্ধান যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহারাই যে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে একসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, আর এই সকল ব্যক্তিগণের সময় সম্বন্ধে ধারণা করিয়াই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। আত্মবিবরণী অবলম্বনে কৃত্তিবাসের সময়-নির্দ্ধারণের দুইটি পন্থা রহিয়াছে। প্রথমতঃ কবির বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ যে "বেদানুজ" রাজার পাত্র ছিলেন তাঁহার সময় হইতে গণনা করিয়া, দ্বিতীয়তঃ কৃত্তিবাসের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের কাল নির্ণয় করিয়া। ইহাদের মধ্যে কোনটি নির্ভরযোগ্য

তাহাই বিবেচনা করা যাউক। কৃত্তিবাস তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ সম্বন্ধে লোকের মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছেন, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তিনি নিজের চক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন। অতএব শেষোক্ত পন্থাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। বিশেষতঃ "বেদানুজ" রাজার কোন বিবরণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং এইরূপ নাম কাহারও থাকিতে পারে ইহাও ধারণার অতীত। আমরা যে এই শব্দকে "দনুজ" রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া গণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা অনুমান মাত্র, অতএব সন্দেহের অতীত নহে। কিন্তু যখন কবি বলিতেছেন যে, রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি ব্যক্তি বিশেষকে দেখিয়াছেন তখন তাহাই তাঁহার প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান-সম্ভূত সত্য ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই জন্য কবির সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সময় নির্দ্দেশ করিয়াই তাঁহার আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা একমাত্র সঙ্গত উপায় বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, কবির সমসাময়িক ব্যক্তিগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ঐ সময়েই কৃত্তিবাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এই সময়ের একমাত্র প্রতাপশালী হিন্দু রাজা ছিলেন কংস-নারায়ণ। যখন দেখা যায় যে, কংসনারায়ণের সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণের উল্লেখই কৃত্তিবাস করিয়াছেন, তখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কবি কংসনারায়ণ হইতেই হয়তঃ রামায়ণ-রচনার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কবির আত্মবিবরণীর যথার্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহার মাতাপিতা ও ভ্রাতাগণের পরিচয় যে ভাবে ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, প্রায় সেই ভাবেই ইহা ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে (নগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ, ৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন পুথিতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া যে ইহা সম্পূর্ণই নির্ভরযোগ্য তাহা বলা যাইতে পারে না। প্রথমতঃ কবির আত্মবিবরণী হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় রামায়ণের একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া দীনেশ বাবুকে প্রদান করেন, এবং ইহা তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে

মুদ্রিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে পুঁথি হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই, এবং চেষ্টা করিয়াও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই (সম্প্রতি নাকি ভট্টশালী মহাশয় ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন)। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, কৃত্তিবাস তাঁহার জন্মের বারতিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বৎসরের উল্লেখ করেন নাই। "পঞ্চগৌড়েশ্বরের" উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই গৌড়েশ্বরের নাম লিখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ইহা ইচ্ছাকৃত সত্য গোপন করিবার চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। তারপর কোন গৌড়েশ্বরের সভায় কবি আদৌ উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা তাহাতেই সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। যাঁহাকে তিনি পঞ্চগৌড়েশ্বর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, যাঁহার দ্বারীর হস্তে "সুবর্ণের লাঠি", এবং "নয় দেউটি" পার হইয়া যাঁহার সভায় প্রবেশ করিতে হয়, তিনি যে "পাটের চাঁদোয়ার তলে বসিয়া মাঘ মাসের খরা পোহাইবেন" ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কোন গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র লইয়া সভা করিয়া মাঘ মাসের রৌদ্র পোহাইবেন ইহা ধারণার অতীত। ইহা পাঠ করিলেই কোন আরামপ্রয়াসী হিন্দু জমিদারের চিত্র মানসপটে ফুটিয়া উঠে। মনে হয় বন্ধুবান্ধব সহ তৈলমর্দ্দন সুখ উপভোগ করিতে করিতে যখন তিনি বিশ্রম্ভালাপে মত্ত ছিলেন, তখন কবি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এই গৌড়েশ্বরের সভায় একটিও মুসলমান কর্ম্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায় না। রাজা গণেশ অল্প সময়ের জন্য গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার পুত্রের মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার সভা যে একেবারে মুসলমান-বর্জ্জিত ছিল ইহা কল্পনা করাও কষ্টকর। যে বর্ণনা আমরা পাইতেছি তাহা কোন প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারের কথাই মনে করাইয়া দেয়। তাঁহাকে পঞ্চগৌড়েশ্বর আখ্যায় অভিহিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। ইহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই বলিয়াই তিনি তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব কবিবর গৌড়েশ্বরের সন্ধান করিতে যাইয়া কোন স্বাধীন নৃপতির খোঁজ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। তাঁহার পিতৃব্য যে

গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে ঘোড়া পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও এইরূপ কোন হিন্দু রাজা হইবেন, অতিশয়োক্তির বাহুল্যে গৌড়েশ্বরে পরিণত হইয়াছেন। আত্মবিবরণীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা কবির জন্ম শকটি গোপন করা, নতুবা বার, তিথির উল্লেখ করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিবার কারণ অনুমান করা যায় না। এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবির বংশ-পরিচয়ের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক, কৃত্তিবাস যদি কোন রাজার সভায় উপস্থিত হইয়াই থাকেন, তাহা হইলে তিনি কংসনারায়ণের সভাতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কংসনারায়ণের সময় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ডাঃ ভট্টশালী রাজসাহী গেজেটিয়ারের উল্লেখ করিয়াছেন (রামায়ণ, ভূমিকা, ৵০ পৃঃ)। তাহা হইতে জানা যায় যে, কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া গণনা করিলে কংসনারায়ণের সময় প্রায় ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দই হইয়া থাকে। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয় তাঁহাদিগকে পিতাপুত্র হিসাবে গণনা করিয়া কংসনারায়ণের অভ্যুদয় কাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিজের মত সমর্থনকল্পে তিনি এখানে কুলগ্রন্থের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু তাহিরপুরের ম্যানেজার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণ (যাহা রাজসাহী গেজেটিয়ারে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাই) এই ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ করা সঙ্গত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

দুই একখানি প্রাচীন-সাহিত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াও কংস-নারায়ণের সময় সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। প্রেমবিলাসে আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যবে হৈলা আবির্ভাব।
সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব॥

ইহা উক্ত গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসই লিখিয়া থাকুন বা পরবর্ত্তী সংযোজনাই হউক, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি যে পূর্ব্বকালে ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, প্রেমবিলাসের উক্তির

মূলে সত্য নিহিত আছে, অর্থাৎ কংসনারায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে, হোসেন সাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে কংসনারায়ণ বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন (মধ্যযুগের বাঙ্গালা, পৃঃ ১১, ২৫, ২৬ ; এবং গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩)। ইঁহারও ইতিহাসিক, অতএব ইঁহাদের সিদ্ধান্তও অবিশ্বাস্য নহে।

এখানে বেদানুজ বা দনুজ রাজা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। জীব গোস্বামী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ পদ্মনাভ দনুজ মর্দ্দন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। আবার অদ্বৈত প্রভুর পিতামহ নরসিংহ নাড়িয়ালও দনুজমর্দ্দনের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে দনুজমর্দ্দন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া "অদ্বৈত-বাল্যলীলা-সূত্রে" লিখিত আছে। অতএব প্রাচীন সাহিত্যে আমরা সে দনুজ রাজার উল্লেখ পাইতেছি, তিনি রাজা গণেশের সমসাময়িক দনুজমর্দ্দন। তাঁহারও ১৩৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী (১৪১৮—১২৮০= ১৩৮) দনুজমাধবের উল্লেখ যে কৃত্তিবাস করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না, কারণ এই দূরত্ব আমাদিগকে আরও বেশী অনিশ্চয়তার তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কবির পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল, তাই বেদানুজের উৎপত্তি। অতএব ইহা নির্ভরযোগ্য নহে। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিষয় বিবেচনা করাও আমরা সঙ্গত মনে করি। চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু পূর্ব্বে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন, আর পরাগল খাঁনের পূর্ব্ববর্ত্তী সঞ্জয়ের সময়ে মহাভারতের অনুবাদ সাধিত হয়। গণেশের সময়ে কৃত্তিবাস বর্ত্তমান থাকিলে দেখা যায় যে, ইহারও প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণের অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা সমর্থিত হয় না, কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই এদেশবাসিগণ সাহিত্য-সাধনার নব প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে অনুবাদ সাহিত্যের প্রারম্ভ সূচিত হয় নাই। অতএব কৃত্তিবাসের রামায়ণ ইহারও বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে

প্রবৃত্তি হয় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে এই নবযুগের ছাপ লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃত্তিবাস সম্বন্ধে প্রাচীনতম নির্দ্দেশ কোথায় পাওয়া যায়। ১৪০৭ শক বা ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে কৃত্তিবাসকে কবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন সময়ে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিলেও উক্ত গ্রন্থ রচনার সময়ে তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রচারিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ তথাকথিত কবির আত্মবিবরণী হইতেই জানা যায় যে, তিনি পাঠ-সমাপ্তির পরেই রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাতে কংসের সভায় অল্প বয়সেই তাঁহার উপস্থিতি সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ ফুলিয়াতে কৃত্তিবাসের যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে "আবির্ভাব ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে।" যাঁহারা এই তারিখটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নতুবা আধুনিক গবেষকগণের মত-বিরুদ্ধ এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিতে সাহস করিতেন না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের সময় লইয়া গবেষণা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজাগণেশের বহু পরে যে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই তত্ত্ব এদেশে নানাভাবেই প্রচারিত ছিল।

দ্রষ্টব্য ঃ—নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার সংগৃহীত কিছু পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করিয়াছে। তাহার মধ্যে নাকি কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর তিন পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভট্টশালী মহাশয় ইহার সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৫ সংখ্যক পুথির সংযোগ সাধন করিয়াছেন, এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহাই হারাধন দত্ত মহাশয়ের মূল পুথি, যাহার নকল তিনি দীনেশ বাবুকে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে।

যাহাই হউক, সাহিত্য-পরিষদের ১৫ সংখ্যক পুথির লিপিকাল ১২৪০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। কৃত্তিবাস ইহার বহু পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব ইহা সমসাময়িক বিবরণ নহে। বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক আলোচনার যে ধারা অধুনা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহাতে উনবিংশ শতাব্দীর

কোন বিবরণ অবলম্বনে ইহার প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘটনার নির্দ্দেশ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের এত পুঁথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, অথচ তাহাদের একখানিতেও এই আত্মবিবরণের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত একখানি পুথিতে হঠাৎ ইহার আবির্ভাবে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। ভট্টশালী মহাশয় যে ভাবে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, আদিকাণ্ডের প্রথমেই ইহা সন্নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু আদিকাণ্ডের এত পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের একখানিতেও ইহার প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, কৃত্তিবাসের মূল রচনায় ইহা ছিল না, নতুবা নকলকারিগণ এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি পরিত্যাগ করিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইতেন না। ভট্টশালী মহাশয় ভারতবর্ষ পত্রে যেভাবে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা প্রচারিত হইয়াছে।

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমি পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মর্দ্ধে জন্মিলেন পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

ইহাকে কিছুতেই কৃত্তিবাসের নিজের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অথচ ইহার পরেই রহিয়াছে—

শুভক্ষণে গর্ব্ভে থাকি পড়িলাম ভূতলে।

প্রথম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়া এখানে হঠাৎ উত্তম পুরুষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া খ্যাতি রহিয়াছে, অতএব তিনি যে এইভাবে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা ধারণার অতীত।

তারপর নব প্রকাশিত পুথির পাঠে আছে—

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥

এই উক্তির সমন্বয় সাধন করিবার জন্য ভট্টশালী মহাশয় পাদটীকায় নিজের রচনা কিছু সংযোজিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও বিপদ কাটে নাই।

ইহাতে পিতামহ ও পৌত্র একই রাজার পাত্র হইয়া পড়েন। ভট্টশালী মহাশয় "ইহা একেবারে অসম্ভব নহে" লিখিলেও, আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আর এইভাবে যোড়াতালি দিয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার সত্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রথা যে বিজ্ঞান-সম্মত তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপ অসামঞ্জস্য এই আত্মবিবরণীর অনেক স্থানেই রহিয়াছে। ভট্টশালী মহাশয়-প্রদত্ত পাদটীকা পাঠ করিলেই এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি ১৩৪৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ইহার পরে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কুলগ্রন্থ ও সমীকরণ প্রভৃতির আলোচনায় অনেক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা উপভোগ্য বটে। যে সময়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া কুলগ্রন্থের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই সময়ে অন্য একজন ঐতিহাসিক (যাঁহার সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, "পাথূর্‌যা প্রমাণ" ব্যতীত তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না) কুলশাস্ত্রকেই ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা এতদিন আমাদিগকে ঐতিহাসিক আলোচনার রীতি শিক্ষা দিয়াছেন, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে উল্লেখ নাই বলিয়া যাঁহাদের উপদেশে আমরা বঙ্গে ব্রাহ্মণাদির আগমন ও বল্লালের কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্ত্তনের আখ্যায়িকায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি, তাঁহাদের এই পরিণতি দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অধিকাংশ ব্যক্তির, বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে গণ্যমান্য অধিকাংশ ব্যক্তির, স্বভাব এই যে, তাঁহারা অসতর্কভাবে কখনও কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া ফেলিলে, যে ভাবেই হউক, সেই কথাটাকে প্রবল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন (ঐ, ৫ম খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ)। এখানেও আমরা ইহারই সন্ধান পাইতেছি। ভট্টশালী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা পাঠ করিলে দেখা যায়

যে, গণেশের সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যোগেশ বাবুকে পুনরায় গণনার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ১৩২০ শক কবির জন্ম-বৎসর বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। যোগেশবাবুও লিখিয়াছেন—"১৩২০ শকের পরে ১৩৩৭ শকে ৮ই মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী পাইতেছি। কিন্তু সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১৩৫৭-১৩৬০ শকে হিন্দু গৌড়েশ্বর চাই। ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে কাহাকেও পান নাই। অতএব কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে স্বীকার করিতে হইতেছে (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, পৃঃ ১৪)। অতএব যোগেশবাবুও স্বীকার করিতেছেন যে, কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই নূতন গণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল ভট্টশালী মহাশয়ের ভ্রান্ত ধারণা হইতে, অতএব এই ফরমাইজী গণনার মূল্য এইভাবেই নির্দ্দেশিত হওয়া উচিত। ইহা সে সম্পূর্ণ ই কল্পনা-প্রসূত তাহা বুঝা যায় যখন আমরা দেখিতে পাই যে, এই নবপ্রকাশিত আত্মবিবরণীতেও গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক রামায়ণ-রচনার নির্দ্দেশের উল্লেখ নাই, এবং এই তথা-কথিত গৌড়েশ্বরেরও নাম নাই। এই অবস্থায় গণেশের পরিকল্পনা করিয়া গণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই মনে হয়। আর "পূর্ণ" অথবা "পুণ্য" ধরিয়া গণনা করিলে অনেক বৎসরেই রবিবারে শ্রীপঞ্চমীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে (যেমন এই ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দেও রবিবারে সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে)। যোগেশবাবুও প্রথম গণনায় ১২৫৯, এবং ১৩৫৪ শক নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, তিনি পুনরায় গণনা করিলে ইহার পরেও শ্রীপঞ্চমীযুক্ত রবিবারের সন্ধান পাইবেন। যাহাই হউক, কৃত্তিবাসের পক্ষে গৌড়েশ্বরের নাম, ও নিজের জন্ম-শক গোপন করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু ইহাতে আত্মবিবরণীর প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, এই তথা-কথিত আত্মবিবরণী অবিশ্বাস্য এবং জাল। কৃত্তিবাসের বহু পরবর্ত্তীকালে কেহ রচনা করিয়া ইহা কৃত্তিবাসের

নামে চালাইয়াছেন। এখন ইহা অবলম্বন করিয়া কবির সময় নির্দ্দেশ করিবার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আত্মবিবরণীর "বেদানুজ" এবং "গৌড়েশ্বর" রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতার "মহারাজ মহেন্দ্র রায়ের" সমপর্য্যায়ভুক্ত।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"কৃত্তিবাস উৎসাহ হইতে অধস্তন নবম পুরুষ। বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, উৎসাহ বল্লালের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎসাহের জন্মকাল ধরিলে তিন পুরুষের ১০০ বৎসর পরিকল্পনাপূর্ব্বক আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃত্তিবাসের জন্মকাল পাইতেছি।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৩ পৃঃ)। তিনপুরুষে এক শত বৎসর ধরিয়া গণনা করিলে এই হিসাবে কৃত্তিবাসের বর্ত্তমানতার সময় ১১৬৭+৩০০=১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়, "চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে" নহে। উৎসব কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কল্পনা করিয়া তিন পুরুষে একশত বৎসর গণনা করা হয় না। আর তাহা হইলেও কৃত্তিবাসের জন্মকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হয়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নহে। অতএব রামায়ণ রচনা দূরে থাকুক, গণেশের সময়ে কৃত্তিবাস সবে মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময়ে বল্লালের সভায় উৎসাহ পূজিত হইয়া থাকিলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী হইবার ফলে কৃত্তিবাসকে লইয়া এইভাবে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। দীনেশবাবু আরও লিখিয়াছেন—"১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, তাহার পূর্ব্বে অদ্বৈত ও শ্রীনিবাস (নরহরি কি ?) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের সময় কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে তাঁহার উল্লেখ অবশ্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে থাকিত। জয়ানন্দ 'অগ্রবর্ত্তী কবি স্বরূপ অপরাপর কবির সঙ্গে কৃত্তিবাসের বন্দনা করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু ফুলিয়ার গিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় কোনও বিবরণেও ফুলিয়ার কবির কোনও নাম নাই।" ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কৃত্তিবাস বহু পূর্ব্বে ধরাধাম হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবি মরিয়া

গেলেও তাঁহার খ্যাতি লোপ পায় না। অতএব এই সিদ্ধান্তের মতান্তরই সম্ভবপর। কৃত্তিবাস যদি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রামায়ণ রচনা করেন, তাহা হইলে ইহার প্রায় এক শত বৎসর পরবর্ত্তী চৈতন্যদেবের সময়ে তাঁহার কবি-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই ধারণা জন্মিয়া থাকে। অতএব বৈষ্ণবগণের কোনও সমসাময়িক বিবরণে এমন কি ফুলিয়ার বর্ণনাতেও, কোন না কোন প্রকারে কৃত্তিবাসের উল্লেখ থাকাই সম্ভবপর ছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখনও কৃত্তিবাস প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, নতুবা কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থে নিশ্চয়ই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কৃত্তিবাসের জন্মকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা এতদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধিবলে জাল দলিলের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, এই আত্মবিবরণীর ব্যাপারে তাঁহারা যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন!

কৃত্তিবাসী রামায়ণঃ—বাল্মীকির রামায়ণ যেমন অন্যের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণেও সেইরূপ অন্যের হস্তচিহ্ন লক্ষিত হয়, যথা—

দণ্ডবত হয়্যা কিত্তিবাসের চরণে।
জাহার প্রসাদে লোক রামায়ণ শুনে॥
আদিকাণ্ড গাইল কিত্তিবাস বিচক্ষণ।
এইখানে রহিল প্রভু রামের কির্ত্তন॥

কঃ বিঃ, ১ সং পুথি, ১৩ পৃঃ (Cf. D. C. I., p. I)

অন্যত্র—

ফুলিয়া সমাজ মধ্যে পণ্ডিত কীত্তিবাস।
ভাষায় রামায়ণ তেঁহো করিলেন প্রকাশ॥
কীত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পুথি রক্ষিত আছে, এবং তাহার আংশিক বিবরণও মুদ্রিত হইয়াছে (D.C., Vol. I দ্রষ্টব্য)। তাহার যে কোন সর্গের দুইখানি পুথি মিলাইয়া দেখিলেই উল্লিখিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। অধুনা যদি কেহ সংস্কৃত রামায়ণ অনুসরণ করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ গঠিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেও খাঁটি কৃত্তিবাসকে পাওয়া যাইবে কি? প্রচুর "সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপ-পাঠের বাহুল্য, এবং অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির" মধ্যে কোন্ কবি কৃত্তিবাসের কবি-খ্যাতির উপকরণ কতটা যোগাইয়াছেন, তাহা সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

যাহাই হউক, কৃত্তিবাসকে আমরা যেভাবে পাইতেছি, তাহাই অবলম্বন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, যুগে যুগে ইহা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ইহার ভাব ও ভাষা সর্ব্বসাধারণকে রস পরিবেশন করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছে। ইহাতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন যাহাই থাকুক না কেন, সাধারণের মনস্তুষ্টি বিধানের উপকরণের অভাব ইহাতে লক্ষিত হয় না। রামায়ণ প্রধানতঃ পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতি, অবিচলিত দাম্পত্যপ্রেম, এবং অপূর্ব্ব প্রভু-ভক্তির আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক সংসারে এবং সমাজে এই সকল মহনীয় আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। অতএব সামাজিক স্মৃতি-গ্রন্থ হিসাবেও ইহা প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার উপর মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার ঐন্দ্রজালিক তুলিকা স্পর্শে ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র ও চিত্র চিত্তাকর্ষক করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঘটনাবৈচিত্র্যেও ইহা অতুলনীয়। এই কৃতিত্ব বাল্মীকির, কৃত্তিবাস তাঁহারই অনুকরণ করিয়াছেন। সংস্কৃতের দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার রসাস্বাদন করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কৃত্তিবাস ভাষাপথে রামায়ণের স্রোত সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব

লোকের প্রয়োজনের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবার কারণ সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি পানীয়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বিচার করিবার অবসর পায় না। কৃত্তিবাস এইরূপ অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। কবির কৃতিত্ব যাহাই থাকুক না কেন, লোকে যাহা পাইয়াছিল তাহাই হৃষ্টচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

অধুনা শ্রাদ্ধ-বাসরে কীর্ত্তন গানের প্রথা বিশেষ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুর্ব্বে এই সব ব্যাপারে রামায়ণগানের রীতিও প্রবর্ত্তিত ছিল। কোন বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধের পরে রামায়ণগান অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, নতুবা নাকি বাড়ী দোষমুক্ত হইত না, এবং আত্মীয়গণের বিপদের সম্ভাবনা থাকিত। জীবনে এইরূপ রামায়ণগান অনেকবার শুনিয়াছি, এবং প্রতিবারেই দেখিয়াছি যে, গায়েনগণ কৃত্তিবাসের ভণিতা সহই পালা গান করিয়াছেন। হনূমান কিরূপে মন্দোদরীর নিকট হইতে রাবণের মৃত্যুবাণ আহরণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শুনিয়া শৈশবে পরিতৃপ্ত হইতাম। গানের প্রথমেই গায়ক কৃত্তিবাসের বন্দনা করিয়া পালা আরম্ভ করিতেন, এবং কবির ভণিতাতেই গানের পরিসমাপ্তি হইত। অধুনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের যেসকল খণ্ডিত পুথি পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই এইভাবে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবির গ্রন্থ বিভিন্ন পালায় বিভক্ত হইয়া এইরূপে যুগে যুগে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। কাজেই কৃত্তিবাসের প্রসিদ্ধি মলিনতা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, এবং আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া ক্রমেই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই সকল বিশেষত্ব বর্জ্জিত করিয়া কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করিলে তাহাতে পণ্ডিতগণের আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনায় তাঁহার কবি-খ্যাতি মলিনতা প্রাপ্ত হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কৃত্তিবাস রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, আখ্যায়িকার অনুবাদ

করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় কল্পনাবলে লোক-মনোরঞ্জনের প্রভূত উপাদানও ইহাতে সঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। হনুমান লঙ্কাদগ্ধ করিতে উঠিয়াই প্রথমে "বড় ঘরের চালের" উপরে পতিত হইলেন। রাবণের সোনার লঙ্কা যেন ফুলিয়ার পল্লীবিশেষ। কুম্ভকর্ণের নাক-কান "পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান" (বঙ্গবাসী—সং, ২৮৬ পৃঃ)। নিদ্রাভঙ্গের পরে যে সকল হাঁড়ি হইতে তিনি মদ খাইয়াছিলেন, তাহাও এক একটি পঁচিশের বন্দ ঘরের ন্যায় (ঐ, ২৮০ পৃঃ)। ইহার উল্লেখ করিয়া কোন সমালোচক লিখিয়াছেন—"যে যত বলুক, এবং কৃত্তিবাসের রাজরাজড়া ও নবাবসুখোর সভায় বেড়ানর যতই প্রমাণ দিউক, আমি কিন্তু কেবল তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়াই বলিতে পারি যে, কৃত্তিবাস তাঁহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লী ফুলিয়ার চতুঃসীমার বাহিরে কখনও যান নাই" (ব-সা-প-পত্রিকা, ১৩০৪ সাল, পৃঃ ১৩৯)। উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বর্ণনা কবির আত্মবিবরণীতে রহিয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। যে গৌড়েশ্বরের সভায় তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন, যাঁহার দ্বারীর হস্তে সুবর্ণের লাঠি, এবং "নয় দেউটি পার হইয়া" যাঁহার সভায় প্রবেশ করিতে হয়, তিনি "পাটের চাঁদোয়ার নীচে বসিয়া মাঘ মাসের খরা পোহাইতেছেন"! ইহা পাঠ করিলেই অবিশ্বাসের হাসি মুখে ফুটিয়া উঠে।

যাহাই হউক, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির রামায়ণ-বহির্ভূত অনেক ঘটনাই সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ —বাল্মীকি কর্ত্তৃক নারদকে সর্ব্বগুণশালী আদর্শ পুরুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন। তাহার উত্তরে নারদ কর্ত্তৃক রাম-চরিত্র বর্ণন। তমসা তীরে ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধ দর্শনে বাল্মীকির মুখে শ্লোকের আবির্ভাব। ব্রহ্মার আগমন ও তৎকর্ত্তৃক রামায়ণ রচনার আদেশ। বাল্মীকি কর্ত্তৃক রামায়ণ রচনা, এবং লবকুশকে শিক্ষাদান। তৎপর রামের সভায় কুশীলবের রামায়ণ গান উপলক্ষে অযোধ্যার বর্ণনা হইতে রামায়ণের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথমেই গোলোক ও নারায়ণের চারি অংশে আবির্ভাবের বিবরণ, তৎপর রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যান, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বাল্মীকি নামকরণ, এবং রামায়ণ

রচনার নির্দ্দেশ প্রদান প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে। ইহাতে উত্তরকাণ্ডের শেষভাগে রামের সভায় লবকুশ কর্ত্তৃক রামায়ণ গানের বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সংস্কৃত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহা কৃত্তিবাসে পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় দশরথ প্রথমতঃ ভরত ও শত্রুঘ্নকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন, পরে এই ছলনা ধরা পড়িলে তিনি রামলক্ষ্মণকে প্রেরণ করেন, মূল রামায়ণ-বহির্ভূত এই ঘটনা প্রচলিত কৃত্তিবাসে বর্ণিত রহিয়াছে। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন ব্যাপারে নবদ্বীপ, মাহেশ প্রভৃতির উল্লেখও মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না। এই প্রকার অসামঞ্জস্য গ্রন্থের অনেক স্থলেই রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। তরণীসেন-মহীরাবণ-অহীরাবণ বধ ও বীরবাহুর যুদ্ধ বিবরণ, রাবণ বধের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব এবং একটি নীলপদ্মের অভাবে নিজের চক্ষু উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, হনুমান কর্ত্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে গণকবেশে রাবণের মৃত্যুবাণ আহরণ, মৃত্যুর পূর্ব্বে রাবণ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে রাজনীতি কথন, এবং লবকুশের যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রভৃতি বাল্মীকির রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রহিয়াছে। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে আদর্শ মনুষ্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসে তাঁহার উপর দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে, অথচ তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সুখ-দুঃখের অতীত নহেন। বাল্মীকির রামায়ণ ব্যতীত অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবও এখানে পতিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বনগমন কালে কৌশল্যা রামচন্দ্রের যে কঠোর ভুজের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে এই অনুবাদে আমরা নবঘনশ্যাম রামকেই প্রত্যক্ষ করি, এবং রাক্ষসগণের মধ্যেও তাঁহার ভক্ত-গোষ্ঠীর অভাব নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রভাবিত বঙ্গদেশে রামচন্দ্রের এই চিত্র যে লোকের মনোরঞ্জন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাল্মীকির রামায়ণে সীতা তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রমণী। বন-গমনের প্রাক্কালে তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"আমার বিবাহের পূর্ব্বে আমার পিতা তোমাকে আকারে পুরুষ ও কার্য্যে স্ত্রীলোক কল্পনা করিতে

পারেন নাই।” লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে পাঠাইবার কালে তিনি তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অশোক বনে তিনি প্রভূত কঠোরতার সহিত রাবণের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রাবণবধের পরে অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাবে তিনি রামকে “ভদ্রেতর ব্যক্তি” বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকেই আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙ্গালীর কূলবধূরূপে পাইতেছি। বস্তুতঃ আমাদের ঘরের লোক অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রাম-সীতা-লক্ষ্মণ প্রভৃতি আমাদের নিকট বেশী পরিচিত। এইজন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমগ্র-ভারতের রামায়ণ না হইয়া বাঙ্গালীর রামায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। তারপর যুগে যুগে এই গ্রন্থের ভাষা ও ছন্দ পরিমার্জ্জিত হওয়াতে ইহা সর্ব্বদাই আধুনিকতার ছাপ লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ সর্ব্বপ্রথম ইহা মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার প্রচলন করিয়া দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই সকল কারণে এখনও বঙ্গদেশে সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে।

কৃত্তিবাসে অন্যান্য পুরাণাদির প্রভাব :—অধ্যাত্ম রামায়ণের ষষ্ঠ সর্গে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বনবাস কালে রামচন্দ্র যখন বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন উক্ত মুনি রাম নামের মাহাত্ম্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত রামের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কিরাত-সংসর্গে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা সাতজন মুনির পরিচ্ছদাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“তোমার এই পাপের ফলভাগী তোমার পরিজনবর্গ হইবে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। যখন কেহই তাঁহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন তিনি আসিয়া মুণিগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি “মরা, মরা” যুগসহস্রকাল যপ করিতে করিতে বল্মীক-স্তুপে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে মুনিগণ পুনরাগমন করিয়া তাঁহাকে উক্ত স্তুপ হইতে বহির্গত করিয়া তাঁহার “বাল্মীকি” নামকরণ করিয়া প্রস্থান করেন।

ইহাই রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যানরূপে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্থান লাভ করিয়াছে। ডাঃ ভট্টশালী বলিতে চাহেন যে, ইহার আদি অনুবাদক অদ্ভুতাচার্য্য। তাঁহার রামায়ণ হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়া গায়কদিগের দ্বারা পরবর্ত্তী কালে কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রচারিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রথম ভাগেই হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সূর্য্যবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে কবি এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিশ্বামিত্রের অমিত প্রতাপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকির রামায়ণেও জনকের যজ্ঞস্থলে অহল্যার পুত্র শতানন্দ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের প্রতাপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শতানন্দ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিবাদের ঘটনা এবং ত্রিশঙ্কু ও অম্বরীষের আখ্যায়িকা প্রভৃতিই বর্ণনা করিয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা করেন নাই। এই বিখ্যাত আখ্যায়িকাটি দেবীভাগবত (৭ম স্কন্ধ, ১৮-২৭ অধ্যায়) এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৭-৮ম অধ্যায়) হইতে সংগৃহীত হইয়া রামায়ণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পিতৃসত্য-পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনগমনের ভূমিকা স্বরূপ পত্নীপুত্র ও আপনাকে বিক্রয় করিয়া হরিশ্চন্দ্রের সত্যরক্ষার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা সুসঙ্গতই হইয়াছে। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ দেবীভাগবত (৩।৩০শ অঃ), বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (পূর্ব্বখণ্ড, ২২শ অঃ), এবং কালিকাপুরাণ (৬০ম অঃ, ২৬-৩৮ শ্লোক) প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কিন্তু পদ্মের অভাবে চক্ষু উৎপাটিত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া প্রভৃতি ঘটনা এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই।

সেতুবন্ধনের সময়ে রামচন্দ্র যে শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ কূর্ম্মপুরাণ (পূর্ব্বভাগ, ২১ অঃ, ৪১-৫৩ শ্লোক), শিবপুরাণ (জ্ঞানসংহিতা, ৫৭ অঃ), এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ) প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লবকুশের যুদ্ধবিবরণ বিস্তৃতভাবে পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড), এবং জৈমিনি-ভারত (২৯-৩৬ অঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে যে, ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রহিয়াছে, যথা—"এ সব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে।" (বঙ্গবাসী সং, ৫৩৫ পৃঃ)।

বনবাসকালে সীতা দেবী গয়াধামে দশরথের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত রঘুনাথের গয়াপালা রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। শিবপুরাণে (জ্ঞানসংহিতা, ৩০শ অঃ) ইহার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহারই গল্পাংশের অনুবাদ করিয়া এই পালা রচিত হইয়াছিল।

রামাভিষেকের পরে সীতা হনূমানকে মণিময় হার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। হনূমান তাহা ছিন্ন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রাম নাম লিখিত আছে ইহা সকলকে প্রদর্শন করাইয়াছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ১৬শ অধ্যায়ে যে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলনে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঔষধ আনিবার সময়ে হনূমানের সহিত কালনেমির যুদ্ধের বিবরণ বাল্মীকির রামায়ণে নাই, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গে ইহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাহারই ভাবানুবাদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে সূর্য্যকে কক্ষতলে স্থাপন, এবং ভরতের পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনা অতিরিক্ত সংযোজনা।

জটায়ু যে রামের পিতৃবন্ধু ইহার উল্লেখ রামায়ণে রহিয়াছে (৩।৬৭।১৭)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে শনির দৃষ্টিতে দশরথের পতন এবং জটায়ু কর্তৃক ধারণ প্রভৃতি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় (ঐ, বঙ্গবাসী সং, ৩৩-৩৪ পৃঃ)। ইহার মূল স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের ৪৯শ অধ্যায়। ইহাতে রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি হেতু অনাবৃষ্টির জন্য দশরথের শনির সহিত যুদ্ধ যাত্রার বিবরণ আছে বটে, কিন্তু শনির দৃষ্টিতে দশরথের পতনের উল্লেখ নাই। শনি বরদানে দশরথকে বিদায় করিয়াছিলেন। শনি কর্তৃক অনাবৃষ্টির উল্লেখ কালিকাপুরাণেও পাওয়া যায় (ঐ, ১৮।১৭)। কৃত্তিবাসের গ্রন্থে দশরথের পতনের সহিত জটায়ুর বন্ধুত্বের সংযোগ সাধিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির প্রভাবও প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে লক্ষিত হয়। বাণাহত হইয়া বালী রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

শশক গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্মপঞ্চ, এই পঞ্চসখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি, শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির॥

(বঙ্গবাসী সং, ১৬৩ পৃঃ)

ইহা ভট্টিকাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ মাত্র—

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা যে প্রোক্তাঃ কৃতজৈর্দ্বিজৈঃ।
কৌশল্যাজশশাদীনাং তেষাং নৈকোঽপ্যহং কপিঃ॥

(ঐ, ৬।১৩৪)

সীতা হনূমানকে আম্রফল প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

এক আম্র দিবে রামের চরণকমলে।
দুটি আম্র দিবে বাছা বানরসকলে॥
এক আম্র দিবে মোর লক্ষ্মণ দেবরে।
শত শত আশীর্ব্বাদ জানাবে তাহারে॥
এক আম্র আছে বাছা পবন-কুমার।
ইহার অর্দ্ধেক ভাগ সুগ্রীব রাজার॥
অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ খেও বাছা তুমি।
একে একে ফল বাছা বেঁটে দিনু আমি॥

(উদ্ভটসাগর সং, ২৯০ পৃঃ)

ইহা মহানাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ মাত্র—

শ্রীমদ্রামপদারবিন্দযুগলে দাতব্যমেকং ফলং
সৈন্যেভ্যো যুগলে ফলে কপিপতাবেকং সুরম্যং ফলম্
একঞ্চাপি ফলং ততস্তদনুজে দেয়ং শুভাশীঃ শতম্
পশ্চাৎ সৈন্যনিরাকুলপ্রকৃতিনা ভোক্তব্যমেকং ত্বয়া॥১

দ্রষ্টব্যঃ—ইহা যে কবির নিছক কল্পনা মাত্র, তাহা বুঝিতে পারা যায়

১। এই জাতীয় বিবিধ উল্লেখের নির্দ্দেশ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয়-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা, ২১—২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যখন রামায়ণের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বর্ষার অবসানে শরতের প্রায় শেষ সময়ে হনূমান লঙ্কাতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আম্রফলের এত প্রাচুর্য্য সম্ভবপর নহে।

এই সকল বিষয় কৃত্তিবাস রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পনা করিলে বলিতে হয় যে, তিনি সংস্কৃতে রচিত যাবতীয় পুরাণ ও কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নহে। আদি রামায়ণ রচনাকারীরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে তিনি যে বাল্মীকির গ্রন্থই অনুসরণ করিয়াছিলেন এইরূপ ধারণা করাই সঙ্গত। পরবর্ত্তী সংযোজনায় তাঁহার গ্রন্থের কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সীতা কর্ত্তৃক হনূমানকে আম্রফল প্রদান করা প্রভৃতি ঘটনা বঙ্গবাসী সংস্করণের গ্রন্থে নাই, অথচ উদ্ভটসাগর মহাশয় সম্পাদিত রামায়ণে মুদ্রিত হইয়াছে। এইভাবে কৃত্তিবাসের গ্রন্থ যে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে আদর্শ সম্বন্ধেও ভ্রান্ত নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে সংজ্ঞাহীন রাম-লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য হনূমান কর্ত্তৃক ঔষধ আনিতে যাইবার উপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি-রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥

(বঙ্গবাসী সং, ৩০৩ পৃঃ)

কিন্তু অদ্ভুত রামায়ণে এই সকল বিষয়ের বর্ণনা নাই। এই গ্রন্থে সুন্দরকাণ্ড হইতে রামের অভিষেক পর্য্যন্ত ঘটনা মাত্র দুইটি শ্লোকে এইভাবে বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ১৬।১৭-১৮)—রাম সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কায় গমন করিলেন, এবং রাবণকে বধ করিয়া সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিবার প্রবাদের উৎপত্তি বোধ হয় ইহা হইতেই হইয়াছে। অতএব উক্তরূপ বর্ণনা এই গ্রন্থে থাকিতে পারে না। এই জাতীয় বিবৃতি কৃত্রিমতারই পরিচয় প্রদান করে। কোন অজ্ঞ ব্যক্তি

(যিনি অদ্ভুত রামায়ণের নাম শুনিয়াছেন, অথচ পাঠ করেন নাই) কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। এই সকল রচনার জন্য কৃত্তিবাসকে দায়ী করিলে তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ম্লান হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতি রাক্ষসগণ, এমন কি রাবণ কর্ত্তৃকও শ্রীরামের স্তুতি বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার হেতু-নির্দ্দেশার্থে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষস দ্বারা রাম-স্তুতি করাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, আর শাক্তগণ রামের দ্বারা দুর্গাপূজা করাইয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মতান্তরও সম্ভবপর। অধ্যাত্ম রামায়ণে মন্দোদরী, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, কালনেমি প্রভৃতির রাম-ভক্তির বর্ণনা রহিয়াছে। রামকে তাঁহারা পরমাত্মা পরমেশ্বর রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাবণ সনৎকুমারের মুখে অবগত হইয়াছিলেন যে, যাহারা বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়, তাহারা তাঁহার পরমপদে অধিরূঢ় হয়। ইহা জানিতে পারিয়া রামের হস্তে আত্মবধের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই রাবণ বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিল (অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৩য় সর্গ)। অন্যত্র—"লঙ্কাধিপতি মৈথিলীকে হরণ করা অবধি রামকেই অবিরত হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতেন। ভাবিতেন—"কিরূপে রঘুমণির করে শীঘ্র আমার মৃত্যু হইবে?" (ঐ, সুন্দরকাণ্ড, ২য় সর্গ)। অতএব রামের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হওয়া এই সকল রাক্ষসের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের মৃত্যুবাণ-লাভ-প্রসঙ্গে প্রথমতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার নিকট হইতে রাবণ ঐ বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র তাহার মর্ম্মভেদ করিলেই রাবণের মৃত্যু হইবে। কিন্তু ইহার পরেই আছে...

এই কথা বিভীষণ কহে শ্রীরামেরে।
আর একমত কথা কহে মতান্তরে॥
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন।
তখন সে রাবণের হইবে পতন॥

কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম ভিতর ॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে ॥

(বঙ্গবাসী সং, ৩৮৬ পৃঃ)

অতএব যিনিই এই আখ্যায়িকা রচনা করুন না কেন, তিনি যে অন্যান্য পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রামের চণ্ডীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া রাক্ষসগণের বিষ্ণুভক্তির বিবরণ অনেক পুরাণেই বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা করার কোনই আবশ্যকতা নাই। তবে এই সকল বিষয় কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, তাহাতে যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন পণ্ডিত এবং কবি। এই উভয় প্রকার বিশিষ্টতা সম্পন্ন দুইজন কবির পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তী কালে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে একজন বিদ্যাপতি, এবং অন্যজন বড়ু চণ্ডীদাস। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সমন্বয়ে রচনা কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহা উভয়ের রচনার বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, কোন কোন বিদ্বেষান্ধ পাঠক ব্যতীত সকলেই ইঁহাদের রচনায় এই আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আত্ম-বিবরণীতে কৃত্তিবাসের প্রভূত পাণ্ডিত্যাভিমানের নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিলেও (কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এইভাবে নিজের সম্বন্ধে গর্ব্বোক্তি করিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না) তাঁহার রচনায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস স্বীয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদর্শ ছিল রামায়ণ, মহাকবি বাল্মীকির অনুপম গ্রন্থ। অতএব একমাত্র পাণ্ডিত্যের বলেই তিনি তাঁহার রচনা কবিত্বের মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিতে পারিতেন, অথচ রামায়ণের গল্প ব্যতীত ইহাতে আর কিছুরই

সন্ধান পাওয়া যায় না। চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী, বর্ষা, শরৎ, লঙ্কা প্রভৃতির বর্ণনাত্মক উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক অংশ কৃত্তিবাসী রচনায় বাদ পড়িয়াছে। কবি বোধ হয় কথকতার আদর্শে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, রামায়ণের আখ্যায়িকাংশ তিনি সহজ, সরল ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোধ হয় সেই প্রাথমিক যুগে লোক-মনোরঞ্জনের জন্য ইহার বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এইজন্য গ্রাম্য-মুদি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপ্রাসাদের রমণীগণ পর্য্যন্ত ইহা পাঠ করিয়া এখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন। তারপর যুগে যুগে গায়কগণ এক একটি পালা সময়োপযোগী পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। এইজন্য প্রাচীন পুঁথিতে রামায়ণের খণ্ডাংশই পাওয়া যায়, এবং এক পুথির সহিত অপর পুথির রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ রামায়ণ সম্পাদিত করিতে যাইয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কারণ ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যে গ্রন্থ আমরা মুদ্রিতাকারে পাইতেছি, তাহাও ব্যক্তিবিশেষের সঙ্কলিত সংস্করণ মাত্র, কৃত্তিবাসের আদি রচনা বলিয়া ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

কৃত্তিবাসের অন্যান্য রচনা, এবং পরবর্ত্তী কবিগণের রামায়ণ-কাব্য

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইহাতে যে উক্ত রামায়ণ বহির্ভূত অনেক ঘটনার সমাবেশ দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বালোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল যে বিভিন্ন পুরাণ ও কাব্যনাটকাদি হইতে বিবিধ চিত্তাকর্ষক আখ্যায়িকা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, রামায়ণের অনুবাদক অন্যান্য কবি-কল্পিত অনেক উপাখ্যানও ইহাতে সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যে রামায়ণ-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এইভাবে আহরিত রসধারায় পরিপুষ্টি লাভ

করিয়া তাহার প্রবাহ অব্যাহত গতিতে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যেখানে যাহা মনোরম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহাই আহরণ করিয়া কৃত্তিবাসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন ইহার প্রতি লোকের আকর্ষণ অনুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ প্রাপ্ত না হয়। এইভাবে যুগে যুগে পরিমার্জ্জিত হইয়া যে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পরবর্ত্তীকালে পুনরায় এক রামায়ণের অনুবাদ করিতেই বহু কবি ব্যাপৃত হইয়াছিলেন কেন, এই প্রশ্নই আমাদের মনে উদিত হয়। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার ও বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তির অভাবের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ বাল্মীকির রামায়ণ ব্যতীত অধ্যাত্ম ও অদ্ভূত রামায়ণ এদেশে প্রচারিত রহিয়াছে। তারপর মহাভারত, জৈমিনি ভারত, ভাগবতাদি পুরাণ এবং বিবিধ কাব্য-নাটকাদিতেও রামের আখ্যায়িকা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকির গ্রন্থে যাহা নাই এমন অনেক ঘটনা এই সকল গ্রন্থে রহিয়াছে, আর ইহাদের অনেক-গুলি আবার কবিগণের কল্পনাপ্রসূত। ভাষা-রামায়ণ রচয়িতৃগণ এইরূপ বিভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহাতে তাঁহাদের মস্তিষ্কের অপব্যবহারের পরিবর্ত্তে উদ্ভাবনী শক্তির স্ফূর্ত্তির নিদর্শনই লক্ষিত হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেও কবিগণ নূতন প্রেরণা লাভ করিয়া-ছিলেন। এইজন্য কোন কোন গ্রন্থে রামসীতার রাস এবং পূর্ব্বরাগাদির বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে একই পালা একাধিক কবির নামে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কবিগণকে এইজন্য দায়ী করা যাইতে পারে না, কারণ ইহা পরবর্ত্তী লিপিকর বা গায়কগণের অপকীর্ত্তি মাত্র। পরবর্ত্তী আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ কৃত্তিবাসের নামে যে কয়েকটি পালা প্রচারিত রহিয়াছে, আমরা তাহা লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাদের মধ্যে “যোগাদ্যার বন্দনা” সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচারিত করিবার জন্য যে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহীরাবণ ও অহিরাবণকে

বধ করিয়া যখন রামলক্ষ্মণ সহ হনুমান পাতালপুরী হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—

মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন ॥
সাধিয়া রামের কার্য্য চলিলা সত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল ভিতর ॥
এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
পাতাল হইতে দেবীর করিল উদ্ধার ॥

(বঙ্গবাসী সং, ৩৭০ পৃঃ)

হনুমান তাঁহাকে আনিয়া ক্ষীরগ্রামে স্থাপন করেন। সেই দেশের রাজার নাম হরিদত্ত। প্রত্যহ নরবলি দিয়া পূজা করিবার জন্য দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া রাজা দেবীর কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে বৎসরে একবার নরবলি প্রদান করিবার নির্দ্দেশ দেন। আট বৎসর রাজা নিজের আট পুত্র বলিদান করিয়া এই আদেশ প্রতিপালন করেন। নবম বৎসরে পূজার ভার দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি নিজেকে বলি প্রদান করেন। এইভাবে পূজা চলিতেছিল, অবশেষে এক ব্রাহ্মণের পালা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার একটিমাত্র পুত্রকে হত্যা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, পথে দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে নরবলি ব্যতীতই পূজা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহাই পালার প্রথম পর্ব্ব। দ্বিতীয় পর্ব্বে নিজেকে ঐ ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া দেবী এক শঙ্খ বণিকের নিকট হইতে এক জোড়া শাঁখা পরিধান করেন, এবং বলিয়া দেন যে, ইহার মূল্য পঞ্চ মুদ্রা ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে এক স্থানে রক্ষিত আছে। বণিক যাইয়া মূল্য প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বণিক সহ নদীর তীরে আগমন করেন, এবং তাঁহাদের প্রার্থনায় দেবী জল হইতে দুই হস্ত উত্তোলিত করিয়া শাঁখা দুইটি প্রদর্শন করেন। ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্ণিত ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও সাক্ষীগোপালের আখ্যায়িকার ন্যায় দেবীর মাহাত্ম্য

প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পালা রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অনুরূপ উপাখ্যান অন্যত্রও প্রচারিত রহিয়াছে। দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত মহীসার গ্রামে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ হইতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"পূর্ব্বকালে এই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন। একটু অধিক বয়সেই তাঁহার একটি সুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বালিকাগণ সাধারণতঃ যে বয়সে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে এই কন্যাটির সে বয়স অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বস্ত্র পরিধান করিতেন না। এই কারণে তাঁহার নাম দিগম্বরী রাখা হইয়াছিল। বৃদ্ধ পিতা কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পরে দূরদেশ হইতে একটি বৃদ্ধ বর সংগৃহীত হইল। বিবাহের দিন দিগম্বরী দীঘিতে স্নান করিবার সময় যে ডুব দিয়াছিলেন আর উঠিলেন না। মধ্যাহ্ন কালে এই ঘটনা হয়। বৈকালে শাঁখারী আসিয়া শাঁখার মূল্য চাহিল। যখন সে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা অবগত হইল, তখন প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, সে নিজে দিগম্বরীকে শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে, এবং তিনি শাঁখার মূল্য বিশেষ একটি স্থান হইতে তাহাকে দিতে বলিয়াছেন। এই বলিয়া শাঁখারী দিগম্বরী দেবীর কথিত স্থানের উল্লেখ করে। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, দেবীর নিরূপিত স্থানে সত্যই মূল্য-পরিমাণ অর্থ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ তখন শাঁখারীকে যে স্থানে সে কন্যাকে শাঁখা পরাইয়াছিল সেই স্থান দেখাইয়া দিতে বলিলেন। শাঁখারী অশ্বত্থবৃক্ষতল দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে পুনরায় দর্শন-মানসে তিন দিন অনাহারে একাসনে ধ্যানস্থ ছিলেন। তৃতীয় দিন শেষ রাত্রিতে তিনি দৈববাণী শ্রবণ করেন যে, প্রভাতে তিনি ঐ বৃক্ষতলে গেলে দেবীর দর্শন পাইবেন। তিনি পরদিন দেবীর শঙ্খ-পরিহিত হস্তদ্বয় ঐ বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রসারিত অবস্থায় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।" (ঐ, ২-৩ পৃঃ)। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বিবাহের উপলক্ষে শাঁখা পরিধান করাই স্বাভাবিক, অতএব এখানেই এই পরিকল্পনার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। যোগাদ্যার বন্দনায় পরবর্ত্তীকালে এই উপাখ্যান সংযোজিত হইয়া থাকিবে। হনূমান কর্ত্তৃক দেবীকে পাতাল হইতে

আনয়নের ন্যায় ইহাও নূতন সৃষ্টি মাত্র। কোন বিশেষ আখ্যায়িকা এইভাবে সৃষ্ট হইয়া অলৌকিকত্বের জন্য অন্য উপাখ্যানের সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত নিত্যানন্দের বিবাহে, এবং চণ্ডীদাস ও রামী ঘটিত গল্পে পাওয়া যায়। পরিবেশন করিতে আসিয়া রামী ও বসুধা নাকি তৃতীয় হস্ত বহির্গত করিয়া মস্তকের কাপড় টানিয়া দিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, বণিকের নিকটে দেবী যেভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—

দুটি পুত্র লয়ে আমি থাকি বাপ-ঘরে।
দরিদ্র আমার পতি অন্ন দিতে নারে॥
সিদ্ধি খেয়ে পাগল হয়ে ফিরে অবিরত।
সাপগুলা গায়ে বান্ধে বাদিয়ার মত॥
স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া সংসার অভিলাষ।
সব ছাড়ি কৈলা তিঁহো বারাণসী বাস॥ ইত্যাদি

কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু ব্যাধের বাড়ীতেও চণ্ডী দেবী এইভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও এই জাতীয় রচনায় ঈশ্বরী পাটনীর নিকটে অন্নদার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের যোগাদ্যার বন্দনায় অনুরূপ রচনারই সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের নিতান্ত সৌভাগ্য এই যে, রামায়ণের দুই একটি স্মৃতিচিহ্ন এখনও ইহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ব্যতীত বৈদ্যনাথ শিবের আখ্যায়িকাতেও রাবণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দ্বারা যে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা যায়, ইহা কাব্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন।

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গদের রায়বারের পালা। বাল্মীকির রামায়ণে অঙ্গদকে দূত-রূপে রাবণের সভায় প্রেরণ করা হয় নাই, এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায় (D. C. I., ভূমিকা, XXIX পৃঃ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লঙ্কাকাণ্ডের ৪১শ অধ্যায়ে অঙ্গদের দৌত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফকিররাম কবিভূষণ যেভাবে কৃত্রিম হিন্দীতে এই পালা রচনা

করিয়াছেন, তাহারই প্রায় আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাসের পালায় পাওয়া যায়, অথচ এই জাতীয় উক্তি প্রত্যুক্তি বাল্মীকির রামায়ণে লিপিবদ্ধ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই পালাটি প্রথমতঃ কোন কবি দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছিল, পরে তাহা অন্যের ভণিতায় প্রচারিত হইয়াছে। ফকিররাম যে কবিচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইজন্য কবিচন্দ্রকেই অনুকরণকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বাল্মীকির রামায়ণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া মনে হয় যে, ফকিররামের অনুকরণে রচিত কবিচন্দ্রের পালা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ শিবরামের যুদ্ধ-পালা। দ্বিজ লক্ষ্মণ, কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাসের ভণিতায় এই পালাটি পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাসের রচনায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু লক্ষ্মণের পালা ভাষা ও ঘটনা-সমাবেশে স্বতন্ত্র রচনারই পরিচয় প্রদান করে। অতএব লক্ষ্মণ যে স্বাধীনভাবে ইহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে। লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে যে, এই পালা তাহারই কল্পনাপ্রসূত। পরে কবিচন্দ্র এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি পালা রচনা করিয়া থাকিবেন। তাহাই ভণিতা-পরিবর্ত্তনের সহিত কৃত্তিবাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। সীতা-হরণের পরে রামের আদেশে ফল আহরণ করিতে যাইয়া লক্ষ্মণ হনূমানের নিকট পরাজিত হন, পরে রামচন্দ্র হনূমানকে পরাজিত করিলে শিবের সহিত রামের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং তাহারই ফলে শিবের আদেশে হনূমান রামের ভক্ত হইয়াছিল, ইহাই এই পালায় বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণের আখ্যায়িকা-বিরোধী এইরূপ উদ্ভট পরিকল্পনা যে কৃত্তিবাস করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

চতুর্থতঃ কৃত্তিবাসের অদ্ভুত রামায়ণ। এই নামীয় সংস্কৃত গ্রন্থের ভিত্তির উপরে ইহা রচিত হইয়াছে। পুথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে বটে, কিন্তু বন্দনা-অংশে কৃত্তিবাসকে বন্দনা করিয়াই পালাটি আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য ইহার প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ইহাতে যে নূতনত্বের সমাবেশ রহিয়াছে মূলের সহিত তুলনা করিয়া তাহা পরে প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চমতঃ সীতার বারমাস্যা। অযোধ্যায় আসিয়া সীতাদেবী উর্ম্মিলার নিকট তাঁহার বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন এইভাবে এই ক্ষুদ্র পালাটি রচিত হইয়াছে। ভণিতায় কৃত্তিবাসের নাম পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে "বারমাস্যা" বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিলে পর এই পালার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

ষষ্ঠতঃ কৃত্তিবাসের রামরাস। ১৩১১ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে সম্পূর্ণ পালাটি ইহার পরে মুদ্রিত হইল। কবি জগদ্রামও বিস্তৃতভাবে রামচন্দ্রের রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরিকল্পনায় ভাগবতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কৃত্তিবাসের পালার ভাষা ভাঙ্গা হিন্দী। এইজন্য ইহার প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।[১]

এইরূপে যুগে যুগে নানাভাবে কৃত্তিবাসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হওয়াতে তাঁহার লোকপ্রিয়তা হ্রাস হইতে পারে নাই।

কৃত্তিবাস ফুলিয়ার মুখোটি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত বংশে পরবর্ত্তীকালে ভারতচন্দ্রেরও উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত রামায়ণ-রচয়িতা আরও দুইজন এই বংশোদ্ভব কবির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ কৃত্তিবাসের খুল্লতাত ভ্রাতা লক্ষ্মীধরের প্রপৌত্র। কবি নিজেকে সুষেণ পণ্ডিতের পুত্ররূপে পরিচিত করিয়াছেন। অতএব তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। কবির রচিত লঙ্কাকাণ্ডের কয়েক পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

এই বংশের অপর কবি স্যার আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৪৭ সংখ্যক পুথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত একখানি অদ্ভুত রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে শতস্কন্ধ রাবণবধ বর্ণিত হয় নাই, অথচ ভণিতায় বলা হইয়াছে—

অদ্ভুত রামায়ণ গাইল পোণ্ডিত কৃত্তিবাস। (ঐ, ২ পৃঃ)

পুথিখানি অতি বৃহৎ—১—১৯৭ পত্রে সম্পূর্ণ। পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রচারিত সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডের অনুলিপি মাত্র। প্রাচীন পুথির উপর নির্ভর করিয়াও কৃত্তিবাসের মূল রচনার সন্ধান করা যে কিরূপ কষ্টকর, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রামায়ণের অনুলিপি তাঁহার বংশধরগণের নিকট রক্ষিত আছে। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, গঙ্গাপ্রসাদ রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় এই আদর্শে রামায়ণ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের রচনা যে ইহার সমপর্য্যায়ে স্থান লাভ করিতে পারে তাহা তুলনামূলক আলোচনা সহ পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের প্রায় চারিশত বৎসর পরে গঙ্গাপ্রসাদ গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সমস্তই ভাবানুবাদ মাত্র। রাজকৃষ্ণ রায় ও গঙ্গাপ্রসাদের রচনাতেই আমরা প্রথম আক্ষরিক অনুবাদের সন্ধান পাই। ইহা এই দুই কবির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

কৃত্তিবাসের পরে যাঁহারা রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবই বেশী পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত মহাভারতাদি পুরাণ-বর্ণিত রামায়ণের আখ্যায়িকা অবলম্বনেও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। গুণরাজ খাঁ উপাধি-ধারী কোন কবিরচিত রামায়ণের একাধিক পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত রামায়ণের আখ্যায়িকা মূলতঃ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। এজন্য ইহাকে "ভারত রামায়ণ বা সংক্ষিপ্ত রামায়ণ" আখ্যাতেও প্রচারিত করা হইয়াছে। ইহার অপর নাম "ইতিহাস পুস্তক বা ধর্ম্ম ইতিহাস", কারণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রভৃতি নীতিমূলক আখ্যায়িকা এবং ভাগবতের অজামিলের উপাখ্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতএব মহাভারত ও ভাগবতের প্রভাব এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অদ্ভুতাচার্য্য রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির আখ্যায়িকা এবং চরুবণ্টন প্রভৃতির বিবরণ তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে রচিত এক ভাষাগ্রন্থও তাঁহার ভণিতায় প্রচারিত রহিয়াছে।

কৈলাস বসু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অদ্ভূত রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে ইহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে।

জয়চন্দ্র রাজার সভাসদ দ্বিজ ভবানীনাথ অধ্যাত্ম রামায়ণের নিশানা দিয়া স্বীয় কল্পনা বলে এক গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন। ইহা রামের রাজ্যাভিষেকের বিবরণ লইয়া রচিত হইয়াছিল। ইহার বক্তা ব্যাসদেব এবং শ্রোতা পাণ্ডবগণ। অতএব ইহা ভারত-রামায়ণের পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু কালঞ্জরের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণ হতচেতন হইলে তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী চন্দ্রকলা শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে সুভদ্রাহরণ ও অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব লক্ষিত হয়। কবি ভাগবতের অনুকরণে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পারিজাত হরণের এক পালাও রচনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার গ্রন্থে মহাভারত ও ভাগবতের প্রভাবই বিশেষভাবে পড়িয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভবানী ঘোষ নামক আর এক কবি রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের এক পালা রচনা করেন। ইহাতেও অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব লক্ষিত হয়, কারণ কবি বলিয়াছেন যে, মুনির শাপে রামচন্দ্রের পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হইয়াছিল। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

তারপর শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামশঙ্কর দত্ত, জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসরণ করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থের প্রভাব রামায়ণ-রচয়িতৃগণের উপর বিশেষভাবে পতিত হইবার কারণ এই যে, বাল্মীকির রামায়ণ অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ, অতএব ইহা আয়ত্ত করিয়া গ্রন্থ রচনা সহজসাধ্য কার্য্য নহে। অপর দিকে অধ্যাত্ম রামায়ণ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি রচনা পারিপাট্যে চিত্তাকর্ষক বলিয়া ইহাই প্রধানতঃ আদর্শ স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অদ্ভুত রামায়ণ ঘটনা-বৈচিত্র্যের জন্য সমাদৃত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রচনায় এই দুই গ্রন্থের যে প্রভাব লক্ষিত

হয়, তাহাও উক্ত কারণ সম্ভূত বলিয়াই মনে হয়। আদি রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরে উক্ত দুই গ্রন্থ বিশেষরূপে সমাদৃত হওয়াতে বিবিধ আখ্যায়িকা কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া ইহাকে সময়োপযোগী করিয়া সংস্কৃত করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৪ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন, পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীধামে গমন করেন। তাঁহার শিষ্য রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে বসিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল তত্ত্ব বঙ্গদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল যখন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম বৃন্দাবন হইতে শিক্ষিত হইয়া এদেশে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ঘটনা। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় যে পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যুগে যুগে নানাভাবে তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ ভগবানকে আনিয়া মানব-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাধুর্য্যভাবাত্মক উপাসনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে বঙ্গদেশে যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণও তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ভাষা রামায়ণসমূহ বৈষ্ণবভাবধারায় রসপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনন্দন শ্রীরামরসায়ণ নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি রাম ও সীতার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ রচিত হয়। তিনি রামের বনগমনকালে কৌশল্যাদির বাৎসল্যভাবের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালীন যশোদার স্নেহবিহ্বল ভাব মনে পড়িয়া যায়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কমললোচন দত্তের রামায়ণের নাম রামভক্তিরসামৃত। মনে হয় যেন আমরা "ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর" ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি। বস্তুতঃ কবি

কৃষ্ণভক্তিরস-সিক্ত বঙ্গদেশে রামভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজ সীতাসুত বোধহয় সমগ্র রামায়ণই রচনা করিয়াছিলেন। হনূমানের প্রার্থনায় রামচন্দ্র তাহাকে "প্রেমভক্তি" প্রদান করিলে—

বীর হনূমান হৈল মাধুর্য্য আশ্রয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম এদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত না হইলে কবি এই তত্ত্বব্যাখ্যায় মনোযোগী হইতেন না। বৈষ্ণবপদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের মুকুটমণি। ভাষার লালিত্যে, ভাবের গভীরতায় এবং অভিব্যক্তির মনোহারিত্বে ইহা সর্ব্বযুগে আদরণীয় হইয়া থাকিবে। এক সময়ে ইহার বন্যা বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্য কোন শাখাই পদাবলীর ন্যায় আপামর সাধারণের মধ্যে এত বেশী প্রচারিত হইতে পারে নাই। কীর্ত্তন গানের মধুরতায় ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণও আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই ফলে রামলীলা অবলম্বন করিয়া অনেক কবি পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় কতকগুলি পদ নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পরে মুদ্রিত হইল।

"বারমাস্যার" ন্যায় রামায়ণের অন্তর্গত রায়বারের পালা বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অঙ্গদের রায়বার, বিভীষণের রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পালা হিন্দীভাষাতেও রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-মনোরঞ্জনের জন্য এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ভাষার কিছু কিছু অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব রহিয়াছে। মধুরতায় ইউরোপের অন্য কোন ভাষাই ফরাসীভাষার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। এদেশেও দৃঢ়তার সহিত মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা হিন্দীভাষা ব্যবহার করি। মার্গ-সঙ্গীতেও হিন্দীর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে রায়বার রচনায় হিন্দীভাষাও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। হিন্দীভাষায় রায়বার রচয়িতৃগণের মধ্যে ফকিররাম প্রাচীনতম। খোসাল শর্ম্মা, রামনারায়ণ, মতিরাম প্রভৃতি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফকিররামের রচনার আক্ষরিক অনুবাদই কবিচন্দ্রের তথা কৃত্তিবাসের পালায় লক্ষিত হয়।

অনেক কবি ভাষা-রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমগ্র রামায়ণই রচনা করিয়াছিলেন, আবার অনেকেই এক একটি পালা বা কাণ্ড রচনা করিয়াছেন। এই সকল কবিগণের মধ্যে যাঁহাদের সময় সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। কৃত্তিবাস—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ
২। গঙ্গানারায়ণ—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ
৩। অদ্ভুতাচার্য্য—ঐ শেষ ভাগ
৪। কৈলাস বসু—প্রায় ১৫৮৬ খ্রীঃ
৫। চন্দ্রাবতী—১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে
৬। গুণরাজ খাঁ—সপ্তদশ শতাব্দী
৭। ঘনশ্যাম দাস—১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে
৮। ভবানী ঘোষ—১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে
৯। দ্বিজ লক্ষ্মণ—১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে
১০। রামশঙ্কর—প্রায় ১৬৬৫ খ্রীঃ
১১। রামানন্দ ঘোষ—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ
১২। শঙ্কর কবিচন্দ্র—১৭০২—১৭১২ খ্রীঃ
১৩-১৪। জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ—১৭৭০—১৭৯১ খ্রীঃ
১৫। রঘুনন্দন—১৮৩১ খ্রীঃ
১৬। দ্বিজ দুলাল—১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে
১৭। রামমোহন—১৮৩৮ খ্রীঃ
১৮। কমললোচন—১৮৪২ খ্রীঃ
১৯। হরেন্দ্রনারায়ণ—প্রায় ১৮৪২ খ্রীঃ
২০। দ্বিজ মহানন্দ—১৮৭৩ খ্রীঃ
২১। রাজকৃষ্ণ রায়—১৮৭৭ খ্রীঃ
২২। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—১৮৮৫—১৮৮৯ খ্রীঃ

যাঁহাদের সময় সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না—

২৩। ভবানীনাথ
২৪। ভবানীশঙ্কর
২৫। গঙ্গাদাস সেন
২৬। দ্বিজ পঞ্চানন
২৭। দ্বিজ সীতাসুত
২৮। ভিকন গুরুদাস
২৯। দ্বিজ হটুশর্ম্মা
৩০। রামরুদ্র
৩১। দ্বিজ মাণিকচন্দ্র
৩২। দ্বিজ দয়ারাম
৩৩। জয়দেব দাস
৩৪। শিবরাম
৩৫। রামানন্দ যতী
৩৬। কৃষ্ণদাস
৩৭। গোবিন্দদাস
৩৮। রামকেশব দেব

ইহা ব্যতীত রায়বার রচয়িতৃগণ—

৩৯। ফকিররামের অঙ্গদের রায়বার
৪০। খোসাল শর্ম্মার ঐ
৪১। রামনারায়ণের রায়বার প্রভৃতি গ্রন্থ
৪২। দ্বিজ তুলসীর অঙ্গদের রায়বার
৪৩। মতিরামের কুম্ভকর্ণের রায়বার (কবিচন্দ্রের ভণিতাতেও ইহার একটি পালা পাওয়া গিয়াছে)
৪৪। দ্বিজরামের বিভীষণের রায়বার
৪৫। কাশীনাথের কালনেমির রায়বার
৪৬। সূর্পনখার রায়বার (কবি অজ্ঞাত)

ইহা ব্যতীত অনেক কবি-রচিত রামায়ণের পদও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নাম—

৪৭। বাণীকণ্ঠ, ৪৮। দ্বিজ নিধিরাম, ৪৯। বিদ্যাপতি, ৫০। মধুকণ্ঠ, ৫১। দ্বিজ কানুরাম প্রভৃতি।

এখনও রামায়ণ-রচয়িতা অনেক কবির সন্ধান আমরা পাই নাই। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাদের গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এখানে যে

সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে ভাষা-রামায়ণের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

কৃত্তিবাসের সীতার বারমাস্যা[১]

রাবণ বধের পরে সীতা অযোধ্যায় চলিয়া আসিয়াছেন। একদিন উর্ম্মিলা সীতাকে তাঁহার বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সীতা বারমাসের দুঃখের কথা বলিতেছেন, এইভাবে এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রচনা বিশেষত্ব বর্জ্জিত, এবং চিত্তাকর্ষক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

আইল বৈশাখ মাস রবির কিরণ।
খর তেজে পোড়ে পদ হিঙ্গুল বরণ॥
ভাদরে উদর জ্বালা সহিতে না পারি।
দিন গেলে মিলে রামে ফল দুই চারি॥
সেই ফলমুল মোরা করিতাঙ ভক্ষণ॥
উপবাসে থাকিতেন দেওর লক্ষ্মণ॥
আইল ফাগুন মাস বসন্তের বায়।
ক্ষণে ক্ষণে সীতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়॥
অশোকের বন নহে শোকের কানন।
অভাগী সীতার কেনে না হয় মরণ॥

পালাটি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র পুথির তিন পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণ পালাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৮৫ সংখ্যক পুথি হইতে অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে।[২] তাহাতে কিছু পাঠবিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

১। কঃ বিঃ ২৪৫ সং পুথি, এবং D. C. Vol. I, p. 190 হইতে সঙ্কলিত।

২। D. C. I, pp. 250-51.

শিবরামের যুদ্ধ-পালা[১]

ইহা রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তিনজন কবির ভণিতায় এই পালা পাওয়া যাইতেছে—

১। কৃত্তিবাস, ২। কবিচন্দ্র, এবং ৩। দ্বিজ লক্ষ্মণ।

তন্মধ্যে কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের রচনার সাদৃশ্য দৃষ্টে মনে হয় যে, এক কবির রচনা অপরের নামে চলিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ না রহে জীবন॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু কমললোচন।
ফলমূল আনি দেব করিহ ভোজন॥
এত বলি চলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শিবের বাগানে গিয়া দিলা দরশন॥

কঃ বিঃ, ২৫০ সং পুথি (কবিচন্দ্র)

তুলনীয়—

শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ না রহে জীবন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন কমললোচন।
ফলমূল আনি কিছু করহ ভক্ষণ॥
এত বলি চলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শিবের বাগানে গিয়া দিলা দরশন॥

কঃ বিঃ, ২৪৪ সং পুথি (কৃত্তিবাস)

ইহা ব্যতীত উভয় পুথির আখ্যায়িকা প্রায় একই প্রকারের। লক্ষ্মণ ফলমূল আহরণের জন্য শিবের বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বাগানের

১। কঃ বিঃ ২৫০, ২৪৪ সং পুথি ; D. C. I, pp. 196, 189-90 দ্রষ্টব্য।

রক্ষক ছিল হনূমান। উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে হনূমান লক্ষ্মণকে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া দিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণের অনুসন্ধানে রাম সেই বাগানে আসিয়া হনূমানকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। হনূমান শিবকে যাইয়া সংবাদ দিলে তিনি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। যখন তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল তখন পার্ব্বতী আসিয়া উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইলে শিবের আদেশে হনূমান রামের কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন। হনূমানের সহিত রামলক্ষ্মণের প্রথম সাক্ষাতের এইরূপ বিবরণ কৃত্তিবাসের রামায়ণে নাই বলিয়া মনে হয় কবিচন্দ্রের পালাই কৃত্তিবাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ কবিচন্দ্রের পালাটিই সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি রামলক্ষ্মণ এবং বিবিধ দেবতার বন্দনা করিয়া "শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ" হইতে আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছেন, আর কৃত্তিবাসের পালায় বন্দনা নাই, ইহা রামের উল্লিখিত উক্তি হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কবিচন্দ্র স্বতন্ত্র পালারূপে এই আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের নামও রহিয়াছে, যথা—

কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম যুবখনে (শুভক্ষণে)।
জাহার প্রশাদে লোক রামায়ণ শুনে ॥

কবিচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকে এইভাবে বন্দনা করিয়া তাঁহার রচনা নিজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের পালার শেষ-ভাগে উক্ত বন্দনার অনুরূপ রচনাও রহিয়াছে, যথা—

কিত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম যুভক্ষণ।
জাহার প্রশাদে যুনিবে রামায়ণ ॥

(D. C. L., P. 190)

এই সকল কারণে কবিচন্দ্রকেই এই পালার রচয়িতা বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি। দ্বিজ লক্ষ্মণের পালার অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] এই তিন কবির

১। D. C, I, pp.197-99, 235 ; সা-প-প, ১৩০৬, পৃঃ ৬৭, ৭২।

পালার আখ্যায়িকা প্রায় একই প্রকারের, কিন্তু লক্ষ্মণের রচনার সহিত অন্য দুই কবির রচনার মিল নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই কবি স্বাধীন ভাবেই এই পালা রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষে পার্ব্বতী স্বয়ং যাইয়া লক্ষ্মণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন (অন্য দুই কবির পালায় ইহা হনুমান করিয়াছিলেন), এবং এই ঘটনা রামের অসাক্ষাতে ঘটিয়াছিল, অতএব লক্ষ্মণ আসিয়া যখন রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আর যুদ্ধাবসানে রামলক্ষ্মণ পুনরায় বন-পথে চলিতে আরম্ভ করেন, এবং হনুমান তাঁহার মাতার নিকট গমন করেন। পরে রামচন্দ্র তাঁহাকে স্মরণ করিলে সে অঞ্জনার নিকট বিদায় লইয়া রামের সেবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। এইরূপ সামান্য সামান্য বিভিন্নতা ব্যতীত তিন কবির আখ্যায়িকা প্রায় একই প্রকারের।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৪ সং পুথির (দ্বিজ লক্ষ্মণের পালার) তারিখ ১১০৫ সন বা ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। কবিচন্দ্র রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে রামায়ণ রচনা করেন। অতএব শিবরামের যুদ্ধের পালা সর্ব্বপ্রথম দ্বিজ লক্ষ্মণ রচনা করিয়াছিলেন, পরে সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কবিচন্দ্র স্বাধীনভাবে একটি পালা রচনা করেন, পরে তাঁহার এই পালাটিই কোন কোন পুথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে।

কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণের শক্তিশেল

এই পালার দুই-খানি পুথির বিবরণ "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে" (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ২৭ পৃঃ, এবং ২য় ভাগ, ৯৭ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণের শক্তিশেলের রচনার সহিত ইহার মিল নাই। ভণিতা দেখিয়া মনে হয়, অন্য কোন কবি কৃত্তিবাসের নামে এই পালা রচনা করিয়াছেন, যথা—

মুরারি ওঝার নাতি নামে কীর্ত্তিবাস।
রামায়ণ রচিলেক গঙ্গাকুলে বাস ॥

পলি গ্রামে ঘর তার মাণিক্য দেবী মাও। ইত্যাদি

(ঐ, ২৭ পৃঃ)

কিন্তু—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বোলে রঘুনাথ পদতলে

লক্ষ্মণ লইলা রাম কোলে।

(ঐ ৯৭ পৃঃ)

এইরূপ ভণিতাও পাওয়া যাইতেছে। আবার এই পালাতেই দ্বিজ রামচন্দ্রের ভণিতাও মিলিতেছে—

দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে লোক শুনিবার।
পাপ ছাবি পুণ্য করে বৈকুণ্ঠে হয় পার॥

(ঐ, ৯৮ পৃঃ)

রচনা সর্ব্বাংশে বিশেষত্ব বর্জ্জিত।

কৃত্তিবাসের রামরাসের পদ

১৩১১ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (ঐ, ১২৫—৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত রামরাসের একটি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পদটি এখানে মুদ্রিত হইল। রামপ্রসাদের রামায়ণে যে রামরাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় ঐ গ্রন্থের আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব প্রভাবাধীনে ভাগবতের অনুকরণে এই জাতীয় আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়া থাকিবে। আলোচ্য পদটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা হিন্দী-মিশ্রিত ব্রজবুলী ও বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে।

রামরাস

দেখ সখি আজু রঘুনাথ কিআরে শোভাবনি।
কনক সিংহাসনে বৈঠল রঘুবর বামে জনকনন্দিনী॥
দহিনে লছমন ছত্রধর তহিঁ বরণ কাঁচসোণা জিনি।
ভরত শত্রুঘ্ন চাঙর করতহি বেদ পড়ত সব মুনি॥

চৌদিকে প্রজাগণ হরি হরি বোলত জয় জয় জয় রঘুমণি।
অমর বধূগণ মঙ্গল গায়ত উল্লাসে জনকনন্দিনী ॥
পবন-নন্দন হনূ আনন্দমগনমে নৃত্যতিহু পুনি পুনি।
যত পাত্র মিত্রগণ করতহি জোড় হাত দেবগণে জয় জয় ধ্বনি
রামদাসে ভণে ও রাঙ্গাচরণে না ঠেলিহ রঘুমণি ॥

সরযূতীরে অশোকবন, কেলি করত জানকীরমণ,
রঙ্গ ভরমে মগন হোয় নৃত্যতি তহি জানকী।
চর চর রূপ অতি অনুপাম, মরকত তাহে শোভয়ে রাম,
জলদ কোরে স্থির বিজরি জৈছে লতা কনকি ॥
লেই জন্ত্র জুবতীবৃন্দ তম্বুর কপিলাস ডম্ফ,
সরমঙ্গল বিনা সুজন্ত গায়ত গান ঝমকি।
জন্ত্র তন্ত্র তাল মান, অধরে না স্ফুরত গান,
মগনে রহত জুবতীবৃন্দ দুহুক নৃত্য নিরখি ॥
নাচিতে নাচিতে টুটল তাল, বোলত বাণী অতি রসাল,
গায়ত তহি আরে সখি বোলত তহি জানকী।
সুনিকেত বহু জুবতীপুর, গায়ত ধনি অতি মধুর,
গায়তে গায়তে প্রেমে গিরত জৈছে সাঙনকি ॥
রঘুবর কি বয়ান হেরি, অঙ্গনেতে ফেরি ফেরি,
রাম মোহিতে রামমোহিনী চলত ঠমকি ঠমকি।
হানল তহি নয়ন-বাণ, রঙ্গ ভরমে সিহরল রাম,
প্রিয়া মোরে লেই কোরে বোলত চমকি চমকি ॥
রঘুবরকি করিকে কোর, আনন্দে অবধি নাহিক ওর,
জোর জোর প্রেম বাড়ত পড়ত চরকি চরকি।
কোকিলাগণ করত গান, আনন্দে নাচত জানকী রাম,
দুহুক বয়ান হেরি দুহু প্রেমে কহত কতকি ॥

সীতাক কটিতে কিঙ্কিনীরাজ, রাতুল চরণে বঙ্করাজ,
ঝুনু রুনু ঝুনু স্বর রাজ গায়ত পঞ্চম তানকি।
ভণতহি কবি কীর্ত্তিবাস, জানকী-রমণ-চরণে আশ,
রামরূপ দেখি জানকী মাতল জেন চাতকী॥[১]

কৃত্তিবাসের অদ্ভুত রামায়ণ

কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত এক অদ্ভুত রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪০ এবং ২৪২ সংখ্যক পুথিদ্বয় হইতে ইহার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। গ্রন্থখানি কৃত্তিবাসের রচিত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ২৪২ সংখ্যক পুথির বন্দনা অংশে আছে—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে কেলি করে দেবী সরস্বতী॥

ঐ, ২ পৃঃ

অথচ ভণিতা এইরূপ—

কৃত্তিবাস গাইল অদ্ভুত রামায়ণ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচন॥

ঐ, ১৭ পৃঃ

অন্যত্র

কৃত্তিবাস রচিল অদ্ভুত রামায়ণ।
শ্রবণেতে পাপ খণ্ডে দুঃখ বিমোচন॥

২৪০ সং পুথি, ১১ পৃঃ

উক্ত দুই পুথির রচনা এবং আখ্যায়িকাও একপ্রকারের নহে। প্রথমে ২৪০ সং পুথি হইতে ইহার সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল—

দশানন-বধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। এই সময়ে একদিন মহর্ষি নারদ আসিয়া রামের সভায় উপস্থিত হইলেন।

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১ সাল, ১২৫-৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহার নিকট রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করিলে নারদ হাস্য করিয়া উঠিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর বলিলেন যে, দশস্কন্ধ রাবণ অপেক্ষাও প্রতাপশালী এক শতস্কন্ধ রাবণ হেমকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেছে, তাঁহার।

এক শত স্কন্ধ, মস্তক পর্ব্বত আকার॥
দুই শত হস্ত তার দুই শত লোচন।
তার যুদ্ধে পরাজয় এ তিন ভুবন॥

পৃঃ ১

তাহাকে বধ করিতে পারিলেই প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথা শুনিয়া রাম তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া সীতা রামচন্দ্রকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে জনক শতস্কন্ধকে হরধনু ভঙ্গ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সীতাকে সে লক্ষ্মী স্বরূপিণী জানে বলিয়া ঐ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সে রামকেও নারায়ণ জ্ঞানে ভক্তি করে। তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে রামের পরাজয় হইবে। কিন্তু সীতার নিষেধ সত্ত্বেও রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্র পার হইয়া হেমকূট পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন রাবণ রাম নাম জপ করিতেছে। তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাম তিনবার রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে সে হাত বাড়াইয়া রামলক্ষ্মণকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পুনরায় দুইবার রাবণের নিকট গমন করিলেও ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাম হনুমানকে স্মরণ করিলেন, এবং তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া চতুর্থবার যুদ্ধে গমন করিলেন। এইবারও রাবণের নিকট হনূমান পরাজিত হইলেন, এবং যুদ্ধে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হনূমান আসিয়া সীতাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি নিজে যুদ্ধে গমন করিয়া দিগম্বরী কালিকা মূর্ত্তিতে রাবণের বধ সাধন করেন।

২৪২ সংখ্যক পুথিতে নারদের পরিবর্ত্তে অগস্ত্য মুনির উল্লেখ রহিয়াছে,

আর হেমকূটের পরিবর্ত্তে "ওহো লঙ্কায়" রাবণের বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরাজিত হইয়া রামচন্দ্র কেবল হনুমানের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ সহ রাক্ষস ও বানর সৈন্য লইয়া শেষবার যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থ একই কবির রচিত হইলে আখ্যায়িকা-ভাগে এমন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইত না।

কিন্তু ইহাকে অদ্ভুত রামায়ণ বলা হইয়াছে। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণে সহস্রস্কন্ধ রাবণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হইতে শতস্কন্ধ রাবণের পরিকল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সহস্রস্কন্ধকে দশস্কন্ধের বড় ভাই বলা হইয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সহস্রস্কন্ধ থাকিত পুষ্করদ্বীপে, কিন্তু এই গ্রন্থে হেমকূট ও ওহোলঙ্কা শতস্কন্ধের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অদ্ভুত রামায়ণে রাম আত্ম-প্রশংসা করেন নাই, অগস্ত্য বা নারদও হাস্য করেন নাই, কিন্তু হাস্য করিয়াছিলেন সীতাদেবী, এবং তিনিই সহস্রস্কন্ধের উপাখ্যান সকলের নিকট বিবৃত করেন। এখানে হরধনু ভঙ্গের জন্য সহস্রস্কন্ধকেও নিমন্ত্রণ করিবার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু সহস্রস্কন্ধের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র একবারই গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে একাধিকবার গমনের বর্ণনা রহিয়াছে। রাক্ষস ও বানর সৈন্য পরিবৃত হইয়া সীতাসহ পুষ্পকে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্র সহস্রস্কন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে কেবল লক্ষ্মণ সহ রাম শতস্কন্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। পরে এক পুঁথিতে হনুমানের, এবং অপর পুথিতে বিভীষণ ও সুগ্রীবের সাহায্যের উল্লেখ রহিয়াছে। সহস্রস্কন্ধ এক বাণে রামসীতা ব্যতীত সকলকে স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে রাম লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় প্রেরণের কল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে সীতা যে কালিকা মূর্ত্তিতে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন তাহা অদ্ভুত রামায়ণেও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহাই হউক, সহস্রস্কন্ধের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থকেও অদ্ভুত রামায়ণ আখ্যায় প্রচার করা হইয়াছে।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের রামলীলা

কবি নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

ফুলিয়া বংশের মণি স্নুষেণ পণ্ডিত।
তাঁহার সন্তান দ্বিজ রচিল সঙ্গীত॥
(কঃ বিঃ ২৭৩১ সং পুথি)

কৃত্তিবাসের খুল্লতাত ভ্রাতা লক্ষ্মীধরের পৌত্র সুষেণ পণ্ডিতই কবির পিতা। তাহা হইলে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৩১ সংখ্যক পুথিখানি খণ্ডিত। তাহার কয়েক পত্র মাত্র পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে অশোক বনে সীতা ও হনুমানের কথোপকথনের কিয়দংশ রচনার নমুনা স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল।

সীতার উক্তি

আমার কপালে এই লেখ্যাছিল বিধি।
বঞ্চিত করিলা সেই রাম কৃপানিধি॥
অবোধ সরলা জাতি সদা অপরাধি।
নাথ হৈঞা রাম কৈল নাথের অখ্যাতি॥
কিন্তু এই কথা বাপু কহিবা শ্রীরামে।
অশেষ পাতকী ত্রাণ পায় রাম নামে॥ ইত্যাদি

হনুমানের উক্তি

হনুমান কহে মাতা না ভাবিহ দুঃখ।
অবিলম্বে আপনে দেখিবে রাম-মুখ॥
বনের বানর আমি নাম হনুমান।
তোর কথা শুনি মাগো ফাটে মোর প্রাণ॥
আপনি না জান মাতা নিজে লক্ষ্মী ...মি।
বৈকুণ্ঠে বসতি রাম জন্ম মর্ত্ত্যভূমি॥

জানকির প্রাণ রাম, রাম-প্রাণ সীতা।
আপনি বিশ্বের মাতা রাম বিশ্বপিতা॥
দৃষ্টিতে দুষ্টের সৃষ্টি পার বিনাশিতে।
কিন্তু ইহা না করিলে বুঝি ভাব মতে॥
রাবণ-সংহার হেতু রাম অবতার।
শ্রীরামের বধ্য সে নহেত তোমার॥
এইহেতু কোপ বুঝি কর সম্বরণ।
নহে কি তোমার কোপে বাচে দশানন॥ ইত্যাদি

এই রচনায় অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ[১]

কবির পরিচয়ঃ—কবির আত্মপরিচয়ে দেখা যায়, তাঁহার পিতামহের নাম মার্কণ্ড, পিতার নাম শ্রীনিবাস এবং মাতার নাম মেনকা। শ্রীনিবাসের চারি পুত্র, তন্মধ্যে নিত্যানন্দ কনিষ্ঠ। সাত বৎসর বয়সের সময় মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রামচন্দ্র স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নিত্যানন্দকে রামায়ণ রচনার আদেশ প্রদান করেন, এবং বাণ দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখিয়া দেন। প্রভুর কৃপায় এইরূপে অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রামায়ণও অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ নামে প্রচারিত হইয়াছে। পাবনা জিলার অন্তর্গত সোনাবাজু পরগণায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে কবির জন্ম হইয়াছিল।

কবির সময়ঃ—কবির ভ্রাতা দেবানন্দের পৌত্র রঘুনাথের কন্যা শর্ব্বাণীর সহিত সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। পতির মৃত্যুর পরে শর্ব্বাণী দক্ষতার সহিত সাঁতৈল-রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। নাটোর রাজ-দপ্তরে রক্ষিত একখানি দলিল হইতে জানা যায় যে, ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণী

১। ডাঃ ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা, ২।৶০—১. পৃঃ ; ব-সা-প-পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, ২৮১-৮৩ পৃঃ, এবং ঐ, ১৩১২ সাল, ৫৭-৫৮ পৃঃ হইতে সঙ্কলিত।

শর্ব্বাণী বার্দ্ধক্যবশতঃ অন্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরামের উপর রাজ্য পরিচালনার ভার আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।২ তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া গণনা করিলে কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।৩

গ্রন্থপরিচয়ঃ—মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গে যে অদ্ভুত রামায়ণ পঠিত হইত তাহা উল্লিখিত বুকানন সাহেবের গ্রন্থ হইতেই জানিতে পারা যায়। ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা হইতেও অদ্ভুতী রামায়ণের প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই সকল জিলাতেও এই গ্রন্থের প্রচলন ছিল। অদ্ভুতাচার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, "তিনি যেখানে যত অদ্ভুত কাব্যরসপূর্ণ, আসর-জমান কাহিনী পাইয়াছেন, সমস্তই আনিয়া নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন। তাহার উপরে চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া চরিত্রগুলিকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে এমন হৃদয়গ্রাহী আদর্শবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠকমাত্রেরই মনোরম না হইয়া পারে না।" (ডাঃ ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা, ৩/০ পৃঃ)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনীটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুপ্রাচীন পুথিগুলিতে এই আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না, অথচ অদ্ভুতী রামায়ণের সকল পুথিতেই এই কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেখানে দস্যু বাল্মীকির নাম ছিল মদন আকাটি বা যদু, রত্নাকর

২। কালীপ্রসন্ন বাবুর "নবাবী আমল", ২য় সং, ৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের একখানি পুথিতে "সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্র বি×তে" ইত্যাদি লিখিত দেখিয়া ১৭৬৪ শকে গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন (ঐ, ২৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রায় ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন সাহেব রঙ্গপুর জিলায় অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রচলিত দেখিয়াছিলেন (তাঁহার The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Vol. III, p. 503 দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা যায় যে, ১৭২৯ শকেও অদ্ভুতী রামায়ণ প্রচলিত ছিল। অতএব রসিকবাবু প্রদত্ত তারিখ পুথি-নকলের তারিখ রূপেই গ্রহণ করিতে হয়।

নহে। ইহা হইতে ধারণা হয় যে, লেখক বা গায়কদিগের দ্বারা পরবর্ত্তীকালে এই উপাখ্যান রত্নাকর দস্যুর কাহিনীরূপে কৃত্তিবাসের ভণিতায় চালান হইয়াছিল। এইরূপ একখানি পুথিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই বোধহয় শ্রীরামপুরের রামায়ণ মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

অদ্ভুতী রামায়ণে অনেক নূতন কাহিনীরও অবতারণা রহিয়াছে। এক সময়ে দশরথ কৌশল্যার উপরে রাজ্যভার প্রদান করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে এক তপোবনে বসুমতী রমণীর বেশে আসিয়া দশরথকে মোহিত করিয়া গিয়াছিলেন। পরে যে তাঁহার সহিত পরিহাসের সম্পর্ক হইবে (সীতার জননীরূপে) তাহার আভাস দিয়া দেবী বলিয়াছিলেন—

দেবী বলে শুন রাজা আমার বচন।
রাজা হইয়া হেন মত কিসের কারণ॥
এখনে শঁপিয়া তোমা করিত বিনাশ।
তোমা সঙ্গে পরিণামে হবে পরিহাস॥

আদর্শচরিত্র সৃষ্টিতেও অদ্ভুতাচার্য্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সুমিত্রাকে বিবাহ করিরা অযোধ্যায় আসিয়াই দশরথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশল্যা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। সতীনের প্রতি এই অনুকম্পা প্রদর্শনে কৌশল্যার উদারহৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে চরুভক্ষণ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে চরু ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। যথন—

চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে।
হেন কালে সুমিত্রা এ লাগিল কান্দিতে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন দ্রব্য খেতে রাজা না করে আশ্বাস॥
আমিত দুর্ভাগা নারী বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে পাবে কত ধন॥

তথন কৌশল্যা বলিলেন, “আমার চরুর ভাগ তোমাকে দিতে পারি,

যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, ইহা খাইয়া তোমার যে পুত্র হইবে সে আমার পুত্রের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিবে।” ব্যবসায়াত্মিকা এইরূপ বুদ্ধির বশে কার্য্য করাতে এখানে কৌশল্যার মহত্ত্ব বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু অদ্ভুতাচার্য্যের বর্ণনায় কৌশল্যার চরিত্র আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দশরথ চরুভক্ষণের জন্য সুমন্ত্রের দ্বারা কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তখন কৌশল্যা—

আনন্দিত হৈল দেবী সুমন্ত্র-বচনে।
সুমিত্রাকে বোলে চল যাই যজ্ঞস্থানে ॥
হস্ত জোড়ে সুমিত্রায়ে করে নিবেদন।
যজ্ঞস্থলে নেও লজ্জা দিবার কারণ ॥
কৌশল্যাএ বোলে আমা লজ্জা দিব যেই।
নিশ্চয়ে কহিল তোমা লজ্জা দিব সেই ॥
সুমিত্রাকে কোলে করি কৌশল্যা চলিল।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী সনে যজ্ঞস্থলে গেল ॥

সেখানে নিজের অর্দ্ধেক সৌভাগ্য সুমিত্রাকে উৎসর্গ করিয়া—

কৌশল্যাএ বোলে শুন দেবনারীগণ।
তোমা সবের স্থানে কহি প্রতিজ্ঞা-বচন ॥
যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
তবে সে দেখিব আমি স্বামীর বদন ॥
যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহজন্মে স্বামী সঙ্গে নৈব দরশন ॥
কৌশল্যা বুলিল যদি এতেক বচন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল এ তিন ভুবন ॥

পরে কৌশল্যার চেষ্টায় দশরথ সুমিত্রাকে পুনর্গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুমিত্রাও ইহার প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য করেন নাই। বনগমনকালের ঘটনা-বর্ণনায় লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

আমি যদি গেলাও মাতার বিদ্যমানে।
আমাকে দেখিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হৈল মনে॥
রাম সীতা যদি মোর চলে ঘোর বন।
কি কারণে এথাত তুমি আছহ লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম থাকিলে আমি চারি পুত্রের জননী।
রাম বিনা লক্ষ্মণ মোরা সব অপুত্রিণী॥
চল চল লক্ষ্মণ তুমি রামসীতার সনে।
লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করিবা রাত্রি দিনে॥
তোমার পিতার নারী নহি আমি কৌশল্যার দাসী।
জাতিকুল রাখিছে মোর কৌশল্যা মহিষী॥

রামায়ণে লক্ষ্মণ-চরিত্র যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কৌশল্যা ও সুমিত্রার এই আখ্যায়িকা তাহার পটভূমিরূপে স্থাপন করিলেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। বাল্মীকির রামায়ণে রাণীগণ কর্ত্তৃক চরু-বণ্টনের বিবরণ নাই। তাহাতে আছে যে, দশরথ নিজেই চরু চারিভাগ করিয়া দুইভাগ সুমিত্রাকে, এবং এক এক ভাগ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়াছিলেন। ভাষা রামায়ণের বিবরণ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গ্রহণ করা হইলেও কবিগণ নিজ নিজ কল্পনাপ্রভাবে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা ইহা আকারে বৃহত্তর হইবারই সম্ভাবনা। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহার আদিকাণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

অদ্ভুতাচার্য্যের শতস্কন্ধ রাবণ-বধ

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১০৬১ সং পুথি অবলম্বনে]

কবির পরিচয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য। কবির ভণিতা এইরূপ—

অদ্ভুত আচার্য্য গিত করিল রচন।

১০৬১ সং পুথি, ১৬ পৃঃ

এই গ্রন্থে যে আখ্যায়িকা রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, রামচন্দ্র মুনিগণের মুখে শতস্কন্ধের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থে শতস্কন্ধের জন্মবিবরণ প্রদত্ত হয় নাই, কিন্তু চিত্তরঞ্জন সংগ্রহের ২৯২ সং পুথিতে বিবৃত হইয়াছে যে, রাবণের মাতা নিকষা অবিবাহিতা অবস্থায় নদীতে স্নান করিতে গমন করিলে সূর্য্যের ঔরসে শতস্কন্ধের জন্ম হইয়াছিল। জন্মের পরেই মাতার নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি হেমকূট পর্ব্বতে তপস্যার জন্য গমন করিয়াছিলেন। হরধনু ভঙ্গের জন্য জনক-কর্ত্তৃক তিনিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সীতাকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী জানিয়া তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধের সময়ে তিনি রামলক্ষ্মণকে দুইবার হাত বাড়াইয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র হনূমান, সুগ্রীব প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। হনূমান তাঁহার নিকট পরাভূত হয়, এবং রামলক্ষ্মণ উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অবশেষে সীতার হস্তে শতস্কন্ধ নিহত হয়। এই আখ্যায়িকার সহিত কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রচারিত শতস্কন্ধ রাবরণবধ পালার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৭ সংখ্যক পুথিতে (D. C. I., ১৬৭-৮ পৃঃ) শতস্কন্ধের জন্মবিবরণও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পালাটিতেও কৃত্তিবাসের ভণিতা রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, এক কবির (বোধহয় অদ্ভুতাচার্য্যের) রচনা অন্যের নামে চলিয়া যাইতেছে।

কৈলাস বসুর অদ্ভুতরামায়ণ

কৈলাস বসু "মহাভাগবত পুরাণ" নামে একখানি ভাষাগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে তিনি নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (ঐ গ্রন্থসম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ইহা ১৫০৭ শক বা ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, অদ্ভুতরামায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়া থাকিবে।

জগৎরাম ও রামপ্রসাদ অদ্ভুত ও আধ্যাত্ম রামায়ণের ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া লঙ্কাকাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন (পরে দ্রষ্টব্য), কিন্তু কৈলাস বসু

অদ্ভুত রামায়ণ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাও মুলের অনুরূপ হইয়াছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৈলাস বসু মুলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। অদ্ভুত রামায়ণে আছে—

রামোঽচিন্ত্যো নিত্যচিৎ সর্ব্বসাক্ষী
সর্ব্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈককর্ত্তা।
ভর্ত্তা হর্ত্তানন্দমূর্ত্তির্বিভুর্বা
সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ সঃ॥
অপানিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং নহিতস্ত বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্॥ ২।২৫-২৬

কবি ইহারই অনুবাদ লিখিয়াছেন—

জ্ঞানিগণ ব্রহ্মজ্ঞানে চিন্তয়ে যাঁহারে।
তিঁহ সীতারাম বলি জানিবে তাঁহারে॥
সকলের সাক্ষী সর্ব্ব অন্তর্গত তিনি।
সকলের হর্ত্তা কর্ত্তা জনকজননী॥
নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্যানন্দময়।
মহাযোগী ঋষী যাঁরে হৃদয়ে চিন্তয়॥
চরণ নাহিক তাঁর সর্ব্বত্রে গমন।
কর নাহি সব তিনি করেন গ্রহণ॥
চক্ষু নাহি সকলি যে পারেন দেখিতে।
কর্ণ নাহি পান তিনি সকল শুনিতে॥
সকল জানেন তিনি এ বিশ্বসংসারে।
জগতের মধ্যে কেহ নাহি জানে তাঁরে॥

সকলের আদি তিনি পুরুষ প্রধান।
সকলের অগোচর তাঁহার যে স্থান॥

সা-প-পু, ৫৬৬, পৃঃ ৫

নারদের শাপ স্বীকার করিয়া লক্ষ্মীদেবী নারদকে কহিতেছেন—

আরণ্যানাং মুনীনাং বৈ স্তোকং স্তোকঞ্চ শোণিতম্
কলসাপূরিতং ভক্ষেদ্রাক্ষসী যা চ কামতঃ।
তস্যা গর্ভে ভবিষ্যামি তচ্ছোণিতসমুদ্ভবা॥

৬।২৫

কবি ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

অণণ্যনিবাসী যত ঋষী মুনিগণ।
তাঁদের শোণিতে হবে কলসী পূরণ॥
কামনা করিয়া কোন যেই নিশাচরী।
ভক্ষণ করিবে তাহা বিষজ্ঞান করি॥
সেই ত শোণিতে আমি উদ্ভব হইয়া।
জনম লভিব রাক্ষসীর গর্ভে গিয়া॥

পুথির পৃঃ ২৩

এইভাবে কবি প্রথম হইতে অদ্ভুত রামায়ণের অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের ৫৬৬ সংখ্যক পুথিখানি পরশুরামের দর্পচূর্ণ আখ্যায়িকার পরেই খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে ইহা অদ্ভুত রামায়ণের উৎকৃষ্ট অনুবাদরূপে প্রকাশিত করা যাইতে পারে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

ভাষা-রামায়ণ রচয়িতাগণের মধ্যে এই একজন মাত্র মহিলা কবির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গল রচয়িতা বংশীদাসের কন্যা। ময়মনসিংহের অন্তর্গত পাটওয়ারী গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেন। বংশীদাস ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসামঙ্গল রচনা করেন। অতএব ষোড়শ শতাব্দীর

শেষভাগে চন্দ্রাবতী কর্তৃক রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে।

চন্দ্রাবতীর বিষাদময় জীবনের কাহিনী লইয়া একটি গাথাও রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।[১] ইহা হইতে জানা যায় যে, জয়চন্দ্র নামে তাঁহার এক সহপাঠীর সহিত তাঁহার প্রণয় সংঘটিত হয়। ইঁহাদের বিবাহও সুস্থির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জয়চন্দ্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া এক মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে চন্দ্রাবতী অতিশয় মনোকষ্টে আর বিবাহ করেন নাই। পরে জয়চন্দ্র অনুতাপ-দগ্ধ হইয়া চন্দ্রাবতীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে একদিন যখন চন্দ্রাবতী শিবমন্দিরে পূজার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, তখন জয়চন্দ্র উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী পূর্ব্বেই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়া জয়চন্দ্র নিকটবর্ত্তী নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার অল্পকাল পরেই শিবারাধনায় নিযুক্ত থাকিবার কালে চন্দ্রাবতী দেহত্যাগ করেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য ইহার আবিষ্কারের কাহিনী জানা অতীব প্রয়োজনীয়। চন্দ্রকুমার দে গীতি-কবিতা সংগ্রহের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলায় উৎসবাদি ব্যাপারে স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক এই রামায়ণ গীত হইয়া থাকে। চন্দ্রকুমার তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহা মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করেন। অতএব বিংশ শতাব্দীতেই ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। এইজন্য ইহার অত্যাধুনিক রূপই আমাদের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কতকাংশ উদ্ধৃত হইল। বনবাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে সীতা বলিতেছেন—

রসাল বনের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া।
অযোধ্যার রাজ্যপাট গো গেলাম ভুলিয়া॥

১। মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৭-১১২।

মৃগ ময়ূর আর গো বনের পশুপাখী।
সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখের দুঃখী॥
শিব শঙ্কর নাম গো লইয়া আচম্বিতে।
দাণ্ডাইল যোগী এক গো আসিয়া দ্বারেতে॥
আমি কিগো জানি সখি কালসর্প বেশে।
এমনি করিয়া সীতায় গো ছলিবে রাক্ষসে॥ ইত্যাদি

(পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ৪।২, পৃঃ ২৫৬-৯)।

ইহা পাঠ করিলেই মাইকেলের সীতাসরমার কথাবার্ত্তা মনে পড়িয়া যায়। কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে ইহা পাইলে, আমরা মাইকেলকে অনুকরণকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত গানে যে মাইকেলের প্রভাব পতিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

এই রামায়ণ তিনটি পরিচ্ছেদে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রাম-সীতার জন্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বারমাসী, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বনবাস। সীতার জন্ম সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা এখানে অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষিগণের রক্ত কৌটায় ভরিয়া রাবণ মন্দোদরীকে বিষ পরিচয়ে প্রদান করিয়াছিলেন। রাণী তাহা খাইয়া গর্ভবতী হন, এবং এক ডিম্ব প্রসব করেন। তখন গণকে ভবিষ্যৎবাণী করিল যে, এই ডিম্ব হইতে যে মেয়ের জন্ম হইবে, তাহার জন্য রাক্ষস বংশ ধ্বংস হইবে। অতএব ডিম্বটি জলে নিক্ষেপ করা হইল। ইহা ভাসিতে ভাসিতে জনকের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মাধব নামক এক জেলে তাহা প্রাপ্ত হয়। তাহার স্ত্রীর নাম সতা। সে ইহা জনকের মহিষীকে প্রদান করে। তাহা হইতে এক কন্যার জন্ম হয়। সতা কর্ত্তৃক আনীত ডিম্ব হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া এই কন্যার নাম রাখা হইয়াছিল সীতা। রামের জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, এক মুনি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ফল খাইয়া কৌশল্যাদি রাণী গর্ভবতী হইয়াছিলেন। যজ্ঞের চরু ভোজনের উল্লেখ এই রামায়ণে নাই।

কুকুয়া নাম্নী ভরতের এক ভগ্নীর অনুরোধে সীতা পাখার উপরে রাবণের মুর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শ্রম বশতঃ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে কুকুয়া পাখাটি সীতার বুকের নিকটে রাখিয়া রামচন্দ্রকে সংবাদ প্রদান করেন। ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পালাটির প্রায় প্রত্যেক চরণে "গো" শব্দ ব্যবহার করিয়া ইহাকে করুণ রসাত্মক করিয়া তোলা হইয়াছে। পাঠ করিলেই মেয়েলী রচনার সুর কর্ণে ধ্বনিত হয়। তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্রাবতীর আদি রচনার স্বরূপ ইহা হইতে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। বিংশ শতাব্দীতে এই রামায়ণ কি অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল আমরা কেবলমাত্র তাহারই সন্ধান পাইতেছি।

গুণরাজ খানের রামায়ণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৪১ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের একটি অসম্পূর্ণ অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। পত্র সংখ্যা ৪৭। ইহাতে কবি সর্ব্বত্রই "গুণরাজ খান" ভণিতা প্রদান করিয়াছেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুরও এই উপাধি ছিল, কিন্তু তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। অপরপক্ষে ষষ্ঠীবর সেনের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, এবং তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাসের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব ইঁহারা উভয়ে যে রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখা গেল—ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল গুণরাজ" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ৪৪২ পৃঃ)। আবার শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয় সম্পাদিত ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, এই কবিরও উপাধি ছিল গুণরাজ। ইনি শ্রীহট্টে মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত ইটা পরগণার গয়ঘর গ্রামে দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ঢাকা জিলার ঝিনারদি গ্রামবাসী ষষ্ঠীবর সেন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি

বলিয়াই ধারণা করিতে হয়। এই তিনজনের মধ্যে কে এই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এই সম্বন্ধে ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকের প্রচার পূর্ব্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে সমধিক হইয়াছিল দেখিয়া মনে হয়, উহার প্রণেতা গুণরাজ খাঁ নহেন, গঙ্গাদাসের পিতা ষষ্ঠীবর। কিন্তু ভণিতার সাদৃশ্য দেখিয়া যদি সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে দুই কবিকে অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।" (কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ১২৭ পৃঃ)।

পরিষদের উল্লিখিত পুথিখানির অবস্থা দেখিয়া ইহাকে সুপ্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। ইহার অনেক অক্ষরই আধুনিক রূপ গ্রহণ করে নাই। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"ষষ্ঠীবর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪৪২ পৃঃ)। আমাদেরও মনে হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইবেন না।

কবি মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্ব্বে বর্ণিত রামায়ণের আখ্যায়িকা মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য ইহাকে "ভারত রামায়ণ", "সংক্ষিপ্ত রামায়ণ" আখ্যাও প্রদান করা হইয়াছে।

পুণ্য প্রসঙ্গ কথা ভারথ-রামায়ণ।
ইহাকে শুনিতে শ্রদ্ধা করে জেহ জন॥ ইত্যাদি

(সা-প-৫৪১ সং পুথি, ১২ পৃঃ)

অন্যত্র—

গোনরাজ খ'নে বলে শ্রীরামের পদতলে
সঙ্খেপে গাইল রামায়ণ।

(ঐ, ৩৪ পৃঃ)

গ্রন্থের প্রারম্ভে কপট পাশায় পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বনগমন বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পাণ্ডবগণকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রামলীলা বর্ণিত হইয়াছে, এইভাবে ষষ্ঠীবর গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন।

রাজার মুখের শুনি এই সব বানি।
কহএ রামের কথা দেব চক্রপানি॥

(৭ পৃঃ)

কিন্তু মহাভারতে মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট রাম-চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

রাবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদ সাগরের তীরে যাইয়া নারায়ণকে স্তবে পরিতুষ্ট করিলে বিষ্ণু বলিলেন—

তুমি সব জন্ম গিআ বানরী-উদরে।
আপনে জন্মিমু আমি দশরথের ঘরে॥

(পৃঃ ৭)

ইহার পরে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ দশরথের ব্রহ্মশাপের এবং উর্ব্বশী সতীর আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন। ত্রেতা যুগে মহিপতি নামে এক রাজা ছিলেন, উর্ব্বশী তাঁহার ভার্য্যা। পুত্রলাভের জন্য রাজা তপস্যা করিতে বনে গমন করিলেন, আর উর্ব্বশী পুরাণ শ্রবণে ব্রতী হইলেন। পনর বৎসর পরে কামের বশীভূত হইয়া রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রতচারিণী ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করেন। ইহাতে তিনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। উর্ব্বশী তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইত। সেই সময়ে এক রাজ-বেশ্যার সংবাদ অবগত হইয়া তাহার স্বামীর মনে অভিলাষ জাগরিত হয়। উর্ব্বশীর প্রার্থনায় ঐ গণিকা তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। রাত্রে স্বামীকে লইয়া যাইবার পথে ভৃগু মুনির ধ্যানভঙ্গ করাতে তিনি অভিশাপ প্রদান করেন যে, রাত্রি প্রভাতেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হইবে। উর্ব্বশীও বলেন—"আমি যদি সতী হই, তাহা হইলে এই রাত্রি আর প্রভাত হইবে না।" অবশেষে বেশ্যালয় হইতে তাহারা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও রাত্রি প্রভাত হইতেছে না দেখিয়া দেবগণ আসিয়া উর্ব্বশীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার স্বামীকে শাপমুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে এই গ্রন্থে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম এবং পরে ক্ষাত্রধর্ম্ম, কলিযুগ ধর্ম্ম ও অজামিল উপাখ্যান

প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের যে পুথি রক্ষিত আছে তাহা "ইতিহাস পুস্তক বা ধর্ম্ম-ইতিহাস" নামে পরিচিত (ভট্টশালীর কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভূমিকা, ৶০ পৃঃ)। বিবিধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে বলিয়া গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েই অজামিলের উপাখ্যান এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও আলোচনা রহিয়াছে। অতএব ইহাতে ভাগবতের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। একস্থানে শুক পরীক্ষিতের উল্লেখও পাওয়া যায়, যথা—

পরীক্ষিত নরপতি জিজ্ঞাসিলা পুণি।
কহ কহ শুখ দেব বৈষ্ণব শিরমণি॥

(পৃঃ ৭)

ইহা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুকরণ, না, গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং মালাধর বসু ?

ইহার পরে পুনরায় রামায়ণের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমেই ব্রহ্মার নিকট হইতে রাবণাদির বরলাভের বিবরণ। রাবণ নরবানর ব্যতীত সকলের অবধ্য হইবার বর লাভ করে। দেবগণের চক্রান্তে তমঃ দ্বারা অভিভূত কুম্ভকর্ণ প্রগাঢ় সুপ্তির প্রার্থনা জানায়। আর বিভীষণ ধর্ম্মপথে থাকিবার প্রার্থনা করাতে ব্রহ্মা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করেন। ইহা মহাভারত বর্ণিত আখ্যায়িকারই অনুরূপ। বরদানান্তে

ব্রহ্মা বোলে দশমণি খসয়ে তুমার।
সে দিন জানিঅ শত্রু জন্মিল তুমার॥

(পৃঃ ৩০)

বস্তুতঃ একদিন সভামধ্যে উপবিষ্ট রাবণের মুকুট মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার শত্রু কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য রাবণ শুকসারণকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা অযোধ্যায় আসিয়া রামচন্দ্রকে দেখিয়া গেল বটে, কিন্তু রাবণের নিকট তাহা প্রকাশ করিল না। অনুরূপ আখ্যায়িকা কৃত্তিবাসী রামায়ণ (বঙ্গবাসী সং, ৫৪ পৃঃ) এবং অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণেও পাওয়া যায় (ভট্টশালী সং, ৫৬ পৃঃ)।

এদিকে মুনিগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে রাক্ষসেরা আসিয়া রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকারকল্পে বিশ্বামিত্র আসিয়া দশরথের নিকট রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করিলেন। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ডাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুইজনে॥
দোঁহে দাঁড়াইলেন সে মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সঙ্গেতে॥

(বঙ্গবাসী সং ৬৪ পৃঃ)

কিন্তু গুণরাজ খাঁ এখানে দশরথকে এই প্রতারণার দায় হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দশরথ অন্তঃপুরে আসিয়া বিশ্বামিত্রের প্রার্থনার কথা জানাইলে—

সুমিত্রা কেকৈ বোলে রামকে না দিমু।
রাম না দেখিলে প্রাণ কেমতে ধরিমু॥
ভরথ লক্ষ্মণ দিমু, না দিমু শ্রীরাম।

(পুথি, ৩৬ পৃঃ)

তখন লক্ষ্মণ যাইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলে—

মুনি বোলে তোমা সনে নাহি কিছু কাম॥
লক্ষ্মণ বোলয়ে গোসাই নিবেদি চরণ।
রাক্ষস সহিতে আমি ভালে জানি রণ॥
হাসিআ বোলয়ে মুনি লক্ষ্মণে চাহিআ।
মোর সঙ্গে চল তুমি রামকে আনিআ॥

(ঐ, ৩৭ পৃঃ)

ইহার পরে ভরত আসিয়া প্রণাম করিলে সর্ব্বজ্ঞ মুনি ক্রোধান্বিত হইয়া অযোধ্যা ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। অবশেষে বশিষ্ঠের পরামর্শে রামলক্ষ্মণকে প্রদান করিলে বিশ্বামিত্র প্রস্থান করেন।

ইহার পরে তাড়কাবধ। এখানে নূতনত্ব এই যে, নিহত হইবার পরে

তাড়কা এক দিব্য অপ্সরা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহা অধ্যাত্ম রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথি ইহার পরেই খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অংশের সন্ধান ভট্টশালী-সম্পাদিত রামায়ণে পাওয়া যায়। অহল্যা উদ্ধারের পরে রামচন্দ্র জনক-ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

হরধনু ভঙ্গ করিতে যাইবার কালে রামকে—

মুনিগণে দেখিলেক বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ক্ষেত্রি বৈশ্য দেখিলেক পরম সুন্দর॥
দেখিলা রাক্ষসগণে জমের দোসর।
দেবতা গন্ধর্ব্বে দেখে ত্রিদশের ঈশ্বর॥
নারিগণে দেখিলেক অতি নব রঙ্গ।
সর্ব্বলোকে দেখিলেক বিজুলি-তরঙ্গ॥

(ভট্টশালী-সম্পাদিত রামায়ণ, ১২৬ পৃঃ)

ইহাকে ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৪৩শ অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকের ভাবানুবাদ বলা হইয়াছে (ঐ, ১২৭ পৃঃ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে দেখা যায়, গুণরাজের রামায়ণের "আদিকাণ্ড ৭০৷৮০ পাতায় সমাপ্ত। পরে আর ১০৷১২ পাতায় রামায়ণের বাকী অংশ বিবৃত হইয়াছে।"

(ঐ, ভূমিকা, ৸৴০ পৃঃ।)

ঘনশ্যাম দাসের সীতার বনবাস

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডের ৫১১-৪৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। যে পুথি হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার লিপিকাল ১০৩৫ সাল বা ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ। কবি জৈমিনি-ভারত বর্ণিত রামায়ণের

আখ্যায়িকা (লবকুশের যুদ্ধ-বিবরণ) অবলম্বনে যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভণিতা হইতে জানা যায়, যথা—

কৃষ্ণপদারবিন্দ মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গ
শুনি ভেল ঘনশ্যাম দাস।
নতুন মঙ্গল গাঁথা জৈমিনি-ভারত পুতা
ভকত জনার অভিলাষ॥

(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ঐ, ৫৪৯ পৃঃ)

সীতা বনমধ্যে পরিত্যক্তা হইলে—

সীতা দেখি যত হস্তিগণ।
জল আনি করিলা সেচন॥
তৃণ জল হরিণী তেজিয়া।
কান্দে তারা সীতারে দেখিয়া॥
পশুগণ আদি কুম্ভ আর।
কান্দে দুঃখ দেখিয়া সীতার॥
নৃত্য তেজি ময়ূরগণ।
সীতার অগ্রে ধরয়ে পেখম॥
মহাসর্প নিকটে আসিয়া।
ছায়া করে ফণায় ধরিয়া॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৫৪৮ পৃঃ)

জৈমিনি-ভারতে আছে—"সীতা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে অরণ্য-মধ্যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ যে যাহা করিতেছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং যাহার যেরূপ সাধ্য সেইরূপ তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল (ঐ, বঙ্গানুবাদ, ২৭৪ পৃঃ)। কবি ইহারই ভাব গ্রহণ করিয়া উদ্ধৃত রচনায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য :—ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। কবি-রচিত জৈমিনি ভারতের অংশ বিশেষ মাত্র। কবির অশ্বমেধপর্ব্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভবানীদাসের রামের স্বর্গারোহণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১৪ সংখ্যক পুথিতে এই পালার অনুলিপি পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা—পৃঃ ১৩১, ২২১-২ ; এবং ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা—পৃঃ ১৭) ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে লিখিত আছে "ভবানীদাস-বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন-দিগ্বিজয় ও রামের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি পালার একাধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে।" এই উক্তি ভ্রান্তিমূলক। ভবানীনাথ অধ্যাত্ম রামায়ণের নিশানা দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন প্রভৃতির দিগ্বিজয় বর্ণিত রহিয়াছে (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। উক্ত গ্রন্থে তিনি কখনও ভবানীদাস ভণিতা প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর এই ভবানীদাস ঘোষ-পদবীযুক্ত কায়স্থ। অতএব তাঁহারা যে পৃথক্ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের কিছু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

জগন্নাথদেব বন্দোম করিয়া মাথাএ।
সুদ্রে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণে বসি খাএ ॥
নবদ্বিপ পুরি বন্দোম অতিবড় ধন্য।
জাহাতে প্রবিণ হইল ঠাকুর চৈতন্য ॥
নিজ দেশ বন্দোম অতি অনুপাম।
গঙ্গার সহিতে বন্দোম সঙ্কর প্রধান ॥
জনক জাদব বন্দোম জসদা-জননী। ইত্যাদি।

কবি রাধাবিলাস নামেও এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে কবির পরিচয় এইভাবে লিখিত রহিয়াছে—

আগম পুরাণ বেদ বুধমুখে শুনি।
সেই অনুসারে রচে দাস ভবানী ॥

পাতণ্ডানিবাসী ঘোষ ভবানী অবোধা।
জনক যাদবানন্দ জননী যশোদা ॥

(বসাপপ, ৮, পৃঃ ৩৮-৩৯)

গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে কবির অন্য এক গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে কবির পরিচয় এইভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে —

দ্বিজগণের গুরুজনের বন্দিয়া চরণ।
ভবানীদাস কহে গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
পাণ্ডণ্ডো (পাতৃণ্ডা ?) গ্রামে বসত সর্ব্বলোকে জানে।
সৌকালীন ঘোষ তেহোঁ বিদিত ভুবনে ॥
সে স্থানে করিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম।
সম্প্রতিক বন্দো বিরাট গ্রাম ॥
বাওন হইয়া মনে ধরিতে চাহে চান্দ।
ভাগবত শাস্ত্র করি পাঁচালী ছন্দ ॥ (বসাপপ, ৫, পৃঃ ২৮৭-৮)

অতএব একই কবি যে এই তিন গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। রামের স্বর্গারোহণ ব্যতীত অন্য দুই গ্রন্থ ভাগবতের আদর্শে রচিত হইয়াছে।

যাহাই হউক রামের স্বর্গারোহণ পালার প্রারম্ভ এইরূপ :—

সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি।
তথাপি শ্রীরামগুণ কহিতে না পারি ॥
বুদ্ধি অনুরূপে আমি করিব রচন।
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গ আরোহণ ॥
সীতা পাতালে গেল লোক চমৎকার।
অযোধ্যার লোক সব করে হাহাকার ॥
রাজ্য করে প্রভু রাম মনেত অসুখ।
পাত্র মিত্র সকলের মনে ভারি দুঃখ ॥

(বাপ্রাপুবি, ১-২, পৃঃ ১৭)

কিন্তু ইতিমধ্যে বিষ্ণুর অভাবে স্বর্গের দেবগণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বলিতেছেন :—

রাজা বিনে সোভা নাহি প্রিথিবির ভিতর।
বিষ্ণু বিনে শূন্য দেখি অমরা নগর॥
বিষ্ণু বিনে দেবগণের গতি নাহি আর।
হেন পদ না দেখিয়া করে হাহাকার॥
এ কারণে দেবগণ হইছি অস্থির।
সকল দেবতাগণ কম্পিত সরীর॥

ক: বি: ১৫১৪ সং পুথি।

তখন ব্রহ্মা পরামর্শ করিয়া কালপুরুষকে অযোধ্যায় রামের নিকট পাঠাইতেছেন :—

আর কোন জন যাইব বচন প্রচুর।
কালপুরুষ যাউক শ্রীরাম গোচর॥
এত বুঝি প্রজাপতি স্থির কৈল মন।
কালপুরুস ডাকিয়া আনিল তৈক্ষণ॥
শুন কালপুরুস তুমি আমার বচন।
সত্তর চলিয়া যাও অযোধ্যা ভুবন। (ঐ)

এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কালপুরুষ অযোধ্যায় যাইয়া গোপনে রামের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, লক্ষ্মণ দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তাঁহার ক্রোধে লক্ষ্মণ ভীত হইয়া রামের নিকটে মুনিকে লইয়া গেলেন, এবং এই অপরাধে তাঁহাকে বর্জ্জন করা হইল। অবশেষে সকলের তিরোধানের পরে :—

ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইল শীঘ্রগতি।
ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ি ইন্দ্রের সংহতি॥
চারি ভাই এক মূর্ত্তি হইল নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল তর্পণ॥

প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।
বসিলেক দেবগণ আপনার আসন ॥
যেই জনে পড়ে শুনে স্বর্গ আরোহণ।
বৈকুণ্ঠেতে চলিয়া যায় তরিয়া শমন ॥

বাপ্রাপুথি, ১-১, পৃঃ ১৩১।

কবির এই পালাতে অদ্ভুত রামায়ণের ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

মুনি-শাপ হতে সব পাসরিয়া ছিলা।
শাপ দূর হৈয়া রাম সকল স্মরিলা ॥

(বসাপপুথি, সং ৫৪৭, পৃঃ ৪৯)

কবির রচিত রাধাবিলাস নামক গ্রন্থের এক অনুলিপির তারিখ ১০৫৬ সন বা ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ (বসাপপত্রিকা, ১৩০৮, পৃঃ ৩৯)। অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ততঃ প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিজ লক্ষ্মণের রামায়ণ

দ্বিজ লক্ষ্মণ রচিত প্রায় সমগ্র রামায়ণের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১] ইহা হইতে বোধ হয় তিনি সমগ্র রামায়ণই ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ইহা প্রধানতঃ অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আদিকাণ্ডের ২৮ সং পুথির প্রারম্ভেই রহিয়াছে—

নৈমিষারণ্য ভাগে আনন্দ হৃদয়ে।
সনৌকাদি জিজ্ঞাসয়ে সুত মহাশয়ে ॥
অপার মহিমা রাম নাম অবতার।
কে পাঠাল্য মর্ত্ত্যলোকে কেমন প্রচার ॥

১। Vide D. C. I., pp. 21-22, 32-33, 224 etc., এবং ব-সা-প-প, ১৩০৬ সাল, ৪৭-৪৮ পৃঃ।

একদিন বিরিঞ্চি বসিয়া নিজ লোকে।
অমরাদি মুণিগণ বেড়্যা চারিদিকে॥
সাম ঋক্ অথর্ব্ব যজু চারি বেদ সাথে।
সারদা সমুখে বস্যা বীণাবেণু হাথে॥
দৈবাৎ নারদ ঋষী উপনীত তথা।
প্রণমে ব্রহ্মার পদে লোটাইয়া মাথা॥

(D. C. I.. pp. 21-22)

অধ্যাত্ম রামায়ণেও সূত বক্তা, এবং ইহার প্রথমেই রহিয়াছে—"কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ...সরস্বতীশক্তি সমন্বিত মূর্ত্তিমদ্বেদ পরিবৃত...ব্রহ্মার নিকটে সত্যলোকে উপস্থিত হইলেন।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্মণ ইহারই ভাবানুবাদ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। আদিকাণ্ডের পরিসমাপ্তিতেও কবি লিখিয়াছেন—

অধ্যাত্মে শ্রীরামলীলা আদিকাণ্ড সায়।
রামপদ-রজ বন্দি শ্রীলক্ষ্মণ গায়॥ (D C. I, p. 21)

আবার "শিবরামের যুদ্ধ" পালার প্রারম্ভে রহিয়াছে—

ভরদ্বাজে কহিল বাল্মিক মহামুনি।
অবধান কর বাপু অদ্ভুত কাহিনী॥

* * *

জগৎ ঈশ্বর হয়্যা লভিয়া জনম।
নারদ মুনির সাঁপে আপনাকে ভ্রম॥ (D. C. I., p. 224)

অদ্ভুত রামায়ণে বাল্মিকি বক্তা, এবং ভরদ্বাজ শ্রোতা, আর ইহাতেই নারদের শাপে রামের জন্ম-বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব লক্ষ্মণ যে, উক্ত দুই গ্রন্থ অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

লক্ষ্মণ উক্ত দুই গ্রন্থ অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করিলেও সর্ব্বত্র ইহাদিগকে অনুসরণ করেন নাই। বিশ্বামিত্র যখন দশরথের নিকটে রাম লক্ষ্মণকে যাক্রা

করিলেন, তখন তিনি ভরত শত্রুঘ্নকে প্রথমতঃ তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণের রামায়ণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

দশরথ বলে আজি সর্ব্বনাস হল্য।
আমার প্রাণ রামকে নিতে বিশ্বামিত্র এল্য ॥
কি করি উপায় আমি নাজ্ঞি দিব রাম।
রাম গেলে না বাচিবেক আমার পরাণ ॥
এক যুক্তি বলি শুন আমার বচন।
সাজন করিয়া দেহ ভরত শত্রুঘ্ন ॥ (D. C. I, ২১ পৃঃ)

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিলে এই আখ্যায়িকা তাঁহার গ্রন্থে ছিল না, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণের রামায়ণে ইহা পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার গ্রন্থ হইতে ইহা পরবর্ত্তী কালে কৃত্তিবাসী রামায়ণেও সংযোজিত হইতে পারে। যিনিই ইহার আদি রচয়িতা হউন না কেন, ইহা যে তাঁহার স্বকীয় কল্পনা-প্রসূত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ বাল্মীকির রামায়ণে কিম্বা অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ শেষোক্ত দুই গ্রন্থ অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিলেও এখানে নূতন পরিকল্পনার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দশরথের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া রামচন্দ্রের গুহকের সহিত মিত্রতা হইয়াছিল, ইহা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণের গ্রন্থেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

শ্রীরাম বলেন মিতা তুমি প্রাণাধিক।
তোমা হেন বন্ধু মোর নাহিক অধিক ॥
প্রিতু বোলে প্রভু রাম তুলিলেন তারে।
বিদায় হইল গুহা প্রণমি সভারে ॥ ইত্যাদি

(D. C. I., ২২ পৃঃ)

"শিবরামের যুদ্ধ" পালার আদি রচয়িতা যে লক্ষ্মণ তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কবির বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তিনি অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার "শিবরামের যুদ্ধ" পালার একখানি পুথির লিপিকাল ১০৬১ সাল বা ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই হিসাবে তিনি শঙ্কর কবিচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী।

রামশঙ্করের রামায়ণ[১]

কবির নাম রামশঙ্কর দত্ত রায়। তাঁহার বাসভূমি মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খোলাপাড়া, এবং ইহার নিকটবর্ত্তী বায়রা গ্রামে ছিল। কবির সমসাময়িক শ্রীচন্দ্র রায় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। অতএব কবি যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার ধারণা করা যাইতে পারে।

বন্দনার পরে গ্রন্থের প্রারম্ভেই রহিয়াছে—

কৈলাস-শিখরে বস্তে ভবাণী-শঙ্কর।
শ্রীরাম কথায় দোহে পুলক অন্তর॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত রামায়ণীয়া কথা।
পার্ব্বতী যাহার শ্রোতা মহাদেব বক্তা॥

ইহাদ্বারা অধ্যাত্ম রামায়ণ লক্ষিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত, এবং পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শিব রামলীলা বর্ণনা করিতেছেন, এই ভাবে ইহা লিখিত হইয়াছে। অন্যত্র—

শিব শিবা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা।
পঞ্চশত শ্লোকে ব্যাসদেব বিরচিলা॥

১। এই গ্রন্থের বিবরণ "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকার ২য় বর্ষের ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে সঙ্কলিত ইহার পরিচয় বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণেও (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যার ১০৯-১০ পৃষ্ঠাতে) মুদ্রিত হইয়াছে। আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত D. C. I., ৫৭, ১৪৭ পৃষ্ঠাতেও ইহার কিষ্কিন্ধ্যা ও আরণ্য কাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল আদর্শ অবলম্বনে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়।
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা এত দূরে সায়॥
অথবা আরণ্য কাণ্ডের দশ অধ্যা হৈল সায়।

(D. C. I, ৫৭, ১৪৭ পৃঃ)

অধ্যাত্ম রামায়ণেও আরণ্যকাণ্ড দশম সর্গে শেষ হইয়াছে। কবি প্রত্যেক কাণ্ডের শেষে উক্ত প্রকার ভণিতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামশঙ্কর ইহা ব্যতীতও অন্যান্য গ্রন্থ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন—

বাল্মীকি-রচিত গ্রন্থ-শ্লোক অনুসারে।
কৃত্তিবাস-আদি কবি পদবন্ধ করে॥
বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভাগবত-আদি পুরাণ প্রচার॥
এই সব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে।
পদবন্ধ করি কহে ভিষক শঙ্করে॥

(বা-প্রা-পু-বি, ১।২, ১১০ পৃঃ)।

তথাপি অধ্যাত্ম রামায়ণই যে কবির প্রধান আদর্শস্বরূপ ছিল, তাহা এই আলোচনার প্রথম ভাগে উদ্ধৃত কবির উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

কবির গ্রন্থ আকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা কিছু ছোট। ইহার ৫৫১ পত্রে ১৫৩৪০ শ্লোক রহিয়াছে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্লোক সংখ্যা ১৭৬৭০ (ঐ, ১০৯ পৃঃ)।

অধুনা বিশেষ-প্রচলিত একটি ছন্দে রচিত কবিতার অংশ-বিশেষ কবির রচনার নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল। অধ্যাত্ম রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডের প্রথম-ভাগেই বর্ণিত আছে যে, অত্রির আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া রামচন্দ্র তরণী সহযোগে এক নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারই বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

হেদেহে নাবিকি আমার বচন শ্রবণ করহ ভাই।
রায়ে তরণী আনহ এখানে উপারে আমরা যাই॥

রামের বদন হেরিয়া নাবিকি মোহিত হইয়া মনে।
কমল লোচনে নাবিকি কহেন এমন বেশেতে কেনে॥
শুন্যাছি শ্রবণে মুনির ঘরনী পাষাণ হইয়াছিল।
রামের চরণ-ধূলির পরশে পাষাণ মানুষী হল্য॥
সে রাম হইলে উপার করিতে নারিব নায়েতে কর্‌য়া।
ভরণ-পোষণ-কারণ তরণী চাপিলে যাবেক তর্‌য়া॥
আমার পরশে মুনির ঘরনী মানব হইল বনে।
তোমার দারুর তরণী আমার চরণে তরিবে কেনে॥
নাবিক তখন কহেন পাষাণ কাষ্ঠে নাহিক ভেদ।
তরিলে আমার তরণী অনেক দিবস রবেক খেদ॥
চরণ যুগল পাখালি রাঘব চাপহ আসিয়া নায়।
নাবিকি বচন শুনিয়া কমল-লোচন কহেন তায়॥
নিকটে তরণী আনহ চরণ পাখালি তাহাতে উঠি।
তরণী আনিয়া নাবিকি রামের ধুয়াইল পদ দুটি॥
তরণী উপরে বসিলা রাঘব জানকী লক্ষ্মণ সাথে।
নাবিকি তরণী বাহিয়া উপারে রাখিলা কমলানাথে॥
ভাবিয়া রাঘব চরণ-কমল শ্রীরামশঙ্করে ভাষে।
নাবিকে আশীষ করিয়া গমন করিল মুণির বাসে॥

এই রচনা যেমন সরল ও প্রাঞ্জল তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট। ইহাকে আধুনিক এই জাতীয় কবিতার সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপন করা যাইতে পারে। কবি যে শক্তিশালী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নদী পার হইবার এই ঘটনাটি অধ্যাত্ম রামায়ণের কোন কোন সংস্করণে বালকাণ্ডের সপ্তমসর্গের প্রথম ভাগে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্রের সহিত যখন রামলক্ষ্মণ গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিলেন, তখন রামচন্দ্রকে নৌকায় উঠিতে নিষেধ করিয়া নাবিক বলিয়াছিল—"হে নাথ! আপনার চরণে মানুষীকরণ চূর্ণ সংলগ্ন আছে। বিশেষতঃ কাষ্ঠ ও পাষাণে প্রভেদ নাই,

অতএব আপনার পাদপদ্ম প্রক্ষালিত করি। নতুবা রজঃস্পর্শে তরণী যদি রমণীয় তরুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে জানিবেন, আমার পরিবারবর্গের বিশেষ ক্ষতি হইবে।" এই বলিয়া সে রামচন্দ্রের পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিয়াছিল। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে।

মুণি বলিলেন বলি কৈবর্ত্ত তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে॥
কাতর কৈবর্ত্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময়॥
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন।
স্কন্ধে করি করি পার যাহ তিন জন॥
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর॥
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি॥
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিবে ধূলি তরণী হারাই॥ ইত্যাদি

(বঙ্গবাসী সং, ৬৯ পৃঃ)।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে—

নাবিক বলয়ে গোসাঞি না বলিহ আর।
ও চরণ ধূলা-গুণ শুনি চমৎকার॥
পদধূলি লাগে যদি কাষ্ঠে কি পাষাণে।
ততক্ষণে শরীর হয় শুনিঞাছি শ্রবণে॥
অতি দীন দুঃখী আমি নৌকামাত্র পুঞ্জি।
মনুষ্য হইলে মোর কিবা হবে আজি॥ ইত্যাদি

(ভট্টশালী সং, ১০৯ পৃঃ)।

উল্লিখিত উভয় কবি হইতেই রামশঙ্কর রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালার প্রথম খণ্ডের ২৩০-৫৮ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থেও ইহার বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৬ষ্ঠ সং, ৪৪৮-৪৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের বিবরণমূলক একটি প্রবন্ধ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং নগেন্দ্রবাবুও ইহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন (ঐ, ৪৪৮ পৃঃ)। কিন্তু এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কবির পরিচয়ের সহিত গ্রন্থের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। পুথিখানি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহার কি অবস্থা হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই।

রামানন্দ ঘোষ নিজেকে বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রচনা পাঠ করিলে বুঝা যায়, তিনি অদ্বৈতপন্থী জ্ঞানী ছিলেন, ভগবানের অখণ্ড সত্ত্বা তিনি সর্ব্ববিশ্বে অনুভব করিতেন—

ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে।

এবং—জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে।
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥

(ঐ, ২৩৭ পৃঃ)

এই জন্যই বোধ হয় তিনি নিজেকে বুদ্ধ অথবা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহাতে অযথা বৌদ্ধ প্রভাবের পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এই তথা-কথিত বুদ্ধদেব কালীর উপাসক ছিলেন, এবং দারুব্রহ্মেরও সেবা করিতেন। হনুমানের আজ্ঞালাভ করিয়া তিনি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন—

রামানন্দ লিখিল মারুতি আজ্ঞা পায়্যা।

(ঐ, ২৪৫ পৃঃ)

হনূমানের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি। কবি লিখিয়াছেন—

ছন্দরূপী যারে তুমি দেখহ বানর।
পরাৎপর মূর্ত্তি তিঁহো সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

মহারুদ্র হনূমান্ এ লীলার সার।

(লঙ্কাকাণ্ড)

মহাদেব আসিয়া হনূমানরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধিও ভাষা রামায়ণে রহিয়াছে।

কবির ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে এই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। প্রবৃত্তির সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

রামানন্দ কহে বাড়াইলে বাড়ি যায়।
তরঙ্গ উঠিলে তাহা থামা বড় দায়॥
আমি অভাগিয়া এত কষ্টে নৌকা পায়া।
সংসার ছাড়িয়াছি তাহারে ভজিয়া॥
জীয়ন্ত স্বামীতে বৈধব্যপ্রায় হয়্যা।
কঠিনতা গুণে কেহ না চায় ফিরিয়া॥
কঠিন যে জন তার ভাব রাখা ভার।
কণ্ঠাগত কলেবর হয়্যাছে আমার॥
অচল অথর্ব্ব স্বামী না বলে না চলে।
নীরব সতত কোন বাক্য নাহি বলে॥
প্রাণপণ কৈলে কিছু বাক্য নাহি কয়।
ভাল মন্দ জ্ঞান কিছু নাহিক বিষয়॥
নারী হয়্যা দারি বেশে ভ্রমিয়া বিকল।
নিতি নাহি গৃহবাসে কড়ার সম্বল॥
আপনি উদ্যোগ করি আনি দিবে বাতি।
নারীর উদ্যোগে ঘরে বসি খায় পতি॥

সন্ধ্যাতে রাত্রিতে দিনে তাহাতে সন্তোষ।
শাকান্ন বা মিষ্টান্ন বা সমান পরিতোষ॥
গৃহাশ্রমী হয়্যা মোর ঘট্যাচ্ছে জঞ্জাল।
নারী হয়্যা স্বামীকে পোষিক কতকাল॥ ইত্যাদি

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

অন্যত্র—

ভোজবিদ্যা প্রায় এই শরীর ধারণ।
নিমিষেতে জন্ম হয় নিমিষেতে পতন॥
সর্ব্বপ্রাণী জানে এই নশ্বর শরীর।
দেখি শুনি ইহা কেবা হইয়াছে স্থির॥
হাটে আসি কেহ করে লক্ষের ব্যাপার।
লাভে মুলে হারা হয় কোন কুলাঙ্গার॥
গাঁঠেতে বন্ধন রত্ন ঘোরে অনন্তরে।
না ডুবায় চিত্ত কেহ প্রেমের পাথারে॥
এই যে শরীর দেখ জলবিম্ব প্রায়।
জলেতে উপজি বিম্ব জলেতে মিশায়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত।
ভব-ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাজিত॥

(আদিকাণ্ড)

অন্যত্র—

শিশু কহে তুমি সভ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়্যা।
কুতন্ত্র ঘটাও লোকে মায়া ফাঁসি দিয়া॥
কোথা কার মাতাপিতা কোথা কার রাণী।
নানা যোনি ফিরি নিজ কর্ম্মভোগী আমি॥
মোর যথা কর্ম্মসূত্র তথা যাব আমি।
কর্ম্মসূত্র মোর প্রভু জনকজননী॥

নিঃসম্বন্ধী যে জন ঈশ্বর বলি তায়।
বিকার মরিয়া গেলে ঈশ্বর সে পায়॥
ফাঁপরে পড়িয়া জীব দেখে অন্ধকার।
মাতাপিতা ভাইবন্ধু মনের বিকার॥

(অরণ্যকাণ্ড)

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কবি বলিয়াছেন—

আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার॥
জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে।
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥
স্থির চিত্তে আইল মোর এ সব বিচার॥

(আদিকাণ্ড)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি নিজেকে বুদ্ধ অর্থে "জ্ঞানী" রূপেই প্রচারিত করিয়াছেন। অদ্বয় জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিজেকে "বুদ্ধ" বলিয়াছেন। কবি ছিলেন "কালীমাতার" ভক্ত, যথা—

বুদ্ধদেব (কবি স্বয়ং) কহে শ্যামা নিবেদি তোমায়।
ভাবিতেছি চিত্তে মাতা করি কিবা হয়॥

অথবা— বুদ্ধদেব কহে বৃথা জন্মিল সংসারে।
লয়্যা যাউক মহাকালী ভৈরবনগরে॥

এবং— বুদ্ধ কহে কালি রহিবারে নারী।
স্বধাম আমারে দান দেহ শীঘ্র করি॥ ইত্যাদি

উদ্ধৃত উল্লেখগুলিতে তিনি সর্ব্বত্রই নিজেকে বুদ্ধ রূপে প্রচারিত করিয়া কালীর কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। তিনি পঞ্চ শক্তিরও উপাসক ছিলেন, যথা—

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি॥
বাজিবে ঘোষের ডঙ্কা ভুবন ভিতরে।
পঞ্চশক্তি ইঙ্গিত বারণ করে কবে॥

(আদিকাণ্ড)

কবির গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যথা—

বলেতে হামির হৈলা রূপেতে কন্দর্প।
প্রতাপেতে শিশু হৈল যেন কালসর্প॥

(আদিকাণ্ড)

অতএব ষোড়শ শতকের পরে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (ঐ, ২৩৬ পৃঃ)।

কবি বোধ হয় কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় চতুর্বর্ণের সৃষ্টির পরে তিনি লিখিয়াছেন—

যজ্ঞ করে যজ্ঞকুণ্ডে অর্থী দিলা দানে।
সূর্য্যকৃপা হইতে উঠে মসিজীবিগণে॥
রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তারা সব হৈল।
মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাজকর কৈল॥

(আদিকাণ্ড)

প্রকাশিত বিবরণ হইতে কবি বাল্মীকির রামায়ণ, কি অদ্ভুত বা অধ্যাত্ম রামায়ণ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যে ভাবে এই গ্রন্থে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় অধ্যাত্ম রামায়ণই কবির আদর্শীভূত হইয়াছিল।

শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ

কবির পরিচয় তদ্রচিত গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ-প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। বনবিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের রাজত্বকালে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত রাজার নাম উল্লেখ করা ভণিতা তাঁহার রামায়ণে রহিয়াছে, যথা—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পানুয়ায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি॥

কবি রামমঙ্গল নামেও এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন, যথা—

শ্রীরামমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে সীতাহরণ পালা হৈল সায়॥

D C. I., ৪৬ পৃঃ

বাল্মীকির রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রভৃতি অবলম্বনে কবিচন্দ্রের রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। ভণিতায় তিনি ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

শিবশিবা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা।
পঞ্চশত শ্লোকে ব্যাসদেব বিরচিলা॥
বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথা এতদূরে সায়॥

অন্যত্র— বন্দিয়া বাল্মীকি সূত শৌনক চরণ।
শঙ্কর রচিলা রামলীলা উপাখ্যান॥

(ঐ, ৩২ পৃঃ)

কবিচন্দ্রের রামায়ণের মধ্যে সীতাহরণ, অঙ্গদের রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার, শিবরামের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি পালাগুলিই বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ এই সকল পালার পুথিই অধিকমাত্রায় পাওয়া যাইতেছে। কবির রচিত সমগ্র রামায়ণের পুথি এপর্য্যন্ত একখানিও আমরা দেখিতে পাই নাই। একই পালার বিভিন্ন পুথিতেও রচনার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। অতএব অপরের রচনা ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। কবিচন্দ্রের গ্রন্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গীত ও পঠিত হইত, এজন্য ইহা বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় গায়কদিগের দ্বারা ইহাও পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইয়া থাকিবে।

কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের ভণিতায় "শিবরামের যুদ্ধ" নামক পালা প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিচন্দ্রের রচনা যে কৃত্তিবাসের ভণিতায় চলিয়া

যাইতেছে, তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু পালার শেষে কবি লিখিয়াছেন—

সেবিয়া বাল্মীকি-পদ কবিচন্দ্র ভণে।
এতদূরে শিবরামের যুদ্ধ হইল সমর্পণে ॥

(D. C. I, ১৯৬ পৃঃ)

অথচ বাল্মীকির রামায়ণে এই আখ্যায়িকা নাই। রামায়ণ বহির্ভূত এই উপাখ্যান সাধারণে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে না ধারণা করিয়াই বোধ হয় কবি বা গায়কগণ বাল্মীকির নামে ইহা প্রচারিত করিয়া থাকিবেন।

কবিচন্দ্র-রচিত অঙ্গদের রায়বার বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই আখ্যায়িকাটি সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলেই উভয় কবির ভণিতায় প্রচারিত পালা দুইটির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

রাবণ বলে বল্লি কি রাম লঙ্কাপুরে এসে।
বুঝি বা রামের ডরে রৈতে নারি দেশে ॥
এই কি ভবেছে গুহক-চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতা ॥
রামের যোগ্যতা যত সব দেখতে পাই।
নৈলে কেন দেশ থেকে দূর করে দেয় ভাই ॥

* * *

এনেছি রামের সীতা বলগে তার তরে।
করুক এসে রামতপস্বী প্রাণে যত পারে ॥
সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে।
সতী যে রমণী যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥
গরুড়ের ধন যদি হ'রে লয় কাকে।
খলের শরীরে পাপ যদ্যপি না থাকে ॥ ইত্যাদি

(বঙ্গবাসী সং, ২৫৩ পৃঃ)

আর কবিচন্দ্রের পালাতে পাওয়া যায়—

রাবণ বলে কি বলিবে * * আস্তে।
না জানি কি হব তবে, থাকিতে নারিব দেশে ॥
মনে মনে পন (?) কর‍্যাছে গোহক চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় কর‍্যা উদ্ধারিবে সীতা ॥
তোর রামের পৌরস সব দেখতে পাই।
নইলে কেন দেশে হতে খেন্ত্যা দিলেক ভাই ॥

*　　　　*　　　　*

আন্যাছি রামের সীতা জা বলগা তারে।
করুক আস্যা রামতপসী জত করিতে পারে ॥
সুমেরু পর্ব্বত জদি মক্‌খিকায় নাড়ে।
সাধ্যিক রমণী জদি নিজ পতি ছাড়ে ॥
গরুড়ের ধন জদি হর‍্যা নেই কাকে।
খলের শরীরে জদি পাপ নাঞি থাকে ॥　ইত্যাদি

(D C. I., ১২৯ পৃঃ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুথিতে অঙ্গদের রায়বার পাওয়া যায় না, বরং এই পালাটির সুপ্রাচীন পুথিতে কবিচন্দ্রের ভণিতাই দৃষ্ট হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবিচন্দ্রের রচনাই কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত হইয়াছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সং, ১১৮-৯ পৃঃ ; D. C J , xxii-xxiii পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এখানে অযোধ্যাকাণ্ডের কিয়দংশ কবির রচনার নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

সীতা বলে কারে এত বুঝাইছ তুমি।
স্বর্গে অভিলাষ নাই বনে যাব আমি ॥
যুবতীর পতি গতি রহিতে নারিব।
এড়্যা গেলে অহে নাথ পরাণে মরিব ॥

অমৃত সমান মোর না হইব ক্লেশ ।
ব্র্যাঘ্র ভল্লুক আদি না করিব দ্বেষ ॥
বাকল অজিন মোর পট্টের বসন ।
তৃণ-পত্র শয্যা মোর পালঙ্গ যেমন ॥
তোমা ছাড়্যা একদণ্ড রহিতে নারিব ।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কি কর্যা গোঙাব ॥
সীতার বুঝিয়া মন প্রভু দিল সায় ।
রামলীলা রামায়ণ কবিচন্দ্রে গায় ॥

(কঃ বিঃ ৩৯ সং পুথি, ১১ পত্র)

জগদ্রাম ও রামপ্রসাদের রামায়ণ

কবিদ্বয়ের পরিচয়ঃ—জগদ্রাম পিতা, এবং রামপ্রসাদ পুত্র। উভয়ে মিলিয়া রামায়ণ এবং দুর্গাপঞ্চরাত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বাড়ী ছিল দামোদরের নিকটবর্ত্তী ভুলুই গ্রামে। জগদ্রামের পিতার নাম রঘুনাথ, এবং মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের আদেশে জগদ্রাম রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদও তাঁহার এই কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা জগদ্রাম অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ

১। পিতা রঘুনাথ রায় মাতা শোভাবতী ।
দোঁহে জন্মদাতা আমি অধম অকৃতী ॥
সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বহুবার ।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরাম-পদে নমস্কার ॥
যাঁহার আদেশে হৈল এ গ্রন্থ-রচনা ।
নিরন্তর তাঁর পদ করিয়ে বন্দনা ॥
শ্রীমাধব রাধাকান্ত রমাকান্ত আর ।
শ্রীরামগোবিন্দ ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার ॥
শ্রীরামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বগুণে ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রামনারায়ণ তিনে ॥
দেশ অধীপ শ্রীরঘুনাথ নারায়ণে ।
সবংশ সহিত তাঁরে রাখিও চরণে ॥

মুদ্রিত গ্রন্থ, ৪৪৯ পৃঃ

অন্যত্র—
বিপ্রবংশে বন্দ্যঘাটি ভুলুই গ্রামেতে বাটী
জগতে রচিল মহাকাব্য ।

ঐ, ৫৩ পৃঃ

অবলম্বন করিয়া রামায়ণ কাব্য রচনা করেন, কিন্তু কৃত্তিবাস কর্তৃক বিস্তৃতভাবে লঙ্কাকাণ্ড রচিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সংক্ষেপে ইহা রচনা করিয়া অদ্ভুত রামায়ণ অনুসরণে উত্তরকাণ্ড (পুষ্করকাণ্ড) রচনা করেন। পরে লঙ্কাকাণ্ড বিস্তৃতভাবে রচনা করিবার জন্য পুত্রকে অনুমতি প্রদান করিলে রামপ্রসাদ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[২]

কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উভয় কবির রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৬৫ এবং ১৭৮৩ সংখ্যক পুথিদ্বয়েও ইহার প্রতিলিপি পাওয়া যাইতেছে এই সকল আদর্শ অবলম্বন করিয়া পিতাপুত্রের মধ্যে কে রামায়ণের কতখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহার ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জগদ্রাম অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতীর স্বয়ম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্ভুত রামায়ণ অনুসরণ করতঃ রাম ও সীতার মনুষ্যজন্মের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপর অধ্যাত্ম রামায়ণের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবী ও দেবগণের প্রার্থনায় রাবণ বধের জন্য নারায়ণ চারিঅংশে দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধের সময়ে শিবস্থাপনার কল্পনা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জগদ্রামের ভণিতা দৃষ্ট হয় (মুদ্রিত গ্রন্থের ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার পরে রামপ্রসাদের ভণিতা আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র লঙ্কাকাণ্ড রামের অভিষেক পর্য্যন্ত (ঐ, ৩০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) রামপ্রসাদ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপর পুষ্করকাণ্ড রামরাস পর্য্যন্ত (ঐ, ৩০৭-৩৭৬ পৃঃ) জগদ্রাম রচনা করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডের প্রারম্ভেই রামপ্রসাদের ভণিতা

২। পিতা জগদ্রাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যেমতে॥
সীতারামলীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত আধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত
রচনা বিবিধ রসধাম॥
তারপর জ্ঞাত করি লঙ্কাকাণ্ড পরিহরি
সংক্ষেপেতে করিলা বর্ণন।
লঙ্কাকাণ্ড সুপ্রকাশ রচিলা সে কৃত্তিবাস
বিস্তারে শুনুছে সর্ব্বজন॥
এই মনে করি পিতা ছড়িয়া লঙ্কার কথা
অদ্ভুত প্রসঙ্গে দিলা মন॥
লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড যেমত অমৃতভাণ্ড
সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে।
মোর লৈয়া অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি
রচনা করহ রামপ্রীতে॥
(মুদ্রিত গ্রন্থ, ১৮০-৮১ পৃঃ)

রহিয়াছে। সীতার বনবাস, লবকুশের জন্ম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা, লবকুশের যুদ্ধ, এবং রামের যজ্ঞ সমাপন পর্য্যন্ত অংশ (৩৭৭-৪৩২ পৃঃ) রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশ রামের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত (৪৪৩-৪৫০ পৃঃ) জগদ্রাম রচনা করিয়াছেন। অতএব জানা যাইতেছে যে, জগদ্রাম অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে সেতুবন্ধনের প্রারম্ভ, অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে পুষ্করকাণ্ড, এবং পুনরায় অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসরণ করিয়া রামের সভায় অগস্ত্যের আগমন হইতে রামের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। আর রামপ্রসাদ অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে লঙ্কাকাণ্ড, এবং "বশিষ্ঠ পুরাণ মত পিতাপুত্রে যুদ্ধ"-উত্তরকাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্যই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা লঙ্কাকাণ্ড রচনা না করিয়া অদ্ভুত রামায়ণের প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ রচনার সময়ঃ—ইঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া যে দুর্গাপঞ্চরাত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। তাহাতেও দেখা যায় যে, তিন দিবসের গান জগৎরাম রচনা করিয়া নবমী ও দশমীর পালা রামপ্রসাদকে রচনা করিতে অনুমতি দান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ "ভুজ-রন্ধ্র-রস-চন্দ্র" শাকে অর্থাৎ ১৬৯২ শক বা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে "মাধবমাসের শুক্লপক্ষের ষোড়শ দিবসে গুরুবারে" সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-রচনার এই তারিখটি ১৩০২ সালে প্রকাশিত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। ১৩৩৬ সালের প্রবাসী পত্রে যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সন, মাস, দিন হিসাবে এই তারিখ নির্ভুল (ঐ, ৩৫০-১ পৃঃ)। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—

পিতা জগৎরাম মোর রামপরায়ণ।
সেঁহু কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামায়ণ রচনার পরে দুর্গাপঞ্চরাত্র রচিত

হইয়াছিল। কিন্তু জগৎরামের রামায়ণ রচনার তারিখ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

সপ্তদশ শতাব্দে দ্বাদশযুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
ঊনত্রিশ দিবসে বারেতে বৃহস্পতি।
জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।

(মুদ্রিত গ্রন্থ, ৪৫০ পৃঃ)

অর্থাৎ ১৭১২ শক বা ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। যোগেশ বাবু গণিয়া দেখিয়াছেন যে, সন, মাস, দিন ও তিথি হিসাবেও এই তারিখ নির্ভুল (প্রবাসী, ১৩৩৬, ৩৫০-১ পৃঃ)। তাহা হইলে দেখা যায় যে, রামপ্রসাদ কর্তৃক দুর্গাপঞ্চরাত্র রচিত হইবার প্রায় ২১ বৎসর পরে জগদ্রামের রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। অথচ রামপ্রসাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে জানা যায় যে, রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্র রচিত হইয়াছিল। এইজন্য শেষোক্ত গ্রন্থ-রচনার তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বোধ হয় সকল পুথিতে ছিল না বলিয়াই মুদ্রিত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, উভয় কবি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গ্রন্থ-পরিচয় ঃ—বিভিন্ন আদর্শে গ্রন্থ রচিত হওয়াতে জগদ্রামের গ্রন্থে অনেক চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অযোধ্যা হইতে দূত ভরতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে ভরত তাহাকে অযোধ্যার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, অযোধ্যার সকলেই কুশলে আছেন, দূত এই মিথ্যা উক্তি করিয়াছিল (২।৭০।১২)। ইহাই অনুসরণ করিয়া কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

দূত বলে—রাজপুত্র, সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল॥

(বঙ্গবাসী সং, ১১১ পৃঃ)

কিন্তু জগদ্রাম লিখিয়াছেন যে, ভরতের প্রশ্নে—

কিছু নাহি কহে দূত রয় অধোমুখে।
তাহা দেখি ভরত বিকল হৈলা শোকে ॥
কতক্ষণ রই পুনঃ কয় সেই চর।
মোরে নিষ্ঠা পাঠালো বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
ত্বরা কর চল ঘর শুন মোর বাণী।
অন্য কথা বলিতে নিষেধ কৈলা মুনি ॥

(মুদ্রিত গ্রন্থ, ১১১ পৃঃ)

অধ্যাত্ম রামায়ণে দূত বলিয়াছিল,—ভরত যেন অনুজ সমভিব্যাহারে শী অযোধ্যায় আগমন করে (ঐ, ২।৭।৫৩-৫৪)।

বাল্মীকির রামায়ণে শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক মন্থরার লাঞ্ছনা বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ২।৭৮ সর্গ দ্রষ্টব্য)। কৃত্তিবাস ইহারই অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

·········ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীকে সে ফেলে ভূমিতলে ॥
হিঁছড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥ ইত্যাদি

(বঙ্গবাসী সং, ১১৩ পৃঃ)

অধ্যাত্ম রামায়ণে শত্রুঘ্নের এইরূপ উৎকট বীরত্বের পরিচয় নাই। ভরত যখন কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, তখন জগদ্রামের শত্রুঘ্ন তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—

মন দিয়া শুন দাদা বলি পদতলে ॥
দৈবকালে ধৈর্য্য হৈলে তবে সে নিস্তার।
উগ্রগতি কৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার ॥

(ঐ, ১১৪ পৃঃ)

আবার অদ্ভুতের অনেক অদ্ভুত ঘটনাও ইহাতে বর্ণিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত হইল। রামচন্দ্র সৈন্যসহ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইবেন।

তিনি লক্ষ্মণকে ইহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

লঙ্কাপুরী যাবে রাম রাবণ বধিতে।
আপনার জলজন্তু কর এক ভিতে॥

কিন্তু সিন্ধু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া লক্ষ্মণ—

কোটি ভানু জিনি তনু কোপে সূর্য্য হৈলা॥
ক্রোধ করি লক্ষ্মণ পড়িল সিন্ধুজলে।
অঙ্গতেজে জল শুকাইছে হেন কালে॥

সমুদ্র শুষ্ক হওয়াতে পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিল দেখিয়া দেবগণ স্তবে পরিতুষ্ট করিলে লক্ষ্মণ কোপ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু সমুদ্রের যে জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তাহার পূরণ হইবে কিরূপে। কবি লিখিয়াছেন—

জানকি জানকি বলি করেন রোদন॥
সেই চক্ষুজলে পূর্ণ করিয়া বারিধি।
নেত্রজলে সিন্ধুপূর্ণ কৈলা কৃপানিধি॥

(১৭৪ পৃঃ)

এই আখ্যায়িকাটি অদ্ভুত রামায়ণের ষোড়শ সর্গে এইভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে। এইরূপে অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের ঘটনার সমাবেশ করিয়া জগদ্রাম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পিতাপুত্রের সম্মিলিত চেষ্টায় যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "রামরাসের" কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। অগস্ত্য রামের মাধুর্য্যলীলা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে যাইয়া বলিতেছেন—

শ্রীরামের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই লীলা।
ঐশ্বর্য্য-বিলাস পূর্ব্বে হনূ বলেছিলা॥

মাধুর্য্য-বিলাস অপ্রকাশ এ না শুনি।
পদে ধরি নতি করি বল শূলপাণি॥

(৩৬৮ পৃঃ)

শিব বলিলেন—

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য লীলা জিজ্ঞাসিলে তুমি।
ঐশ্বর্য্য প্রকট লীলা জ্ঞাত হই আমি॥
মাধুর্য্য নিগূঢ়তত্ত্ব অতি গুপ্ততম।
পুরুষের ব্যক্ত নহে মাধুর্য্যের ক্রম॥
নারীভাব হইয়া ভজয়ে যেই পাত্র।
মাধুর্য্য রসের বেত্তা সেই হয় মাত্র॥

(ঐ)

শিবের নির্দ্দেশে অগস্ত্য হনূমানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হনুমান সরযূ-তীরে অশোককাননে সখীগণ সহ অনুষ্ঠিত ভাগবতের অনুকরণে সীতারামের রাসলীলার এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের শ্রীরামরসায়ণ

কবির পরিচয় ঃ—রঘুনন্দন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গণনায় তিনি তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ। কবির পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী, নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে। শ্রীরামরসায়ণের শেষ ভাগে কবি নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ রচনার তারিখের উল্লেখ করেন নাই। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"১১৯৩ সালে তাঁহার (কবির) জন্ম হয়। ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি রামরসায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন।" তাহা হইলে ১২৩৮ সন বা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

রামরসায়ণ ব্যতীত কবি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক শ্রীরাধামাধবোদয় নামক কাব্য, এবং গীতমালা নামক একখানি পদাবলী গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ইঁহার রচিত ত্রিশখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ এখন হস্তলিখিত পুঁথিতে ইঁহার পুত্র মদনগোপাল গোস্বামীর নিকট আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। (বঙ্গবাসী সং, ভূমিকা, ২ পৃঃ)। ইহা হইতে কবির সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়ঃ—যে তিনজন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, নিত্যানন্দ তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে এবং বৈষ্ণব সমাজ গঠনে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশে জাত এবং গোস্বামী-পদবীভূষিত রঘুনন্দনের গ্রন্থে যে ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভক্তিরসের অভিব্যক্তিতেই গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের উপাসনা-মূলক, তাহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত রঘুনন্দন বিষ্ণুর অপর অবতার রামচন্দ্রের আখ্যায়িকা লইয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ রামের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতে সে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহুল প্রচারই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রচীন কবি যে রাসলীলা অবলম্বন করিয়া পদ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব রঘুনন্দন এই গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণ-রচয়িতাগণের অভাব নাই। বিশেষতঃ তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ ব্যতীত অধ্যাত্ম রামায়ণ, বিবিধ পুরাণ এবং রামলীলা বিষয়ক কাব্যগ্রন্থাদি তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ-রচিত প্রায় যাবতীয় আখ্যায়িকারই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এক একটি আখ্যায়িকা কবি অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য এই গ্রন্থ আকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় দ্বিগুণ

হইয়া পড়িয়াছে। পড়িতে মধ্যে মধ্যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে অযোধ্যার বর্ণনায় কবি যেভাবে উপমার মালা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই ১০৯৯ সালে (১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে) অনুলিখিত পুথিতে প্রাপ্ত রামনারায়ণের "বৃন্দাবন-ধ্যান" নামক গ্রন্থের কথা মনে করাইয়া দেয়। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি তুলনামূলক আলোচনার জন্য কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল—

(রঘুনন্দনের) কারণ্ডব সব জলে উঠুডুবু করে।
বন্ধু দেখি লজ্জাবতী যেন দ্বারান্তরে॥
(তুলনীয় রামনারায়ণের) তায় উঠেডুবে কারণ্ডব আহার উপেখি।
যেন বন্ধু অনুরোধে বেস্ত পর-প্রিয়া সখী॥
(রঘুনন্দনের) উদক-অন্তরে মৎস্য দেখিতে শোভন।
আকাশেতে আচ্ছাদিত যেন তারাগণ॥
(রামনারায়ণের) তায় অন্তরে সঞ্চরে ছোট বড় মৎস্যগণ।
যেন নীল বস্ত্রে আচ্ছাদিল প্রিয়া আভরণ॥ ইত্যাদি

ইহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এক কবি অপরকে অনুসরণ করিয়াছেন। কৌশল্যাদির গর্ভ-ধারণের পরে—

প্রতিদিন দেখে স্বপ্নে রাণী তিনজন।
যেন চতুর্দ্দিকে ফিরে চক্র সুদর্শন॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধ-ারী।
বেড়ি রহে বিষ্ণু-পারিষদ সারি সারি॥ ইত্যাদি

(বঙ্গবাসী সং, ১২ পৃঃ)।

এইরূপ স্বপ্নের বিবরণ বাল্মীকির রামায়ণে নাই, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে রহিয়াছে। শচীদেবী গর্ভ ধারণ করিলে পর স্বামী স্ত্রী উভয়েই এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। ভাগবতে ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণিত আছে। তাহারই অনুকরণে কবি দেবগণ কর্ত্তৃক গর্ভস্থ রামের চৌত্রিশা স্তব রচনা করিয়াছেন। রামের বাল্যলীলা বর্ণনায় ভুষণ্ডী কাকের

বিবরণ যে তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যথা—

শ্রীমান্ তুলসীদাস নিজ রামায়ণ।
উত্তরকাণ্ডেতে ইহা করেন বর্ণন॥ (ঐ, ২০ পৃষ্ঠা)

দশরথ সপুত্র গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া যুদ্ধে গুহককে বন্দী করেন, তখন রামচন্দ্র তাহাকে মুক্তিদান করিলে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের রামায়ণে দেখা যায়, রামচন্দ্র মৃগয়া করিতে যাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন গুহক আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিলে রাম তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ নানাভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। কবি তাহারই অনুকরণে রামচন্দ্রের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শিশুগণের সহিত বাল্যক্রীড়া করিবার কালে রাম এক সখার ধনু আকর্ষণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে সে দুঃখিত হইয়া বলিল—

যত বল তোঁহার সকল মোরা জানি।
অকারণে ভাঙ্গিলে আমার ধনুখানি॥
যদি করিতেছে কণ্ডু ভুজেতে তোমার।
মিথিলায় গিয়া বল জান আপনার॥

(বঙ্গবাসী সং, ৩১ পৃঃ)।

তখন রামের প্রশ্নের উত্তরে সে হরধনু ও জনকের প্রতিজ্ঞার বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া সীতার রূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল—

মেনকা উর্ব্বসী শচী রম্ভা তিলোত্তমা।
তার কোটি-অংশতুল্য নহে মনোরমা॥
তাহার তনুর তুল্য না হয় তড়িত।
কুন্দন কনক বুঝি হয় বা কিঞ্চিত॥
কিবা কাল কুটিল কুটিল কেশভার।
বিধু বিনা বদনে তুলনা নাহি আর॥

যেমত তাহার রূপ তাহে মানি হেন।
ইহার বিধাতা পঞ্চবাণ হবে যেন ॥
সৌন্দর্য্য-সাগর মথি তুলি নবনীত।
মন সাধে কাম তারে কর্য্যাছে গঠিত ॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৩২ পৃঃ)

ইহা শ্রবণ করিয়া—

কিন্তু শুনি সীতার সৌন্দর্য্য অনুপাম।
মনে প্রবেশিলা ধনুর্ব্বাণ ধরি কাম ॥
অপার মহিমা দেখ শ্রীলীলা-শকতি।
পূর্ব্বরাগ প্রকাশিলা নিত্য-প্রিয়া প্রতি ॥

অন্যত্র সীতার পূর্ব্বরাগও বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীদাসের মহাভারতেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়—

সীতাদেবী শুনি বার্ত্তা আসে সঙ্গোপনে।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে ॥
মধুর কোমল মুর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥ (বনপর্ব্ব)

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাড়কার জন্মবিবরণ বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চবিংশ সর্গে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন তাহাই অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

সুকেতু নামেতে এক ছিলা যক্ষবর।
প্রজালাগি তপ কৈলা কথোক বৎসর ॥
তপেতে সন্তুষ্ট হয়্যা বিধাতা ঈশ্বর।
তাড়কা নামেতে কন্যা তাহে দিলা বর ॥ (ঐ, ৩৭ পৃঃ)

সুন্দ নামক দৈত্যের সহিত তাড়কার বিবাহ হয়, এবং তাহাদের মারীচ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অগস্ত্যের দ্বারা সুন্দ নিহত হইলে মাতাপুত্র অগস্ত্যকে আক্রমণ করে, তখন মুনি শাপ প্রদান করিলেন—

মারীচ তুমিরে হও রাক্ষস দারুণ।
তাড়কা রাক্ষসী হও তুমি নিষ্করুণ॥

রামের হস্তে নিহত হইয়া যে তাড়কা পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের শেষভাগে বর্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার প্রাক্কালে রামচন্দ্র কৌশল্যার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। তখন তাঁহার শরীরে রক্ষা-বন্ধন করা হইল—

মন্ত্র পড়ি পড়ি করে সর্ব্বাঙ্গে রক্ষণ।
অজদেব রক্ষা করু তোমার চরণ॥
মনিমান্ জানুযুগ উরু যজ্ঞেশ্বর।
শ্রীঅচ্যুত কটিতট হয়াস্য জঠর॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৩৫ পৃঃ)

চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও কৃষ্ণের শরীরে এইরূপ রক্ষা বন্ধনের বিবরণ রহিয়াছে (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৬৮-৯ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য)। পুতনাবধের পরে গোপীগণও মন্ত্রপাঠ করিয়া কৃষ্ণের শরীরে রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন (ভা, ১০৷৬৷১৭-২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কবি তাহারই অনুকরণে ইহা রচনা করিয়াছেন। এইরূপে কবির বর্ণনায় সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের পরিস্ফুরণ হইয়াছে।

অহল্যা-উদ্ধার-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

মুনি বেশে আল্যা ইন্দ্র অহল্যা জানিলা।
তথাপি তাহার সঙ্গে রঙ্গে মন দিলা॥

ইহাতে গৌতমের শাপের সার্থকতা অনুমিত হইবে। রামচন্দ্র-নাবিক-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিবার কালেও কবি বলিয়াছেন—

এই স্থানে এক লীলা শুন সর্ব্বজনে।
কিন্তু এই লীলা নাহি দেখি রামায়ণে॥
পরম মধুর এই লীলা এ কারণ।
শিষ্ট পরম্পরা দেখি করিব বর্ণন॥ (৪৭ পৃঃ)

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে ইহা গ্রহণ করেন নাই,

অন্য কবিগণের রচনা পাঠ করিয়াই লিখিয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

স্পর্পণখা রামের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া ভাবিতেছে—

একি মূর্ত্তিধর হয়্যা পঞ্চশর
কানন ভিতর বিহার করে।
অথবা শৃঙ্গার ধরিয়া আকার
আমা সবাকার হৃদয় হরে॥
সকল চারুতা করিয়া একতা
গরিলা বিধাতা ইহারে জানি।
নব জলধর স্ফুট ইন্দীবর
সম কলেবর বরণখানি॥ (২২৯ পৃঃ)

আধুনিক কবিগণের রচনায় এই ছন্দের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। এইরূপ বিভিন্ন ছন্দ-ব্যবহারের জন্য রঘুনন্দনকে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে এবং সঙ্কলনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া কবি তাঁহার গ্রন্থ বিশেষ উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিজ দুলালের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৬২৯ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যায়। পুথিখানি ক্ষুদ্র, মাত্র ১—১৪ পত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতিলিপি ১২৪৫ সালে বা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কবির পরিচয় সম্বন্ধে ইহাই মাত্র জানা যায় যে, তিনি আমদানে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আমদানে ঘর মহামণ্ডল সুখ্যাতি।
শ্রীবঙ্কবেহারী রাজ ঘরে পান দিপ্তি॥

কবির পিতার নাম বোধ হয় গৌরীকান্ত, এবং মাতার নাম সুভদ্রা ছিল। পুত্র রামরেণুর জন্য তিনি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন—

গৌরিকান্ত আত্মজ সুভদ্রা-গর্ব্ভোদ্ভব।
শ্রীরামরেণুকে সুখে রাখিবে রাঘব॥ ঐ, ২৪ পৃঃ

ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীবের সহিত দেখা হইলে রাম অগ্নিসাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিলেন—

সুগ্রীব ইহার সাক্ষী এই হুতাশন।
তুমি দিবে সীতা আমি দিব রাজ্যধন॥ পৃঃ ২

তৎপর সুগ্রীব দুন্দুভি দৈত্যের সহিত বালির যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে দুন্দুভিকে মায়াবীর ভাই বলা হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে মায়াবী দুন্দুভির পুত্র (ঐ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৯।৪)। আদি রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস এবং উনবিংশ শতাব্দীর রঘুনন্দন উভয়েই মায়াবীকে দুন্দুভির ভাই বলিয়াছেন। কবি দুলাল এই প্রসিদ্ধিই অনুসরণ করিয়াছেন।

সুগ্রীবের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন করিতে তারা বালিকে নিষেধ করিয়াছেন। উত্তরে বালি বলিতেছেন—

বালী বলে বামাবুদ্ধি বিচক্ষণ নয়।
রাম যিনি, তিনি তিন লোকে দয়াময়॥
ভক্ত-প্রাণ প্রভু রাম ভুবন ভিতরে।
তিনি কেন আসিবেন সুগ্রীবের তরে॥ পৃঃ ৮

বালিবধের পর তারা রামকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—

জেমন কান্দ্যালে মোরে মার‍্যা মোর ভর্ত্তা॥
তোমাকে কন্দ্যায়া তেম্নি জনকনন্দিনী।
ত্যাগ কর‍্যা জাইবেন জদি সতি আমি॥ ঐ, ১০ পৃঃ

ঘটনার সমাবেশে এই গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র, কিন্তু রচনা কবির নিজস্ব। বানরগণের সহিত সম্পাতির সাক্ষাতে ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

রামমোহনের রামায়ণ [১]

ইহাও উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট রামায়ণ গ্রন্থ। কবির নাম ছিল রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ী মাটীয়ারী। এই গ্রাম কাটোয়ার তুই ক্রোশ দক্ষিণে নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "সাঙ্গ হল সপ্তদশ শত ষষ্টি শকে" অর্থাৎ ১৭৬০ বা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার নির্দ্দেশে তিনি সীতারামের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে হনূমানের আদেশ লাভ করিয়া "জীবের কল্যাণের" নিমিত্ত তিনি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

নীলরতনবাবু লিখিয়াছেনঃ—"এই গ্রন্থ বাল্মীকি-প্রণীত মূল রামায়ণের ঠিক অনুবাদ নহে। বাল্মীকি-রামায়ণে যাহা নাই, এমন অনেক কথা ইহাতে আছে। তবে বাল্মীকি গ্রন্থকর্ত্তার প্রধান মহাজন। কবি, কৃত্তিবাস ও অপরাপর রামায়ণরচকদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু ঋণ করিয়াছেন। বাল্মীকির রাময়ণের ন্যায় ইহা সাত কাণ্ডে বিভক্ত এবং পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। এই রাময়ণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা আদ্যন্ত ভক্তিরসপূর্ণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তরণীসেন-বধ, হনূমান কর্ত্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে রাবণের মৃত্যু-বাণ আনয়ন, রামচন্দ্রের শক্তিপূজা ইত্যাদি অনেক কথা আছে। রামমোহনের রামায়ণে তাহা নাই। এই রামায়ণে সীতার পাতাল-প্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, শ্রীরামাদির সরযূ-প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। কুশলবের যুদ্ধের পর রামের সহিত সীতার পুনরায় মিলন হইল। তাহার পর সীতা অসিতারূপে শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করিলেন। পরে সকলে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত হইয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি বাল্মীকির

১। এই গ্রন্থের কোন পুথি আমরা পাই নাই। স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০২ সালের সহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে সঙ্কলিত করিয়া এখানে গ্রন্থবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

রামায়ণ, অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের গ্রন্থাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।”

পূর্ব্ববর্ত্তী তিন শতাব্দী যাবত বৈষ্ণবগণ বঙ্গদেশে যে ভাবে কৃষ্ণভক্তিরস প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাবাধীনে আসিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিগণ ভক্তি স্নেহ প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলির অভিব্যক্তি সহকারে যে রামায়ণ রচনার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, রামমোহনের রামায়ণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। রাম বনগমন করিতেছেন, তখন—

কৌশল্যা জননী সঙ্গেতে সপত্নী
রথের পশ্চাতে ধান।
ডাকে উচ্চস্বরে ফিররে ফিররে
রাম অযোধ্যার প্রাণ॥
দশরথ রায় অতি বেগে ধায়
ডাকে ঊর্দ্ধ কর করি।
রাথরে বিমান রামের বয়ান
জনমের মত হেরি॥
কহে নারীগণ শুনহ রাজন
রাম গেলা বহু দুরে।
তবে রাজারাণী পড়িল অমনি
অশেষ বিলাপ করে॥

এই বর্ণনা পাঠে কৃষ্ণ মথুরায় যাইবার কালে নন্দযশোদা ও গোপীগণের দৃশ্যই মনে পড়িয়া যায়। আবার লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িয়াছেন, তখন রাম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

উঠরে লক্ষ্মণ মেলরে নয়ন
ওরে পূর্ণিমার শশী।
মোরে স্নেহ করি রাজ্য পরিহরি
হইলা কাননবাসী॥

নয়ন-গোচরে রাখিতা আমারে
আমি অঙ্গ, তুলি ছায়া।
কি দোষ পাইয়ে নিদারুণ হয়ে
ত্যজিলা আমার মায়া॥

ইহা পাঠ করিলেই পদাবলীর কোমল মধুর সুর কর্ণে ধ্বনিত হয়। অন্যান্য কবিগণও রামচন্দ্রের আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় এই বিশেষত্ব এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে নাই।

কমললোচন দত্তের রামভক্তিরসামৃত

এই গ্রন্থের অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে (কঃ বিঃ ৩২৪৩-৬ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে বোধ হয় কবি সমগ্র রামায়ণই বঙ্গভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম কর্ত্তারাম দত্ত, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহাদের বাড়ী ছিল তৎকালীন উৎকলের অন্তর্গত মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী কুলকুড়্যা গ্রামে। ইহা সাহাপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত কাশীগঞ্জ থানায় অবস্থিত ছিল। ১৭৬৪ শক বা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবি গ্রন্থ-রচনা শেষ করেন। কবির গুরুর নাম পীতাম্বরাচার্য্য। গ্রন্থশেষে কবি এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

উৎকলস্থ পুণ্যগ্রাম মেদিনীপুর দেশ॥
ইংরেজ রাজত্ব সাহাপুর পরগণা।
কোলকুড়্যা নাম গ্রাম কাশীগঞ্জ থানা॥
সপ্তদশ শত চতুর্ষষ্ঠি শকাব্দেতে॥ ইত্যাদি

এবং মাতা পদ্মাবতী পিতা কর্ত্তারাম দত্ত।
কমললোচন নাম জাতিএ কায়স্থ॥

অন্যত্র— পীতাম্বরাচার্য্য মহাশয়ের চরণে।
বিনয় পূর্ব্বক বন্দি অতি সাবধানে॥

কৃপাবশে জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়া করি।
যার পদাশ্রয় করি ভবকূপে তরি॥
তাঁহার চরণ-রেণু মস্তকে ধরিয়া।
কমললোচন কহে পয়ার রচিয়া॥

এই গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন বিদ্যাসাগরীয় যুগ অতীত হইয়া মাইকেলী যুগের প্রারম্ভের সূচনা হইয়াছে। এই সময়েও কবি মেদিনীপুরের এক প্রান্তে বসিয়া রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের সাড়া তিনি অনুভব করেন নাই। রামরসায়ন রচয়িতা রঘুনন্দনের ন্যায় ইনিও প্রাচীন যুগের শেষ দেউটি ধরিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তকে সাধারণতঃ প্রাচীন যুগের শেষ কবি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকিয়া যে তিনি কতকাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবের অধীন হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে রঘুনন্দন, কমললোচন প্রভৃতি কবিগণকেই এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে।

গ্রন্থের নামটি পাঠ করিলেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কথা মনে পড়ে। বস্তুতঃ কবি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবাধীনে আসিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের নামকরণেই প্রতীয়মান হয়। কবি নিজেও লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থ মধ্যে রামভক্তি সুধা।
যার পানে নাশ হয় ভবব্যাধি বাধা॥

(D. C. I, ২৪৪ পৃঃ)

কৃষ্ণভক্তিরসসিক্ত বঙ্গদেশে কবি রামভক্তিরস-প্রস্রবণ প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে বহু রামায়ণ বিশেষরূপে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও যিনি এবম্বিধ গ্রন্থ-রচনায় পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি যে নূতন কিছু প্রদানের উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তুলসীদাসের রামায়ণের আদর্শে গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য যে তাঁহার ছিল, তাহা উদ্ধৃত উক্তি হইতেই জানা যায়। ইহা ব্যতীত তত্ত্বালোচনাতেও

কবি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। হনুমান লঙ্কাদগ্ধ করিয়া গেলে পর রাবণ কিংকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য পরামর্শ করিতেছিলেন। তখন রামের শরণাপন্ন হইবার উপদেশের উত্তরে রাবণ বলিতেছেন—

রাক্ষসের ভক্ষ্য হয় নরবানরেতে।
তাহাদের স্মরণ লইব কোন মতে॥
আপনার কুলমান ছাড়িয়ে জে জন।
কুকর্ম্ম করিয়ে করে দেহের পোসন॥
তাহাতে পৌরুষ নাম নাহিক তাহার।
সকলেতে সদা তারে করএ ধিৎকার॥
দেহের লাগিয়ে কেন কুকর্ম্ম করিব।
এ দেহ আমার কভু স্থির না রহিব॥
এ দেহ অনিত্য আর অত্যন্ত কুচ্ছিত।
দেহের সম্বন্ধ নাহি দেহির সহিত॥
অনর্থ দেহের জন্য সত্রুর শ্মরণ।
না লইব রাম-হস্তে হউক মরণ॥
সুনহ সুনহ মন্ত্রিগণ সভে সুন।
দেহের যে গতি তাহা কহিতেছি পুন॥
ক্রিমি বিষ্ঠা ভস্ম হঅ এই তিন গতি।
ইথে কি গৌরব তার সুনহ ভারতি॥
দেহ মদ্ধে দেহি জিবরূপে নারাঅন।
পুন্ন ব্রহ্ম অংস তিহ নিত্য সনাতন॥
অগ্নীতে না দগ্ধ হঅ জলেতে না পচে।
বানে ভেদ নাহি হঅ সেচ্ছামত আছে॥
কাটা নাহি যায় অস্ত্রে অখণ্ড অব্যঅ।
এক দেহ ছাড়ি অন্য দেহে গীয়ে রঅ॥ ইত্যাদি

উদ্ধৃত অংশ কবির স্বহস্ত লিখিত পুথি হইতে সঙ্কলিত হইল। ইহা হইতে কবির বর্ণবিন্যাস-রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভাষাতত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রামায়ণ

হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিয়াযোগসার, এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে (হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। তাহার ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহা যতদূর সম্ভব সর্গে সর্গে মূল অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত আকারের সহিত এই অনুবাদের বৃহৎ আকার তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অতি অল্পস্থলে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কিছু কিছু সংযোজন করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিলেও প্রধানতঃ তিনি মূলের সমস্ত অংশ-অনুবাদে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় মূল উপাখ্যানটি মাত্র অবলম্বন করেন নাই। সমস্ত শ্লোকগুলির অনুবাদ অবশ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু অধিক শ্লোক পরিত্যাগও করেন নাই। প্রাচীন লেখকেরা প্রায়ই এপ্রকার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। মূলের অল্পমাত্র রাখিয়া নিজ নিজ কবিত্ব প্রকাশে সকলেই সচেষ্ট হইতেন। সুতরাং মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের এই সংযম প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত (ঐ, ।৴০ পৃঃ)।" বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীন অনুবাদগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই গল্পাংশের অনুবাদ মাত্র লক্ষিত হয়। ১২৮৪ সালে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মূলানুযায়ী রামায়ণের অনুবাদের প্রচেষ্টা কোচবিহারের রাজা কর্তৃক

আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। কবির রচনার নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

বিনতানন্দ সমকতজন
পরমভীষণ বলবিক্রমে।
কত কত জন কপি সুভীষণ
ধনেশ যেমন সুজিত শ্রমে॥
কত যম সম মহাপরাক্রম
অতিজিত শ্রম পবন গতি।
বরুণ সমান কত বলবান
ভয়ানক তান মারুতি অতি॥
বায়ুসম কত বলে মহোদ্ধত
উফারে পর্ব্বত অতি ইঙ্গিতে।
অতিশয় ক্রোধী ঘোরশীলা যুধী
পরম সুবুদ্ধি উদার চিতে॥
হেন মত কত সহস্রেক শত
মহা মহোদ্ধত কপিপ্রবর।
সীতা অন্বেষণে পর্ব্বত কাননে
উদ্যানে ভবনে চলে সত্বর॥
শুন অনুপাম রাজা গুণধাম
মোর নিজ নাম কর শ্রবণ।
ভুবনে বিখ্যাত বায়ু বীর্য্যে জাত
বলেছি সাক্ষাত তব রাজন॥
হনুমান নাম মোর অনুপাম
শুন গুণধাম রাজা বারণ।
সীতা অন্বেষণে স্থান পর্য্যটনে
এ লঙ্কা ভবনে মমা গমন॥ (ঐ, ৪৪ পৃঃ)

রাজকৃষ্ণ রায় ইহারই অনুবাদে লিখিয়াছেন—

"জানকীর অন্বেষণে সুগ্রীব তখন
চৌদিকে প্রেরণ কৈলা বানরনিকরে।
সীতার উদ্দেশ পেতে মহা কপিগণ
পর্য্যটন করিতেছে ধরণী অম্বরে।
তাহাদের মাঝে কেহ বেগেতে গরুড়,
কেহ বা বায়ুর মত দ্রুত গতিশীল;
সকলেই মহাবল বীর্য্যবান শূর,
ভাঙে পর্ব্বতের চূড়া, শুখায় সলিল।
আমিও সীতার তরে শতেক যোজন
সাগর লঙ্ঘন করি' দেখিতে তোমায়
আইলাম এই স্থানে, রাজা দশানন!
এই দুই বই নাই অন্য অভিপ্রায়।
বায়ুর ঔরসপুত্র আমি, হে রাবণ!
হনুমান মম নাম, অঞ্জনা জননী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আমি তোমার ভবনে
জানকীরে দেখিলাম না যেতে রজনী।"

(ঐ, সুন্দরকাণ্ড, ৬৭-৬৮ পৃঃ)

রাজকৃষ্ণ রায় লিখিয়াছেন যে, তিনি পশ্চিম ভারতে প্রচলিত সংস্কৃত রামায়ণ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে প্রচলিত রামায়ণের সহিত ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় হরেন্দ্রনারায়ণ এদেশে প্রচলিত রামায়ণই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য রচনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। তথাপি অনুবাদ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উভয়েই আদর্শ গ্রন্থ অনুসরণ করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। ভাষা ও ছন্দ-গঠনে উভয় কবির গ্রন্থেই বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে।

দ্বিজ মহানন্দের উত্তরকাণ্ড

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৯৬৪ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি বৃহৎ, ১-৩৩৫ পত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কবি কোন রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহা রচনা করিয়াছিলেন—

বেদনায় শ্রেষ্ঠ বাবু আছেন কাতর ॥
নৃপতি বিহনে রানি রাজ্য অধিকারী।

(ঐ, ৩৩৫ পৃঃ)

রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার কালে অবসর মত তিনি ইহা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রায় এক বৎসরের চেষ্টায় ১২৮০ সালে ইহা সম্পূর্ণ করেন—

মিথা কাজে দিন জায় গৃহেতে বশীয়া।
রচীল শ্রীরামগুণ আশ্রয় লাগীয়া ॥
বিরচিল বচ্ছরেকে অবকায মতে।
ইতি বারোশত শালমানে আশী।

(ঐ, ৩৩৫ পৃঃ)

ভণিতা—

দ্বিজ মহানন্দে কয় ঘুচয়ে শমন ভয়
রামনাম করি উচ্চারণ।

(ঐ, পৃঃ ৭)

কবির স্বহস্ত-লিখিত পুথিই পরিষদে রক্ষিত আছে। এখন হইতে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার একাধিক অনুলিপি পাওয়ারও সম্ভাবনা অতি কম। পুথির বিশেষত্ব এই যে, ইহা মুসলমানী প্রথায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পাঠ করিতে হয়। ১২৮০ সাল বা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেও যে এইভাবে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

অযোধ্যায় রামচন্দ্রের অভিষেক হইয়া গিয়াছে। উৎসবাদির পরে তিনি

রাক্ষস ও বানরদিগকে দেশে যাইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তখন বানরেরা ব্যঙ্গ করিয়া রাক্ষসগণকে বলিতেছে—

সুনরে রাক্ষস ভাই দেশে গীয়ে কার্জ্য নাই
এথা থাক জীব জত কাল।
বহু দীন ছাড়া দেষখানা গেলে জাবে বাবুআনা
আছীষ ব্যাঘ্র হবিরে শ্রীগাল॥
নানা দ্রব্য জতন কৈরে আনি দিবে গৃহিনিরে
তায় যুদ্ধ নহে তার মন।
জেমন উগ্রচণ্ডা দেবী শতেক ছাগোল শেবি
তবো বর না পায় কোন জন॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৯ পৃঃ)

রাক্ষসগণের উক্তি—

তোরা বটীস পশুজাতি ঘরকন্না পাবি কতি
বাষ করিস দুর্জ্জয় কাননে।
ফীরিস গাছের ডালে ডালে প্রাণ জায় দৈবে পেলে
মায়া মোহ জানবি কেমনে॥
তোদের জননী জারা নষ্টার শিরমণি তারা
বৈলে পরে পড়বে বজ্রাঘাত।
হনুমান কার বেটা জিজ্ঞাসীয়া দেখনা সেটা
কেহ নইস বাপের ঔরসজাত॥ ইত্যাদি

(ঐ, ১১ পৃঃ)

ইহা হইতে কবির বর্ণবিন্যাস-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রিয়াপদগুলির আধুনিকত্ব লক্ষণীয়। কবি যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত রামায়ণ

কবির পরিচয়ঃ—যে মহাত্মার গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি স্যার আশুতোষের পিতৃদেব। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই ডিসেম্বর শনিবার তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র যে বংশের উজ্জ্বল মণি স্বরূপ, গঙ্গাপ্রসাদ সেই ফুলিয়ার মুখুটি বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায় যে, নৃসিংহ ওঝা সর্ব্বপ্রথম ফুলিয়াতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। নৃসিংহের পৌত্র মুরারি। এই মুরারির এক পুত্র মদনের বংশে অধঃস্তন দশম পুরুষে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার অপর পুত্র বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা। নৃসিংহের ভ্রাতা রাম হইতে অধঃস্তন অষ্টাদশ পুরুষে গঙ্গাপ্রসাদের উদ্ভব হইয়াছে।

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুরে আসিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রভূত সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব এই যে, এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াও তিনি ঐকান্তিক যত্নের সহিত বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিতে আলস্য বোধ করেন নাই। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি এই প্রীতির প্রেরণা তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসাতত্ত্ব বা চিকিৎসা-প্রকরণ নামে ঔষধ-প্রয়োগবিধি সম্বন্ধীয় এক থানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ডিমাই ৮ পেজী ৭৬৮ পৃষ্ঠায়, এবং দ্বিতীয় খণ্ড ৮৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি Roberts Anatomy নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। উক্ত উভয় গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য Bengal Medical Library'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও গঙ্গাপ্রসাদ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে

তিনি মাতৃশিক্ষা নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কিয়দংশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মনোনীত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিদিগের বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত অনেকেই রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে মূলকে অনুসরণ করিয়া রচিত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ সকলেই আদর্শ গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ মূলানুসারী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই গৌরবের অধিকারী প্রকৃত পক্ষে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কারণ তাঁহারই গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম মূলানুবাদের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে।

গঙ্গাপ্রসাদের রামায়ণের প্রারম্ভ এইরূপ :—

বেদ পাঠে সদা রত তপোপরায়ণ।
বেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ হন যেই জন॥
সে নারদ তপোধনে যোড় করি কর।
কহিলা বাল্মীক মুনি কহ ঋষিবর॥
এ জগতে কেবা সর্ব্ব গুণের আধার।
কেবা সত্যবান, কেবা সদা সদাচার॥
কেবা হিতকারা দাতা মহা বলবান।
কেবা ধর্ম্মপরায়ণ একান্ত শ্রীমান॥
কে সুধীর ক্রোধ নিন্দা করে পরাজয়।
কে ক্রোধ করিলে দেবলোকে পায় ভয়॥
পুত্র স্নেহে কোন জন পালে প্রজাগণে
এ জগতে কেবা যোগ্য ত্রিলোক রক্ষণে॥
কেবা তেজে অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য প্রায়।
আপনি কমলা দেবী কাহার সহায়॥

অবশ্য জানহ দেব কেবা হেন নর।
শুনিতে বাসনা বড় কহ মুনিবর॥ ইত্যাদি

রাজকৃষ্ণ রায় এই অংশেরই মূলের অনুবাদে লিখিয়াছেন—

স্বাধ্যায় তপেতে রত মুনি সে নারদ,
বেদজ্ঞগণের মাঝে বাক্য-বিশারদ।
কহিলা বাল্মীকি মুনি সম্বোধি তাহায়—
"হে দেবর্ষে! কহ, যাহা সুধাই তোমায়।
কোন্ জন এবে এই ধরণীমণ্ডলে
গুণবান্ বীর্য্যবান্ জিনিয়া সকলে?
ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত।
কোন্ জন সুচরিত সর্ব্বহিতে রত?
কোন্ জন শক্তিযুত, প্রিয় দরশন,
আত্মবান্, ক্রোধহীন, দ্যুতি সুশোভন?
অসূয়া বিহীন কেবা, দেখিলে কাহায়
রণভূমে রোষযুক্ত, দেবে ভয় পায়?
এ সকল গুণশীল কে আছে এমন?
কৌতুহল বাড়িতেছে করিতে শ্রবণ॥
তুমিই, নারদ, জান হেন নরবরে।
মধুযুত ফুল জ্ঞাত ভৃঙ্গের গোচরে॥"

(মুদ্রিত সং, ১ পৃঃ)

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি রামায়ণের বিখ্যাত শ্লোকটির অনুবাদে গঙ্গাপ্রসাদ লিখিয়াছেন—

রে দুরাত্মা! কামমত্ত মিথুন হইতে।
ক্রৌঞ্চে বধি অপযশ রাখিলি ভূমিতে॥
এই অপকর্ম্ম হেতু নীচত্ব পাইবি।
প্রতিষ্ঠাভাজন তুই কভু না হইবি॥

রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক ইহা এইভাবে অনুবাদিত হইয়াছে—

নিষাদ ! প্রতিষ্ঠা তুই না পাবি কখন।
কাম-বিমোহিত ক্রৌঞ্চে বধিলি যখন॥

এই দুইটি উদ্ধৃত অংশ হইতে উভয় কবির রচনার বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। উভয়েই আদর্শ শ্লোকটির অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায় ঘনীভূত রচনায় সমপরিসরে ইহার ভাব প্রকাশিত করিয়াছেন, আর গঙ্গাপ্রসাদ মর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত মনে করেন নাই। ইহাতে তাঁহার রচনা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গাপ্রসাদের রচনায় সর্ব্বত্রই এই বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামায়ণ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, আর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে এই কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডের অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত করিয়া তিনি ৯৯ম সর্গের কয়েক পঙ্ক্তি মাত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডের শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬৩৩ এবং ৬৯৫০। অতএব গ্রন্থখানি যে সুবৃহৎ হইবে তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মূলানুসারী সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রামায়ণ হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। কবির সুযোগ্য পৌত্রগণ ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

ভবানীনাথের অধ্যাত্ম রামায়ণ [১]

কবি জয়চন্দ্র নামক কোন নরপতির সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। সীতাকে উদ্ধার করিয়া দেশে আসিলে পর অযোধ্যায় কি ভাবে রামচন্দ্রের অভিষেক হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকা লইয়া এই গ্রন্থ

১। D. C. I., পৃঃ ১৯১-৪ ; কঃ বিঃ পুথি, সংখ্যা ৬১৭৫ ; বা-প্রা-পু-বিবরণ, ১ম ২য় সং, পৃঃ ১, ১১১-১২ ; ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত।

রচিত হইয়াছে। কবি গ্রন্থটিকে অধ্যাত্ম রামায়ণ আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন, যথা—পুণ্যবন্ত জেই জন, অধ্যাত্ম জে রামায়ণ, কর্ণভরি শুন আদি অন্ত (D. C. I., p. 193) । কিন্তু যে সকল আখ্যায়িকা এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বিবরণ লইয়া কবি কল্পনাবলে এক কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভ এইরূপে হইয়াছে—যুধিষ্ঠির বনবাসে কাল কাটাইতেছেন, এমন সময়ে ব্যাসদেব তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পঞ্চভাই তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার মুখে ধর্ম্মের ইতিহাস তাঁহারা অনেক শুনিয়াছেন, এখন এক রহস্যপুর্ণ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করেন। রাবণ বধের পরে রামচন্দ্রের কিভাবে অভিষেক হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাসদেবকে অনুরোধ করিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—রামচন্দ্রের সভায় বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—(১) দশরথ তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন না করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার কিরূপে রাজ্যাভিষেক হইবে? (২) তিনি দশানন প্রভৃতি বীরগণকে বধ করিয়াছেন। সেই পাতক হইতেই বা তিনি কিরূপে মুক্ত হইতে পারেন? উত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন যে, সকল দেশের রাজা আনিয়া যদি তাঁহার মাথায় অভিষেক বারি সিঞ্চন করান যায়, তবেই তাঁহার অভিষেক হইতে পারে, অর্থাৎ অভিষেকের পুর্ব্বে তাঁহার দিগ্বিজয় করিতে হইবে। ইহা বলিয়া তিনি বড় বড় বীরগণের বিবরণ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন যে, ইঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট দশরথও পরাজিত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, রামচন্দ্র দিগ্বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতাগণকে তিনদিকে প্রেরণ করিয়া নিজে পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। এই অভিযানের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্মণের দিগ্বিজয়ের আংশিক বিবরণ প্রদত্ত হইল।

লক্ষ্মণ পুর্ব্বদিকে চলিয়াছেন। প্রথমে তিনি বিকর্ণ রাজার রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেনাপতি চিত্রসেনের হস্তে হনুমান বন্দী হইলেন।

ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ সেই পুরী অবরোধ করেন। ইতিমধ্যে হনুমান রাজার পত্নীকে চুলে ধরিয়া লইয়া লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা আসিয়া সন্ধি করিয়া লক্ষ্মণের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তথা হইতে লক্ষ্মণ এক মনোরম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে ইন্দ্রের কন্যা চন্দ্রকলা সখীসহ এক সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মণ মোহিত হইলেন। এদিকে চন্দ্রকলাও লক্ষ্মণের রূপে মোহিত হইয়াছেন দেখিয়া সখীগণ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। (এখানে কাদম্বরীর আখ্যায়িকার ছায়া পড়িয়াছে)। তৎপর লক্ষ্মণ অগস্তের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং তথায় চন্দ্রকলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া তিনি অর্জ্জুন রাজার দেশে গমন করেন। তাঁহার পুত্র কালঞ্জর মহাবীর ছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণ মুর্চ্ছিত হন। তখন চন্দ্রকলা নিজে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন (ইহা সুভদ্রা-হরণ ও সহস্রস্কন্ধ রাবণ-বধ ঘটনার অনুকরণ মাত্র)। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, এবং কালঞ্জরকে বধ করেন। এইভাবে বিবিধ কাল্পনিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ের পরে রামাভিষেকে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে, জয়চন্দ্র নরপতি এইজন্য তাঁহাকে প্রতিদিন দশ টাকা করিয়া প্রদান করিতেন, যথা—

দ্বিজবর ভবানী আপনা সাক্ষাৎ আনি
দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান।

কঃ বিঃ, ২৪৭ সং পুথি, ১০৬ পৃঃ

"জনশ্রুতি এই যে, রাজা জয়চন্দ্র ও কবি ভবানীনাথ উভয়েই বর্ত্তমান ত্রিপুরা বা নোয়াখালী জেলায় বর্ত্তমান ছিলেন। "পণ্ডিত" এই উপাধিধারী বহু লোক ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নাথের ব্রাহ্মণ।" (বা-প্রা-পু-বিবরণ, ১।২, পৃঃ ১১১-২)। ভবানীনাথও নিজেকে পণ্ডিত আখ্যায় প্রচারিত করিয়াছেন, যথা—

পণ্ডিত ভবানীনাথে রচিল পয়ার। D. C. I., পৃঃ ১৯১।

এই গ্রন্থ অধ্যাত্ম-রামায়ণ, রাম ইতিহাস, লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, রামাভিষেক প্রভৃতি নামেও পরিচিত রহিয়াছে (D. C. I., পৃঃ ১৯১-৩; বা-প্রা-পু-বিবরণ, ১।২, পৃঃ ১, ১১১-২ দ্রষ্টব্য)।

এই কবি বোধ হয় পারিজাত হরণ নামে একটি পালাও রচনা করিয়াছিলেন। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণে ২১১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখা যায়, "পাণ্ডুর নন্দন" "মুনিবরের" নিকট এই উপাখ্যান শুনিতেছেন। ভবানিনাথ (বা শঙ্কর) বিরচিত অধ্যাত্ম রামায়ণের যে পরিচয় ইতিপুর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও ব্যাসদেব বক্তা এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা শ্রোতা। অতএব ইহা যে একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত তাহা বুঝা যাইতেছে। কবির ভণিতা এইরূপ :—

বোলয়ে ভবানিনাথে রামচন্দ্র বন্দি মাথে
বোলে ব্যাস মুনির আদেশ।

প্রাচীন পুথির বিবরণে মুদ্রিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্ণের পারিজাত হরণের আখ্যায়িকা নহে। তাহার অনুকরণে কবি রামলক্ষ্মণ দ্বারা পারিজাত হরণের কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ গ্রন্থশেষে রহিয়াছে—

হেনকালে ধান্ন দুর্ব্বা দিলেন জানকি।
উর্ম্মিলা মঙ্গল করে হইয়া কত্তকি ॥
এই মতে শর্ম্মাদ আছিল বহুতর।
পারিজাত হরণ কথা সমাপ্ত এতদুর ॥

গ্রন্থ মধ্যেও লক্ষ্মণ নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুমণি তাহান অনুজ আমি
জানাইতে সকল বিশেষ।

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি রামলক্ষ্মণ দ্বারা পারিজাত হরণ করাইয়াছেন।

ভবানীশঙ্করের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

কবির ভণিতা এইরূপ—

সাগরদিয়ার বন্দ রবিকরি সর্ব্বানন্দ
গোবিন্দ-তনয় বিজয়রাম।
তস্য পঞ্চপুত্র দিজ ভবানি সঙ্করাগ্রজ
রচিল তারার তত্ত্বজ্ঞান॥

(D. C. I., p. 58)

অধ্যাত্ম রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালীবধের পরে রামচন্দ্রের নিকট তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া তারার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছিল। এখানে তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব কবির গ্রন্থে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব লক্ষিত হয়। অন্যত্র ভণিতা—

বন্দ বিজয়রাম-সুত ভবানি সঙ্কর।
রচিলা রামের লীলা ভাবি রঘুবর॥

কঃ বিঃ ৭৪ সং পুথি, ১২ পৃঃ

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি সাগরদিয়ার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নাম ছিল ভবানিশঙ্কর। তাঁহার পিতার নাম বিজয়রাম, এবং পিতামহের নাম গোবিন্দ। বিজয়রামের পাঁচ পুত্রের মধ্যে ভবানিশঙ্কর বোধ হয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উক্ত ৭৪ সং পুথির আর একটি ভণিতায় আছে—

শ্রীযুত তিলকচন্দ্র ক্ষেত্রিবর্ণ ধর্ম্ম।
শ্রীরাম-কিঙ্কর কহে তস্য দেশে জন্ম॥

ঐ, ১৪ পৃঃ

ইহা হইলে বুঝা যায়, কবি তিলকচন্দ্র রাজার রাজ্যে বাস করিতেন। সাগরদীয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে মহাভারত রচয়িতা বিজয় পণ্ডিতও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির রচনার নমুনা স্বরূপ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কিয়দংশ এখানে

উদ্ধৃত হইল। প্রথমবারের যুদ্ধে বালির নিকট পরাজিত হইয়া সুগ্রীব বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছে, তখন তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রামচন্দ্র বলিতেছেন—

আমি কি করিব মিতা মোর দোস নাই।
না পারিলাম চিনিতে তুমরা দুই ভাই॥
দুহাঁর সমান অঙ্গ সমান বরণ।
বাচিল তুমার ঐরি এইসে কারণ॥
চিন্তা না করিহ মিতা হল্য জা হবার।
এবার বানররাজে করিব সংহার॥
রাঘবের বচনে সুগ্রীব রাজা বলে।
কি কার্য্য ভার্য্যায় মোর আপনি মরিলে॥
রায্যে কার্য্য নাহি মোর ধনে কার্য্য নাই।
জানা গেল প্রভু তুমি জেমন গোসাঞি॥ ইত্যাদি

ইহার সহিত কৃত্তিবাসের রচনার মিল নাই। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

আছে হেঁট-মুণ্ডেতে সুগ্রীব অপমানে॥
মাথা তুলি সুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে।
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে॥
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কে করিত রাজ্যভোগ, কি করিত রামে॥
শ্রীরাম বলেন, মিত্র না বল বিস্তর।
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর॥
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান।
মিত্রবধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ॥

অতএব ভবানীশঙ্কর স্বাধীন ভাবেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

গঙ্গাদাস সেনের উত্তরকাণ্ড

কবির বাসস্থান ছিল ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় অবস্থিত "দীনার দ্বীপ" গ্রামে। ইহা বর্ত্তমানে ঝিনারদি নামে পরিচিত। কবির পিতামহের নাম কুলপতি এবং পিতার নাম ষষ্ঠীবর। ইঁহারা জাতিতে স্থবর্ণ-বণিক ছিলেন।[১] গঙ্গাদাস সমগ্র মহাভারতেরও অনুবাদ করিয়াছিয়েন।[২] ইহার বিবরণ অন্যত্র মুদ্রিত হইল। মনসামঙ্গলেও গঙ্গাদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

কবি বাল্মীকির রামায়ণ ও জৈমিনি-ভারত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৪ সং পুথিতে গঙ্গাদাস সেনের উত্তরকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণবধের পরে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইয়া রামচন্দ্র পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

এই মতে রামচন্দ্র নিজ রাজ্যে বৈসে।
নাহি দুর্ভিক্ষ পীড়া শ্রীরামের দেশে॥
নাহিক ভাবনা চিন্তা অকালে মরণ।
সন্তোষ বচনে পালে যত প্রজাগণ॥

ইহা বাল্মীকির রামায়ণের (বঙ্গবাসী সং) লঙ্কাকাণ্ডের ১৩০শ সর্গের ৯২-১০৪ সং শ্লোকগুলির এবং জৈমিনি ভারতের ২৫শ অধ্যায়ের কতকাংশের সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন মাত্র। তৎপর সীতা গর্ভবতী হইলে এক রাত্রিতে রামচন্দ্র স্বপ্নে দেখিলেন—

ভাগীরথী তীরে সীতা অরণ্য ভিতরে।
অনাথিনী হৈয়া সীতা কান্দে উচ্চৈস্বরে॥
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া আইল স্থমন্ত্র সহিত।

১। পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ৪৪২ পৃঃ) এবং বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক্য-তনয় (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২৫০ পৃঃ)।

২। গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
ব্যাস মুণি বাক্য জান অষ্টাদশ পর্ব্ব॥ (কঃ বিঃ ২১৪৮ সং পুথি)।

বশিষ্ঠকে এই স্বপ্নের কথা বলা হইল, তিনি সীতার পঞ্চামৃতের ব্যবস্থা করিলেন। তখন মিথিলা হইতে জনককে আনাইয়া—

শুভক্ষণে জানকীকে দিল পঞ্চামৃত।

ইহা জৈমিনি ভারতের ২৬শ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। একদা রাম জানকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কি বস্তু খাইতে সীতা অভীষ্ট তোমার।

উত্তরে সীতা বলিলেন যে, বনবাসকালে মুনিপত্নীগণ

দুগ্ধের পায়স সবে করাইল ভোজন।

তাহা খাইতে এবং তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। ইহা বাল্মীকির রামায়ণর উত্তরকাণ্ডের ৫২শ সর্গের ৩২-৩৫ শ্লোকের এবং জৈমিনি ভারতের ২৬শ অধ্যায়ের কতকাংশের সারমর্ম্ম হইলেও কবি সামাজিক প্রথা লক্ষ্য করিয়া পায়স ভক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে লোকাপবাদের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। লবকুশ যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিলে যুদ্ধারম্ভ হইল। বাল্মীকির রামায়ণে লবকুশের যুদ্ধের বিবরণ নাই। ইহা জৈমিনি ভারত ও পদ্মপুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণের পরাজয়ের পরে রামচন্দ্র হনুমানকে যুদ্ধযাত্রা করিতে বলিলে হনুমান বলিল—

শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ আদি তোমা ভাই সব।
কুথা নাহি শুনিছি এ দুই পরাভব॥
তথাপিহ কাল দেখ হেন অপকর্ম্ম।
অনুমানে বুঝি কিছু হইছে অধর্ম্ম॥
বিনি দোষে সীতা দেবী ত্যাগিলা বনেতে।
এহি পাপ আছে মাত্র তোমার অঙ্গেতে॥

ইহার পর কুশও রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

সংসারের কর্ত্তা তুমি ভুবন পালক।
তথাপি করিছ তুমি পঞ্চ জে পাতক॥

প্রথমে করিছ বধ তারকা রাক্ষসী।
বলি রাজা বধিলা কপট মনে বসি॥
মহোদধি বলি যাকে করি নমস্কার।
হেন সিন্ধু বান্ধিয়া কটক কৈলা পার॥
পতিব্রতা সীতা দেবী যেন অগ্নি-শিখা।
লঙ্কার ভিতর তাক দিয়াছ পরীক্ষা॥
হেন সতী বিনি দোষে ত্যাগিলা বনেতে।
এ পঞ্চ-পাতক আছে তোমার গায়েতে॥

যুদ্ধ শেষে সীতাকে অযোধ্যায় আনা হইলে রামচন্দ্র বলিলেন—

অগ্নিশুদ্ধা হৈয়া সীতা পুরীমধ্যে যাউক।
পাপিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক॥

ইহার পরে সীতার পাতাল-প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। জৈমিনি ভারত ও পদ্মপুরাণে সীতার পাতাল-প্রবেশের উল্লেখ নাই, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে রহিয়াছে। অতএব এখানে কবি বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

দ্বিজ পঞ্চাননের উত্তরকাণ্ড

এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (D. C. I., ১৮২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ বিবরণ লইয়া ইহার আরম্ভ, এবং এক মালাকারের কন্যাকে এক শত কাহন কড়ির পরিবর্ত্তে এক বণিকের নিকট বন্ধক রাখিবার প্রসঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি। এই আখ্যায়িকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ২৬৭-২৬৯ পৃঃ)। ঘটনাটি এই—লবকুশ অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। এক মালিনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা "শতেক কাহন" মুল্যের ফুল লইয়া সজ্জিত হইলেন। মালিনী দাম চাহিলে তাঁহারা তাহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া এক বাণিয়ার দোকানে প্রবেশ করেন, এবং একটি কুণ্ডল সহ ঐ কন্যাকে তাহার নিকট বন্ধক রাখিয়া

এক শত কাহন কড়ি লইয়া প্রস্থান করেন। এদিকে ঐ মালিনী আসিয়া কন্যাকে দাবী করিলে বণিক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়। তখন রামচন্দ্রের নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে তিনি জাম্বুবানের প্রতি বিচারের ভার অর্পণ করেন। ইহা লবকুশের কাজ বুঝিতে পারিয়া জাম্বুবান দুই শত কাহন কড়ি রাজভাণ্ডার হইতে প্রদান করিবার আদেশ দান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই পালার শেষে এইরূপ ভণিতা রহিয়াছে—

রামের মেলানি ঘরে জায় বাণ্যা মালিনী।
উত্তরকাণ্ড গাইল বাল্মীকি মহামুনি ॥

অথচ বাল্মীকির রামায়ণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু এই আখ্যায়িকা বাল্মীকির নামে চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিয়াও মালিনীর ফুলে সজ্জিত হইয়াছিলেন। তাহারই অনুকরণে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। দ্বিজ পঞ্চাননের সময় সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই, অতএব পঞ্চানন ইহার আদি রচয়িতা কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আবার বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে বসিয়া কৃত্তিবাস যে এইরূপ ধূর্ত্ত লোকের প্রকৃতি লবকুশের উপর অর্পণ করিবেন ইহাও বিশ্বাস করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।

দ্বিজ সীতাসুতের রামায়ণ

এই কবির কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাকাণ্ডের পুথি পাওয়া গিয়াছে (সাহিত্য পরিষদের ২৬৫৭, এবং চিত্তরঞ্জন সংগ্রহের ৩০৩-৪ সংখ্যক পুথিত্রয় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহা হইতেই জানা যায় যে, কবি আদিকাণ্ড হইতে সমগ্র রামায়ণই রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

আদিকাণ্ডে হইল রামের জনম।
অযোধ্যাকাণ্ডে হইল রামের পিতার মরণ ॥

বনকাণ্ডে প্রভু রাম হারালেন সীতা।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানরের সঙ্গে করিলা মৈত্রতা॥
সে কথা কহিব কিছু সুন সর্ব্বজন।

(৩০৪ চি-সং পুথি, ১ পৃঃ)।

রামচন্দ্র সীতা হারাইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। ঋষ্যমুখ পর্ব্বত হইতে তাহা দেখিয়া সুগ্রীব সন্ন্যাসীর বেশে হনূমানকে প্রেরণ করিলেন। হনূমান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

রাজপুত্র বট দুহার হাতে ধনুর্ব্বাণ।
ত্রিভুবনে নাহি রূপ দুহার সমান॥
কর‍্যাছ মাথায় জটা পরেচ বাকল।
তোমা দুহার রূপ দেখ্যা সুগ্রীব বিকল॥ (ঐ, ২ পৃঃ)

রাম স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত এক বটবৃক্ষের ইতিহাস জানিতে চাহিলেন। হনূমান বলিলেন—চন্দ্রমুনি নামে এক দ্বিজ এই পর্ব্বতে বাস করিতেন, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—

তাহার হইল দুই পুত্র রূপবান।
চারি বেদ বিজ্ঞ যেন ব্রহ্ম মুর্ত্তিমান॥
ব্রহ্মময় ভাব তাদের আপনি ঈশ্বর।
অবিরত নিন্দা করে দেব পরাৎপর॥

পিতা পূজা করিয়া ফুল ফেলিয়াছিলেন, তাহা পদদলিত করাতে পিতাপুত্রে শাস্ত্রীয় তর্ক উপস্থিত হইল। পুত্র বলিলেন—

আত্মাতে ঈশ্বর আছে তারে দিলে হয়।
অন্যের করহ পূজা ভণ্ড বিদ্যা নয়॥ ঐ, ২ পৃঃ

এইজন্য মুনি এক পুত্রকে পাষণ্ড ও অপরকে পামর বলিয়া দূর করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার পত্নী পতি-নিন্দা করিলে তিনি তাহাকে বটবৃক্ষ হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। পত্নীর বিনয়ে অবশেষে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন যে, রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তাহার মুক্তি হইবে। হনূমান বলিলেন—

"তুমি যদি রাম হও, তাহা হইলে এই মুনির পত্নীকে মুক্ত কর।" রামের পাদস্পর্শে বৃক্ষ রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন চন্দ্রমুনি আসিয়া রামের স্তব করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ বিদ্বান বটে, কিন্তু ভক্তিহীন। রাম করুণা করিয়া তাহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন—

প্রেমভক্তি দেহ প্রভু কমললোচন।
রাম বলিলেন তাই পাইলেন নাঞি পঞ্চানন॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের নহে মধুর আশ্রয়।
নপুংসক হৈতে তবে সেভাব বুঝয়॥
মধুরের ভক্ত মোর সব হৈতে পারে।
মা হয়্যা স্তন দেই গুরু হয়্যা মারে॥
পিতা হয়্যা করে মোর পোসন পালন।
দাসী হয়্যা করে সদা চরণ-বন্দন॥
নিত্য সেবা করে সমান বেশ ধরে ভাই।
সখা সখী রূপে সেবে কভু ছাড়ে নাঞি॥ ইত্যাদি

ঐ, ৭ পৃঃ

হনূমান এই ভক্তিই প্রার্থনা করিলেন। রামচন্দ্র তাহাই প্রদান করিলেন—

বীর হনূমান হৈল্য মাধুর্য্য আশ্রয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষরূপে এদেশে প্রচারিত হইলে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অতএব কবি প্রায় রঘুনন্দন প্রভৃতিরই সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। ইহার পরে রামসুগ্রীব-মিলন, এবং রামায়ণ-বর্ণিত অন্যান্য ঘটনার পরে সম্পাতির সহিত সাক্ষাতে এই কাণ্ডের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

ভিকন শুক্লদাস লিখিত রামায়ণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫ সংখ্যক পুথিতে ইহার অরণ্যকাণ্ডের সন্ধান পাওয় যায় (D. C. I, ৩৫-৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পুথির প্রারম্ভেই রহিয়াছে— "লিখিতং শ্রীভিকন যুক্ল দাসস্য ওলদে (পিতা) শ্রীক্রেপারাম যুক্ল দাসস্য

ষুয়ক্ষরমিদং।" ইহা হইতে গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু গ্রন্থ মধ্যে একটিও ভণিতা নাই। সে যাহাই হউক, পালাটি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১৪ পত্রে শেষ হইয়াছে। রামচন্দ্র বনে গমন করিতেছেন। এক রাত্রি বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিবাহিত করিয়া তিনি গুহকের রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া একেবারে পঞ্চবটী বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কবি কর্ত্তৃক সংক্ষেপে ভরত মিলন এবং গয়ার পিণ্ডদানও বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চবটীতে সূর্পনখা রামকে ছলনা করিতে আসিয়াছে—

বিদ্যাধরী ভেসে (বেশে) সাজে মধন (মদন) মোহন।
পৃষ্ঠেতে পরিছে কেস বাধিছে লোটন ॥
কপালে তিলক সোবে (শোভে) শিরেতে সিন্দূর।
দেখিয়া মুনির মন-দর্প জায়ে চুর ॥
মস্তকে সুবর্ণ-চুড়া কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে নপুর সোভে কর্ণসুখ শুনি ॥ ইত্যাদি

রামচন্দ্র তাহাকে এক পত্র দিয়া লক্ষণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—

পত্র লেখে রঘুপতি অএ ভাই ধাম্মিক মতি
এই বেটি রাক্ষসের জাতি ॥
না কাটিঅ মস্তক স্ত্রী বধে পাতক
নাক কাটি কর লণ্ডভণ্ড।

ইহার পরে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, রামের আক্ষেপ, জটায়ুর নিকট রাবণের সংবাদ শ্রবণ, এবং সুগ্রাবের সহিত মিলনে পালার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে শুক্লদাস অর্থে ধোপাকেও বুঝাইয়া থাকে।

দ্বিজ হটু শর্ম্মার রামায়ণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১০৬০ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের লঙ্কাকাণ্ডের মাত্র এক পত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেই জানা যায় যে, কবি সমগ্র রামায়ণই রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

পাঁচ কাণ্ড পুথী গাইল নানা রাগভাসে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইতে বন্দিল কীৰ্ত্তিবাসে॥
গাইল সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর কাহিনী।
লঙ্কাকাণ্ডে ধীরে ধীরে হব হানাহানি॥
গাছ সিলে বান্দাগেল সাগর গভীর।
ত্রিভুবনে হেন কৰ্ম্ম করে কোন বীর॥
বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার॥
প্রমাদ ভাবিয়ে রাজা বৈসে চিন্তামনে।
সুক সারণ দুই চরকে ডাক দিয়া আনে॥

কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ডের প্রারম্ভেও শেষের চারি পঙ্‌ক্তি প্রায় এইভাবে পাওয়া যাইতেছে (D. C. I , ৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই জন্যই বোধ হয়, কবি লঙ্কাকাণ্ড গান করিতে আরম্ভ করিয়াই কৃত্তিবাসের বন্দনা করিয়াছেন।

রামরুদ্রের রামায়ণ

ইহার সুন্দরকাণ্ডের পুথির কয়েক পত্র পাওয়া গিয়াছে (D. C. I., ৭৩-৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবির ভণিতা এই—

জানকির অশ্রু ঝরে দুষ্টের কথায়।
উত্তর করেন সিতা রামরুদ্রে গায়॥

ইহা ব্যতীত কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

অশোক বনে সীতার নিকট রাবণ আসিয়া বলিতেছে—

মন্দোদরী আদি নারী দাসী কর‍্যা দিব।
তুয়া প্রেমে (আমি) রাজা বশ হয়্যা রব॥
তবে কবে—রামচন্দ্র পতি বর্ত্তমানে।
স্বামী ছাড়্যা কেমনে ভজিব গিয়া আনে॥
ইহা মনে কর রাম আর বাচ্যা আছে ?
ক্ষুদ্র প্রাণী গহন বনে কোনখানে মর‍্যাছে॥
অথবা মরিল কোথা খাত্যে নাঞি পায়্যা।
সাগরে পসিল কিম্বা শোকাকুল হয়্যা॥
জদি বা জীবিত আছে কোন পরকারে।
আমার হাত হৈতে তোমাকে নিতে নারে॥ ইত্যাদি

ইহার পরে যে ভণিতা রহিয়াছে তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল।

দ্বিজ মাণিকচন্দ্রের লঙ্কাকাণ্ড

ইহার একখানি খণ্ডিত পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (D. C. I, ১৪৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে দেখা যায়, হনুমান অশোক বনে সীতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে সরমা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হনুমান পত্রান্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

হনুমান বলে দেখি মায়ের চরিত।
সধর্ম্মে আছেন কিবা অধর্ম্মে পতিত॥
সাত পাঁচ করি মনে পাতেতে লুকাল।
সরমা সীতাকে সব বুঝাতে লাগিল॥

তারপর ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্নের ন্যায় এক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সরমা সীতাকে প্রবোধ দিতেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, রামের দুত শীঘ্রই আসিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যাইবে, এবং রামচন্দ্র আসিয়া রাবণকে বধ করিয়া

সীতাকে উদ্ধার করিবেন। ইহার পরে অঙ্গদ-রায়বারের সূচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই খণ্ডিত পুথি হইতে মনে হয় কবি সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডই রচনা করিয়াছিলেন। কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

দ্বিজ দয়ারামের তরণীসেনের যুদ্ধপালা

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডের ৫৪৯-৫৫২ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তরণীসেনের বিবরণ বাল্মীকির রামায়ণে নাই, তথাপি কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণের রচনায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে তরণী রামচন্দ্রের স্তব করিতেছে—

নিরঞ্জন নিরাকার তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সার
হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের নাথ।
তথাংশেতে অবতার মৎস্যে বেদ সুপ্রচার
কূর্ম্মরূপ বিশ্বকের ত্রাত॥
বরাহে মৃত্তিকাকারী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য মারি
নরসিংহে কশিপু নাশিলে।
তুমি সে বামন রূপ ছলিয়াছ বলি ভূপ
দাতা ভক্তে পাতালে রাখিলে॥

(ঐ, ৫৫১-২ পৃঃ)।

তুলনীয় কৃত্তিবাসের রচনায়—

তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
সত্ত্ব রজঃ তমো-গুণে তুমি বিশ্বময়॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ রূপধারী।
হিরণ্যকশিপু-রিপু গোলোকবিহারী॥ ইত্যাদি

(বঙ্গবাসী সং, ৩১৯ পৃঃ)।

জয়দেব দাসের পদ্মলোচন বধ

এই পালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (বা-প্রা-পু-বিবরণ, ১ম খণ্ড ১ম ভাগ, ১৯১-২ পৃঃ)। কৃত্তিবাস ভস্মলোচনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, এখানে পদ্মলোচনের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। ভণিতা—

কহে জয়দেব দাস পূরাও মনের আশ
সংসারেতে অবশ্য মরণ।

(ঐ, পৃঃ ১৯২)

গ্রন্থশেষে ফকিরচান্দেরও ভণিতা রহিয়াছে—

কহে শ্রীফকিরচান্দ দাষ শ্রীরামচরণে আস
অন্তকালে রাখিবা চরণে।

(ঐ, ১৯১ পৃঃ)

শিবরামের লক্ষ্মণের শক্তিশেল

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পরে রাবণ যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। বিভীষণের পরামর্শেই লক্ষ্মণ গোপনে আসিয়া ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া রাবণ বিভীষণকে সংহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ ইহা তিন বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তখন ক্রোধান্বিত হইয়া রাবণ তাঁহার প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করেন। তৎপর লক্ষ্মণের পতন, রামের বিলাপ, এবং হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনয়নে তাঁহার প্রাণদান প্রভৃতি আখ্যায়িকা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায়ই এই পালাতে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষত্ব এই যে, নিক্ষিপ্ত শক্তিকে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য রামচন্দ্র বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়াও শেল লক্ষ্মণের বুকে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য রামচন্দ্র তাহাকে নাপিতের নরুণ হইয়া থাকিবার অভিশাপ প্রদান করেন।

অতুল বিক্রম তোমার ব্রহ্মার নির্ম্মিত।
না শুনিলে মোর বাক্য গর্ব্বেতে মোহিত ॥
তার মত অভিশাপ এই দিলাম তোরে।
নাপিতের অস্ত্র হও সংসার ভিতরে ॥
অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ছিল যমের ভগিনী।
আজি হইতে নাপিতের হইলে নরুণি ॥

(কঃ বিঃ ১৯৩ সং পুথি)

এই কবির সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

রামানন্দ যতির রামায়ণ

১৩০৫ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (ঐ, ২০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবি ১৫ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। ইহাদের নাম—গীতার টীকা, শান্তিশতক টীকা, ষট-চক্র টীকা, মোহমুদ্গর টীকা, গায়ত্রীর টীকা, কুণ্ডতত্ত্বপ্রকাশিকা, তন্ত্রসার, জ্ঞানভৈরব তন্ত্র, অদ্বৈত রহস্য, জ্ঞানাবলী, অধ্যাত্মসার, ভাগবতা সয় (?), যোগ সারাবলী, অত্যাচার দীধিতি, এবং ভাষা রামায়ণ! ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কবির রচনার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রামপদে মন নামে কাঁপে যম
চিদানন্দ অবতার।
দেবমুনি ভয় শাসিতে হৃদয়
ধ্রুব হইলা গুণাপার ॥
মায়ারূপধরী রাবণ সংহারি
দিলা মুক্তি পদধাম।
অহল্যার শাপ নিবারিলা তাপ
মোরে দয়া কর রাম ॥

প্রকাশক লিখিয়াছেন—"গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। ১৯৫ পত্রে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার সুকবি ও কৃতবিদ্য ছিলেন।" (ঐ, ২০২ পৃঃ)।

কৃষ্ণদাসের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডের ৫৩-৫৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কবির পরিচয় বা সময় সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে রামায়ণের আখ্যায়িকা সংক্ষেপে এবং সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বক্তা স্বয়ং রামচন্দ্র। এখানে আরও সংক্ষেপে রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল।

পঞ্চম বৎসরে বধ করি তাড়কারে।
হরধনুঃ ভাঙ্গি বিভা করিলাম সীতারে॥

* * *

মাতা বলে এই চাই শুনহ রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া রামে দেহ বন॥

* * *

অঙ্গ হৈতে আভরণ কাড়িয়া লইল।
জটা বাকল পরাইয়া বিদায় করিল॥

* * *

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
তথা হৈতে গেলাম মোরা পঞ্চবটী বন॥

* * *

বনে বনে ভ্রমি দোহে করিয়া রোদন।
পঞ্চ কপি সঙ্গে তথা হইল মিলন॥

* * *

বালিবধের পরে অঙ্গদের উক্তি—

বিনা দোষে তুমি মম বধিলে পিতারে।
তোমারে বধিব আমি তেমতি প্রকারে॥
শুনিয়া তথাস্তু বাক্য কহিলাম তারে।
কৃষ্ণ অবতারে তুমি বধিবে আমারে॥ ইত্যাদি

অধুনা প্রচারিত ছেলেদের রামায়ণের ন্যায় রামায়ণ রচনার প্রয়োজনীয়তাও যে পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল, ইহা তাহারই নিদর্শন। বোধ হয় এখনও বালকগণের পাঠের জন্য তাহাদের হস্তে এই গ্রন্থ প্রদান করা যাইতে পারে।

গোবিন্দরাম দাসের রামায়ণ

এই গ্রন্থের বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, (ঐ, ১৩০৬, ৩২৯-৩৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে দেখা যায় যে, কবি আদি কাণ্ড হইতে উত্তর কাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র রামায়ণই রচনা করিয়াছিলেন। কবির পিতামহ কুঞ্জবিহারী, পিতা শোভারাম দাস, যথা—

কুঞ্জ বিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ।
তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥
গাইল গোবিন্দ দাস তাহার তনুজ।
যে যাবে বৈকুণ্ঠ পুরী শ্রীরামেরে ভজ॥

অন্যত্র— শোভারাম দাসের তনয় দুঃখী দীন।
শ্রীরাম গোবিন্দ দাস ভজনেতে হীন॥

রচনার নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীরাম রাঘব রাম রাজীব লোচন।
নিরবধি জপ মন ভরিয়া বদন॥
সকলের সারাৎসার শ্রীরামের নাম।
এক রাম নামে হয় সহস্রেক নাম॥

সপ্তমে উত্তরাকাণ্ড শুন সর্ব্ব নর।
রাজা হৈল রামচন্দ্র রাজ্যের উপর॥

এবং

গোলোকেতে রামচন্দ্র করেন বিলাস।
স্বর্গ আরোহণ গায় বাল্মীকির দাস॥
এই অবধি উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ।
এই তক রামায়ণ হৈল সমাপন॥

রামকেশবের সহস্রগিরি রাবণ বধ

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে (ঐ, ১।১, পৃঃ ৪৩) প্রকাশিত হইয়াছে। কবির নাম রামকেশব।

দেব রামকেশবে বোলে গতি অতি মতিহীন
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয়।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ইহা অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে রচিত হইয়াছে। এই পুথিতে বক্তা স্বয়ং বিষ্ণু এবং শ্রোতা মহাদেব।

হস্ত জোড়ে বোলে শিবে শুন নারায়ণ।
নাম মধ্যে রাম নাম পরম কারণ॥
লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ড ধরে।
আর কোন রাবণ মারিল গদাধরে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণে নাহি সেই গাথা।
শুনিবার শ্রদ্ধা মোর সেই পুর্ব্ব কথা॥
বিষ্ণু বোলে শুন কহি সব বিবরণ।
সহস্রগিরি নামে রাজা আছিল রাবণ॥

অবশেষে সহস্রগিরি বধ হইলে পর সীতা বলিতেছেন—

সীতা বোলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
বধিছি সহস্রগিরি শুন নারায়ণ॥

শ্রীরাম শুনিয়া তবে সীতার বচন।
বিস্ময় জন্মিল তবে শ্রীরামের মন॥
জগতের মাতা তুমি জানকী সুন্দরী।
প্রণাম করিব তোমার চরণেতে ধরি॥
সীতা বোলে শুন ওহে প্রভু গদাধর।
ব্রহ্মশাপ হেতু তুমি সকল পাসর॥
পতিএ কোথাতে দেখ পত্নী নমস্কার।
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি রাখিল গদাধর॥

অতএব সীতা অভিশাপ প্রদান করিলেন—

সীতা বোলে কহি আমি শুন সর্ব্বজন।
এথেক ভাবিআ দেবী শাপিলা তথন॥
স্মরণ না হুঁক সবের যুদ্ধ-বিবরণ।
জানকীর শাপ কভু না যাএ খণ্ডন॥

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে আর একখানি "সহস্রগিরি বধ" পুথির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ১।১, পৃঃ ২২৮)। ইহাতে কবির নাম পাওয়া যায় নাই, এবং পুথিখানিও খণ্ডিত। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "উক্ত সহস্রগিরি রাবণ-বধ পুথি হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়।" আবার "শতস্কন্ধ বধ" নামক একখানি পুথির উল্লেখ উক্ত প্রাচীন পুথির বিবরণে (ঐ, ১।১, পৃঃ ১৮১) পাওয়া যায়। রচয়িতা কৃত্তিবাস।

শিবচন্দ্র সেনের রামায়ণ

১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (ঐ, ২০৩ পৃঃ)। কবির পূর্ব্বপুরুষ সেনহাটি হইতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঠাদিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। নিজের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

বৈগ্যকুলে জন্ম হিঙ্গু সেনের সন্ততি।
সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত।
যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণবারে তাহার তনয়।
রতন স্বরূপ কুলে হইলা উদয়॥
এহান তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত।
রাম নারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল।
রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল॥
গঙ্গাদেবদত্ত পুত্র তাহার পবিত্র।
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম।
ধন্বন্তরি বংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
এহান তনয়া মহামায়া নাম তান।
সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান।
জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম।
সম্প্রতি বসতি স্থান কাঠাদিয়া গ্রাম॥

(বসাপপ, ১৩০৫, পৃঃ ২০৩)।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, সেনহাটির গঙ্গাপ্রসাদ সেন কাঠাদিয়া নিবাসী প্রাণনাথের কন্যা মহামায়াকে বিবাহ করিয়া উক্ত গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই কাঠাদিয়া আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম, পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের ডাকঘরের নাম ছিল কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া। তৎপর কাঠাদিয়া গ্রামেও একটি নূতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন পূর্ব্ব-

সিমুলিয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে কবির বংশধরগণ কাঠাদিয়া পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সিমুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের ঘরে সারদা-মঙ্গলের পুঁথি আছে শুনিয়াছি, কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়াও তাহা দেখিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই। অতএব প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে।

গ্রন্থের নাম সারদামঙ্গল, অথচ ইহাকে রামায়ণ নামে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভে আছে—

শুন সবে একভাবে সারদামঙ্গল।
যাহার শ্রবণে হয় চিত্ত নিরমল॥
হিমালয় নামে গিরি পর্ব্বত-রাজন্।
মেনকা তাহার জায়' বিদিত ভুবন॥

ইহার পরে বোধ হয় মেনকার কন্যারূপে পার্ব্বতীর জন্মের বিবরণ হইতে তাঁহার বিবাহাদি ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা বর্ণিত হইয়া থাকিবে। এইজন্যই ইহা রামায়ণ নামে প্রচারিত হইয়াছে।

শিবচন্দ্র সেন প্রণীত ভারত সাবিত্রী নামক এক গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ—

নমো নারায়ণ শ্রীমধুসূদন
নন্দের নন্দন কানু।
সুচিরকিরণে সচকিত মনে
মিলন হইল ভানু॥
মীন অবতারে আসিলা সংসারে
বেদ উদ্ধারিলা তাঁয়া।
কূর্ম্মরূপ ধরি ভূমি পৃষ্ঠে করি
রহিলা সৃষ্টি রাখিয়া॥

(ব-সা-প, ১৩০৫ সন, ২০০ পৃঃ)

ইহা ব্যতীত কবি এক সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

রায়বার রচয়িতৃগণ

সংস্কৃত রাজবার্ত্তা শব্দ হইতে রায়বার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজবার্ত্তা অর্থে রাজগণের কীর্ত্তি-কাহিনীর ইতিহাস। এক শ্রেণীর কবিগণ ইহা অবলম্বনে কবিতাদি রচনা করিয়া গান করিতেন, তাঁহাদিগকে রাজভাট বলা হইত। অতীত গৌরব-গাথা কীর্ত্তনই ইহাঁদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল। ক্রমে এই ব্যবসায় বংশগত হইয়া পড়াতে সমাজে ভট্ট উপাধিধারী এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে। রাজগণ তাঁহাদিগকে বৃত্তিদানে পরিপোষণ করিতেন, এবং উৎসবাদি ব্যাপারে পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ কীর্ত্তনের জন্য ইঁহারা আহূত হইতেন। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ইহাঁদিগকে প্রত্যেক বংশের যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। শুধু সংগ্রহ নহে, লোকমনোরঞ্জনের জন্য সরস কবিতায় এই সকল আখ্যায়িকা রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল অত্যন্ত অধিক। অতএব ভাটগণকে কবি, গায়ক ও ঐতিহাসিকের কার্য্য সম্পাদিত করিতে হইত। সকলে অবশ্যই কবি হইতে পারেন না, অতএব অন্যের দ্বারা রচিত কবিতাও ইহাঁরা গান করিতেন। আবার যাঁহাদিগের গান করিবার শক্তি ছিল না, তাঁহারা শুধু আবৃত্তি করিয়াই কার্য্য সমাধা করিতেন। যাহাই হউক, এক সময়ে ভাটগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, কারণ বিবাহাদি ব্যাপারে কুল-কীর্ত্তন অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত (রামায়ণ, ১।৭১।২)। জনকরাজ-সভায় বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সূর্য্যবংশের, এবং স্বয়ং জনক কর্ত্তৃক চন্দ্রবংশের বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি কীর্ত্তনকারী সূত-গণকেও এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। রাজপুতনার চারণগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

রাজবার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া ভাটগণকে রায়বার বলা হইত। প্রাচীন সাহিত্যে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

প্রভাতে করি স্নান দ্বিজে করিল দান
রায়বারে দিল গজ ঘোড়া ॥
(কবিকঙ্কনের চণ্ডীকাব্যে)

আবার ইহাঁরা যাহা পাঠ করিতেন তাহাও রায়বার নামে অভিহিত হইত, যথা—

প্রবেশ করিতে হাট দেখা পাইল রাজভাট
রায়বার পড়ে উর্দ্ধ হাত। (ঐ)

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ভাটগণ এখন রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া কিছু প্রাপ্তির জন্য হাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রাদ্ধবাসরে ইহাঁদিগকে ঘট বাজাইয়া দান গ্রহণ করিতেও দেখা যাইত।

সাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য ভাটগণকে প্রভূত উদ্ভাবনী-শক্তিরও পরিচয় প্রদান করিতে হইত। একটি বিষয় কিভাবে বর্ণনা করিলে সহজে মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে ইহা অনুধাবন করা তাঁহাদের কৃতকার্য্যতার পক্ষে যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য ভাটগণ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাঁহাদের গাথা রচনা করিতেন। ইহা ব্যতীত ছন্দে এবং মাধুর্য্যেও এই সকল কবিতাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে হইত। অতএব শ্রুতি ও মনের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য ভাট-গাথা এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। ক্রমে ইহার প্রতি এক শ্রেণীর কবিগণের দৃষ্টি পতিত হয়। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ভাষা রামায়ণ রচয়িতাগণই ইহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধহয়। কারণ অঙ্গদের রায়বার, বিভীষণের রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার প্রভৃতি পালা রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রায়বারের অর্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের স্তুতিপাঠ নহে, বরং নিন্দা বা উপদেশ ছলে দুই ব্যক্তির উক্তি প্রত্যুক্তি। রাজা রাবণ ইহার কেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার সহিত অঙ্গদ প্রভৃতির কথোপকথনই রায়বার কবিতার বিষয়ীভূত। যাবতীয় রায়বারের মধ্যে অঙ্গদের রায়বারই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ

রামায়ণে ইহাই আদি রায়বার, পরে ইহার অনুকরণে বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণাদির রায়বার রচিত হইয়া থাকিবে।

রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ৪১শ অধ্যায়ে অঙ্গদের দৌত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রামচন্দ্র অঙ্গদকে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া রাবণকে যুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামের উক্তির সারমর্ম্ম এই—"হয় তুমি আমার শরণাপন্ন হও নতুবা যুদ্ধ কর। আমি তোমাকে সবংশে নিহত করিয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিব।" অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া নিজের বক্তব্য শেষ করিলে রাবণের আদেশে চারিজন রাক্ষস আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন সে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিয়া উক্ত রাক্ষস চতুষ্টয়কে ভূতলে পাতিত করে, এবং পদাঘাতে প্রাসাদশিখর চূর্ণ করিয়া রামের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতে অঙ্গদ কর্ত্তৃক লেজ দ্বারা আসন প্রস্তুত করণ, ইন্দ্রজিতের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ, রাবণের সহিত বাক্‌যুদ্ধ, এবং তাহার মুকুট লইয়া রামের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। রামায়ণ-বর্ণিত এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই অঙ্গদের রায়বার রচিত হইয়াছে। এখানে রায়বার অর্থে রামের বার্ত্তা রাবণকে জ্ঞাপন করা বুঝায়। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের রায়বারে রাবণের সহিত উভয়ের কথাবার্ত্তা বিবৃত হইয়াছে।

রায়বারের অনেকগুলি প্রাচীন পালা ভাঙ্গা হিন্দীতে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। লোকমনোরঞ্জনের জন্য যে এই কৃত্রিম ভাষা ভাব-প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। (D. C. I, ভূমিকা, XX পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নৃত্যছন্দে রচিত এই জাতীয় রচনা সমরবাদ্যের তালে তালে গীত হইতে পারে বলিয়া স্বভাবতই উপভোগ্য হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরের রাজগণ হিন্দীভাষাভাষী লোকগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়া যদি হিন্দী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রায়বার ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্যিক রচনাতেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। অথচ দেখা যাইতেছে যে,

ফকিররাম কবিভূষণ বাঙ্গালা ভাষায় সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও সখীসোনার উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রায়বার রচনায় তিনি বিকৃত হিন্দী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। রাম নারায়ণ লঙ্কাকাণ্ড, হরগৌরীর কবিতা ও বৃন্দাবন ধ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচনা করেন, কিন্তু অঙ্গদ ও বিভীষণের রায়বার রচনায় কৃত্রিম হিন্দী ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লোকের প্রীত্যর্থে রায়বারের ছন্দ ও ভাষা মনোনীত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ভাটগণের রচনারীতির স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারের দুইটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ রায়বার রচনায় বিকৃত হিন্দীর ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ পদাবলী রচনায় ব্রজবুলির প্রচলন। উভয়ই একই উদ্দেশ্যে মনোনীত হইয়াছিল।

ফকিররামের অঙ্গদ-রায়বার

কবিরাজ ফকিররাম দাস রচিত "অঙ্গদ রায়বারের" পুথির (কঃ বিঃ, ২৮৩ সংখ্যক) তারিখ ১০০৮ সাল বা ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ। কবি হিন্দী ভাষাতেই এই পালাটি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সহিত কবিচন্দ্র বা কৃত্তিবাসের পালার এত সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে একটি অপরটির অনুবাদ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তুলনার জন্য উভয় পালা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। ফকিররামের পালায় আছে—

অঙ্গদকো অঙ্গ দেখি
সব রাখস পাতিল মায়া।
শত শত রাওন হোকে বঅঠে
ধরকে অদভুত কাআ॥
অঙ্গদ বীর জো অঙ্গ তাকাএ
সবকোই রাওন ঝুণ্ড।
সবকোই বিস হা(ত) বিসারদ
বিস(হ)স্ত নঅন দস মুণ্ড॥

সবকোই বিস বাহু দশানন
ভেদ নাহি এক অঙ্গ।
অঙ্গদ কহে বাত কহঙ্গি
কোন দশানন সঙ্গ॥
কেতেন হেঅ (?) মেঘনাদ একেলে
আপন ভেক পকড়কে।
উএ কোন সরমে দাউকে মুরত হোগা
হোকে লড়কে॥
অঙ্গদ কহত বিরাদর জোকোই
সবকোই রাঙন হুআ।
এ বেটা কেঙ ভেকনিহারই (?)
এ তব কোন ভড়ুয়া॥
এতে বাত ইআদ অঙ্গদ মোনমে
তজ্জুত (?) লাগে।
ইনকো বাত সুনা হো সেই রোজ
বিভিসনকো আগে
রোজ রোজ জপ জজ্ঞ করে
উএ রাঙনগণকে লড়কা।
আট ঘড়ি ললাটমে রহে
জজ্ঞ ভসমকি ঠড়কা॥
ইএ বেটা মেঘনাদ হুএগা
ইন্দ্রজিত কলাএ।
ইনকো সাথ মুলাকাত কিজো
দাস ফকির বাতাএ॥
কহ জুবরাজ মেঘনাদ তেরে নামরে।
কহিবে মেরে সাচ জুবরাজ হো তিঁহো মেরে॥

এতে দশ রাঙন বিশ নয়ন বিস বাহু রে।
জেতেক দশ মুণ্ড সব ঝুণ্ড তেরে দাউ রে॥
নহি সে এতেক জোর লঘুগুরু না মানিস্ রে।
এতেক দাউতেজ বিষ্ণু ইন্দ্র পকড়িস্ রে॥
ধন্য তেরে মাইকো সভা সঙ্গে এহাম (?) রে।
এতেক পতি লেকে রতিসুখ ভুঞ্জে অভিরত রে॥
তেরে ইএ দাউ সব দিগ ২ তোলে রে।
তেরে কোন্ দাউ গিআথা পাতালে রে॥
কহত কবিরাজ ফকিররাম দাস রে॥

কহত মেঘনাদ কমজাত রাঙনগণ কি বেটে।
কোন দাউ তেরে কাহা গিআথা দিগবিজই রণ ভেটে॥
কোন দাউ তেরে নহুড়িকা (?) ঝুটা খাআথা হে পাতালে।
কোন দাউ তেরে বান্ধাথা অর্জ্জুনকো ঘোটকসালে॥
কোন দাউ তেরে দচ্ছিন জাকো জুঝা জমকি সাথে।
কোন দাউ তেরে মান্ধাতার বাণমে ঘাস কিআথা দাঁতে॥
কোন দাউ তেরে ধনুক তোড়নকে জনকনগর পস্ঠা।
কোন দাউ তেরে কঅলাস পখড়াক * * *॥
কোন দাউ তেরে বধু সাথে ধরকে আসক কিআ।
কোন দাউকা বহিনি তেরা দৈত্য মধু হরলিআ॥
এতে বাত সুন রে কম জাত হেঅ (?) তেরা মন মে।
কোন দাউ তেরে জব্দ হুআ থা জামদগ্নিকা জুমে॥
একে ২ কহা তেরে সব দাউকি বাত।
উএ সব মেরে কাম নাহি তেরে কাহা জুগিআ তাত॥
সুর্পনখা রাণ্ডি জো আপ্‌করাআ দিচ্ছা।
দণ্ডক কাননমে জাকে করকে আয়া ভিচ্ছা॥

কানসো পিন্ধে শঙ্খ খুসলী বাস লহুতর সিন্ধা (?)।
ডিগ ডিগ ডমুরু বাজাএ ভো ভো বাজাআ সিঙ্গা॥
মাথাকি উপর লম্ব জটা লিএ মহতমে খাক্ লাগাএ।
কান্ধেকা উপর ঝোলি কান্থা ঘর২ টহল জোগাএ॥
অউর জেতে দাউ তেরে সব কোই রহনে দে।
পঞ্চবটিকা দাউ জে তেরে তবে দেখলাআদে॥
দাঁত বিচলকে (?) জঙ্গল ২ ভিচ্ছা করকে আএ।
অহিনেকে দরগার হামারি দাস ফকির বাতাএ॥

ইহার সহিত কৃত্তিবাসী বা কবিচন্দ্রের রামায়ণের নিম্নোদ্ধৃত অংশ তুলনা করিলেই উভয়ের রচনা সাদৃশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে।

ইহাতে আছে—

বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করে আছে॥
অঙ্গদকে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে॥
যে দিকে অঙ্গদ চাহে সে দিকে রাবণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন॥
সবাই রাবণ, ভেদ নাহি একজনে।
অঙ্গদ বলে কথা কব কোন্ রাবণের সনে॥
সবে মাত্র ইন্দ্রজিৎ ছিল আপন সাজে।
পুত্র হয়ে পিতার মুর্ত্তি ধরিবে কোন্ লাজে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা।
কপালে দেখিল তার যজ্ঞ-শেষ ফোটা॥
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম এই বেটা মেঘনাদ।
আকার-ইঙ্গিতে তারে কহেন সংবাদ॥

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে সবাই কি তোর পিতা ॥
তারি জন্য এত তেজ গুরু লঘু না মানিস্।
তোর বাপের এত তেজ ইন্দ্র বেঁধে আনিস্ ॥
ধন্য নারী মন্দোদরী, ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি-ভাব কেমনে রাখে ॥
কোন্ বাপ তোর দিগ্বিজয় কৈল তিন লোকে।
কোন্ বাপ তোর কোথা গেল পরিচয় দে মোকে॥
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে ॥
কোন্ বাপ তোর যম জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ।
কোন্ বাপ তোর মান্ধাতার বাণে দাঁতে কৈল তৃণ ॥
কোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গিতে গিয়াছিল মিথিলা।
কোন্ বাপ তোর কৈলাসগিরি তুলিতে গিয়াছিলা ॥
কোন্ বাপ তোর বধুর সনে হইল আসক্ত।
তোর কোন্ বাপের ভগ্নী হ'রে নিল মধু দৈত্য ॥
কোন্ বাপ তোর জব্দ হৈল জামদগ্ন্য-তেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপেরে বেন্ধেছিল লেজে ॥
একে একে কহিলাম, তোর সকল বাপের কথা।
এ সবারে কাজ নাই, তোর যোগী বাপটি কোথা ॥
সূর্পণখা রাঁড়ী যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক কাননে যে মাগিয়া খায় ভিক্ষা ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে, রক্ত বস্ত্র পরে।
ডম্বুর বাজায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে ॥ ইত্যাদি

এখন প্রশ্ন এই যে, কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন? সাধারণতঃ বলা হয় যে, কবিচন্দ্রের পালাই কৃত্তিবাসের ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে। অতএব

কবিচন্দ্র ও ফকিররামের সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ফকির-রামের পুথির তারিখ ১০০৮ সাল। কেহ কেহ ইহাকে মল্লাব্দ ধরিয়া গণনা করিবার পক্ষপাতী, কারণ পুথিখানি মল্লভূমে বাঁকুড়ায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির তালিকায় লিখিত রহিয়াছে। এই উক্তি সর্ব্বত্র নির্ভর-যোগ্য নহে, কারণ যিনি পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি যে ইহা মল্লভূমেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। তারপর অনেক পুথিতেই মল্লাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যাঁহারা মল্লাব্দের তারিখ দিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্ট ভাবেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, সেখানে মল্লাব্দের কল্পনা করা সঙ্গত নয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই পুথির লিপিকাল ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ রচনার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল। অতএব ফকিররামের রচনাই পরবর্ত্তীকালে অনুকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ ফকিররাম সম্পূর্ণ পালাটিই ভাট-ছন্দে রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাস বা কবিচন্দ্র কেবল ইন্দ্রজিতের প্রতি অঙ্গদের উক্তির অংশটুকু রচনাতেই ঐ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব ফকিররামের রচনায় পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কবিচন্দ্রের পরে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন বাঙ্গালী কবি হিন্দী ভাষায় রামায়ণের ঘটনা বিবৃত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারেন এইরূপ ধারণা করাও কষ্টকর।

অঙ্গদের রায়বার ব্যতীত কবির রচিত রাম-নাটক নামক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে রামলীলা সম্বন্ধীয় হিন্দী ভাষায় রচিত কয়েকটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি পদে বিদ্যাপতির ভণিতাও রহিয়াছে (D. C. I, ১৯৪ পৃঃ)। এই পদগুলি অন্যত্র মুদ্রিত হইল। কবি বাঙ্গালা ভাষায় সত্য-নারায়ণের পাঁচালী (কঃ বিঃ ২১৯৩ সং পুথি), এবং সখী-সোনার উপাখ্যানও (ঐ, ১৪২৩ সং পুথি) রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এই—ইন্দ্রের সভায় কোন এক নর্ত্তকী সামান্য অপরাধে ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যে এক রাজার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে এক যুবকের প্রেমে

পতিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অন্যত্র এই বিবরণ বিস্তৃত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

খোসাল শর্ম্মার অঙ্গদের রায়বার

যাঁহারা অঙ্গদের রায়বার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে খোসাল শর্ম্মার কবিতাটি বিশিষ্টতাসম্পন্ন। একপ্রকার নৃত্যছন্দে বিকৃত হিন্দীতে (মতান্তরে অনুকৃত ভাট ভাষায়) ইহা রচিত হইয়াছে। পালাটি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র পুথির চারি পত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছে। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৮ সং পুথি, এবং D. C. I, ২১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পুথির লিপিকাল ১০৮৮ সাল বা ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। নিম্নে তাঁহার রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল—

সমুদ্র পার হোকে রাম থাপ্পা হোকে বয়ঠা।
আঁখোপর ধুঞ্জি নিকলে মাঙ্গায় রাবণ চোট্টা॥
জল্দি জাম্বুবান পঙছে মজু রাজাকে গুজরা।
দণ্ডকপর মোহর হোয়ে চোপদার ভেজ দোসরা॥
প্রভুজ্ঞিকে বেমজি দেখ্কে সুগ্রীব হোয়ে শঙ্কা।
বন্নন পানে কিস্কে কুদরত গড় তোরে জা লঙ্কা॥
ওজক ওজস্বয় শিরপর সুন্দর বীরবালিকা বেটা।
দোনো কান্মে মোতি খোলে তাহে গাল পাট্টা॥
বাবা অঙ্গদ সুন্ত সাধো সুন্তো মেরি বাত।
রাওনা পর দস্তক হোয়ে তোরে হাওলাত॥
বহুত খুব করকে অঙ্গদ শিরপর দিয়া হাত।
গর্দ্দান পকড়কে শির ল্যাঙ্গে হুকুম হোয় রঘুনাথ॥

* * * * *

লঙ্কা মোক্কা দেকে অঙ্গদ পালট ফিরকে আয়ে।
মগন হোকে নাচে অঙ্গদ রামকা দরশন পায়ে॥

বীরাসন মে	বৈঠে প্রভুজি	সাম্নে গাণ্ডিবাণ।
দক্ষিণ তরফমে	ভাই লছমন	বামে জাম্বুবান॥
সুগ্রীব বিভীষণ	দোনো সাম্নে	আউর পবনকা সুত।
হনুমানকা	নাম শুনকে	ভাগে যমদূত॥
সমুদ্রকা	তীরে অঙ্গদ	হাত পাও পাথালি।
রামকো	প্রদক্ষিণ করকে	নিয়ে চরণ-ধূলি॥
লঙ্কেশ্বরকা	শিরকা মকুট	রামকো সাম্নে রাখা।
লঙ্কেকা	জো কুছ হকিকত	রামকো দিয়া লেখা॥
রঘুবীর	গভীর দেখো	শুনকে হুয়ে হাস।
ভকতকে গত	মুকত রাম	পুরায় মনকা আশ॥
ভণয়ে	খোসাল শর্ম্মা	আপকে অনুদার।
অধমকে প্রভু	কদম হুকুম হোয়ে	দরিয়া উতারে পার॥

পুথিতে ইহাকে "খোট্টা অঙ্গদের রায়বার" বলা হইয়াছে। কবির নাম দেখিয়া তাঁহাকে বিহার অঞ্চলের লোক বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ছন্দে তিনি ভাট-কবিতার রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। অতীত গৌরব গাথায় বীরত্বের কাহিনীও ভাটগণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল। ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা থাকাই স্বাভাবিক। রণবাদ্যের সমতালে যাহাতে গীত হইতে পারে এই ভাবেই সমরগীতিকা রচিত হইয়া থাকে। খোসাল তাহারই অনুকরণে এই রায়বার রচনা করিয়াছেন।

রামনারায়ণের রায়বার প্রভৃতি গ্রন্থ

কবির রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—

অঙ্গদের রায়বার (কঃ বিঃ ২২৫১ সং পুথি, অনুলিপির তারিখ ১০৯৩ সন)।

রামরাবণের যুদ্ধ (ঐ, ২৬৬ সং পুথি, তারিখ ১০৮১ সন)।

রামায়ণ (ঐ, ২৮৫ সং পুথি)।

হরগৌরীর কবিতা (ঐ, ১৫৮৯ সং পুথি, তারিখ ১০৭৯ সন)।

বৃন্দাবন-ধ্যান (১৯৯৫ সং পুথি, তারিখ ১০৯৯ সন)।

বিভীষণের রায়বার (২২৬০ সং পুথি, তারিখ ১০৯১ সন)।

তন্মধ্যে ২৮৫ সংখ্যক পুথিতেও অঙ্গদের রায়বার লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পুথির মাত্র ১৩টি বিচ্ছিন্ন পত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইতেই দেখা যায় যে, কবি সূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ততঃ লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। তরল পয়ারে রচিত সূর্পনখার আখ্যায়িকার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

মৃগচাম পরি রাম কুড়্যার দুয়ারে।
কুতূহলে পাশা খেলে লইঞা সীতারে॥
হেন বেলে বনে বুলে সূর্পনখা নারী।
দেখি রামে কামবাণে বিদ্ধ নিশাচরী॥
নানা বেশ করি শেষ সাজিলা রূপসী।
যেন সর্গ হৈতে অবনীতে আইলা উর্ব্বসী॥
সুধারাশি জিনি হাসি আসি দিল দেখা।
রঘুবীরে দৃষ্টি করে চক্ষু করি বাঁকা॥

(D. C. I, ২২৫ পৃঃ)।

কিন্তু কবি অঙ্গদ-রায়বারের অংশ হিন্দী ভাষায় রচনা করিয়াছেন, যথা—

(অঙ্গদের উক্তি) অরে রামকি নাম অকাম-উদ্ধারণ
শুনরে লঙ্কা অধিকারী।
তেরে বুদ্ধি না শুদ্ধি বিরুদ্ধি না মানত
জানকী আনকি নারী॥

(রাবণের উক্তি) অরে দূত, কুপুত ভএ তুহ বালিকো
গালি কিও নাহি জান।
জো নর তাত নিপাত কিএ
তেরে সো নরকো পুন নাথকি চান॥

ইহ লঙ্কক গড়-নিঅড় না আওত
দানব-দৈত্য সুরাসুর মেলা।
তেরে বাপ বড়ে তুহু আপ্ বড়ে
মুঝে তাপ চড়ে, তুহু মানব-চেলা॥
উহ লঙ্ক কলঙ্ক কিএ তিন ভুবন
কিঙ্করকো দিএ শঙ্কর যোগী।
সুরহি চন্দ্র সুরেন্দ্র পরাজিত
অব জিতহি বানর বিরত ভোগী॥
(২৮৫ সং পুথি)।

কবি হরপার্ব্বতীর কবিতায় উভয়ের হাস্য-পরিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বতী শিবকে বলিলেন—

কোন্ দেবতা কেবা কোথা
ভস্ম মাখে গায়।
এমন কোন্ দেবা কেবা কোথা
ভিক্ষা মাগ্যা খায়॥ ইত্যাদি

ইহারই উত্তরে শিব বলিতেছেন—

এমন কোন্ দেবতার পতি পড়ে
পত্নী পদতলে।
এমন কোন্ দেবতার প্রিয়া, পদ
দেয় বা পতির গলে॥
শুন ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা করি
আইস নিজ ঘর।
বল্যা হাস্যা হাস্যা হর, গৌরীর
ধরিল অম্বর॥

এইরূপে শিবা শিবে
পরিহাস কথন।
ইহা যেই শুনে তার
খণ্ডে অমঙ্গল॥
রায় শঙ্করের পদ দ্বন্দ্ব
ভাবি মনে মনে।
হর গৌরীর পরিহাস
রামনারায়ণ ভণে॥

(কঃ বিঃ ১৫৮৯ সং পুথি)

রাবণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাই বিভীষণের রায়বারের বর্ণনীয় বিষয়। কবি হিন্দী ভাষায় ইহা রচনা করিয়াছেন, যথা—

বিভিছন্ন রাঙনে কহে হাথ জোরি।
শুন নাথ মেরে বাত লঙ্কাধিকারী॥
রঘুবীর জলধির তীর লেকে বয়ঠে ।
— — লঙ্কেমে পয়ঠে॥
* * *
করতার অবতার অহি চক্রধারী।
মীন দেহ ধরি বেদ উহি লে উধারি॥
অহি তো বরাহ, অহি কূর্ম্মরূপা।
অহি তো পছাড়া হিরণ্যকস্বুপা॥
অহি তোঁ বলিকে ছলি বদ্ধ কিলো।
অহি তো পরুসরাম অবতার নিলো॥ ইত্যাদি

বিভীষণের এই সকল উক্তি শুনিয়া রাবণ তাঁহাকে পদাঘাত করে, এবং তিনি রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন।

কবি মহাভারত-বর্ণিত নলোপাখ্যান অবলম্বনেও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ভণিতায় আছে—

সত্যবতী-সুত ব্যাস করিল প্রকাশ
শ্লোক বন্দে ভারত রচিল।
সেহি সব কথা লেশে রামনারায়ণ ঘোষে
পদ বন্ধে সঙ্গীত করিল॥

(ব-সা-প-পত্রিকা, ১৩১৩ সাল, ১৮১ পৃঃ)

এই ভণিতা হইতে কবিকে ঘোষ-বংশীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। কিন্তু রামায়ণের কবির সহিত ইনি অভিন্ন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কবির রচিত হরগৌরীর কবিতার পুথির তারিখ ১০৭৯ সাল অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে মল্লাব্দের উল্লেখ নাই। অতএব কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে।

"বৃন্দাবন ধ্যান" রচনাতেও কবি অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ইহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সমলঙ্কৃত হইতে পারে। রচনার নমুনা এইরূপ—

অঞ্জন-গঞ্জন ঘন জমুনার পানি।
যেন বিধি নিরমিল কাল রসের দাপনি॥
তায় তরল তরঙ্গ কত মন্দ মন্দ বায়।
যেন যুবতী যুবক-কালে যৌবন দেখায়॥
তায় রাতুল অসিত সিত কমল বিকসে।
যেন যুবতীবৃন্দের আঁখি নিদ্রের আলিসে॥
সেই কালিন্দী-কল্লোলে কত কমল লোটায়।
যেন নাগর ঢলিয়া পড়ে নাগরীর গায়॥
তায় সুচঞ্চুক চক্রবাকী প্রিয়া-সঙ্গ ছাড়া।
যেন স্বয়ংদূতী যাতায়াত মানিনীর পাড়া॥

তায় উঠে ডুবে কারণ্ডব আহার উপেখি।
যেন বন্ধু অনুরোধে ব্যস্ত পরপ্রিয়া সখী॥
তায় অন্তরে সঞ্চরে ছোট বড় মৎস্যগণ।
যেন নীল বস্ত্রে আচ্ছাদিল প্রিয়া আভরণ॥ ইত্যাদি

প্রতি চরণে এইরূপ উপমা প্রয়োগ করিয়া কবি তাঁহার রচনা বস্তুতই উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিজ তুলসীর অঙ্গদের রায়বার

কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের আদর্শে তিনি এই পালাটি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ পালার প্রথমেই আছে—

পার্ব্বতী বলেন প্রভু কহ শূলপাণি।
তারপর কি করিলা রাম রঘুমণি॥
লঙ্কার দুয়ারে যদি গেলা কপিগণ।
কহ কি করিলা তার রাজা দশানন॥
হর কহে পার্ব্বতী শুনহ সাবধানে।
লঙ্কাপুরে উপনীত হইল কপিগণে॥

হরপার্ব্বতীর কথার ছলে অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গদের রায়বার বর্ণিত হয় নাই। ইহা কবির আরোপ মাত্র। পালাটিতে কিভাবে ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে তাহা প্রত্যাবর্ত্তনের পরে অঙ্গদ কর্ত্তৃক রামের নিকটে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে জানা যায়। অঙ্গদ বলিতেছে—

যথোচিত বাক্যবাণে দগ্ধ কর্যা তারে।
যুদ্ধ কর্যা অনেক বধিলাঙ নিশাচরে॥
সিংহাসন হত্যে ভূমে পেল্যা দশাননে।
বুকে বস্যা মুষ্টি-ঘাত করিনু বদনে॥

তিলেক সম্ভ্রম নাই ভুমার প্রসাদে।
দশটা মুকুট লয়্যা আল্যাঙ প্রমাদে॥

(D. C. I., ১৫১ পৃঃ)

ইহা কৃত্তিবাস বা কবিচন্দ্রের রায়বারেরই অনুরূপ। কবির ভণিতা এই—

দ্বিজ শ্রীতুলসী কহে রামপদ সার।
এতদূরে সমাপ্ত হইল রায়বার॥

কবিচন্দ্রের কুম্ভকর্ণের রায়বার

নিদ্রাভঙ্গের পরে রাবণের নিকটে আসিয়া কুম্ভকর্ণ রামলক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, এইভাবে এই পালাটি রচিত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের অঙ্গদের রায়বার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু কুম্ভকর্ণের রায়বারের পুথি বেশী পাওয়া যায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০ সংখ্যক পুথি হইতে ইহার নমুনাস্বরূপ কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

কুম্ভকর্ণ বলে তারা থাকে কোন ঠাক্রি।
রাবণ বলে ঘরদ্বার তার বাপের কালে নাক্রি॥
কখন পরবতে থাকে কখন বা বনে।
কখন বা বৃক্ষের তলে থাকে চর্ম্মাসনে॥
কখন বিশ্রাম করে তটিনীর তীরে।
কখন বঞ্চয়ে নিশি পত্রের কুটিরে॥
কুম্ভকর্ণ বলে তারা ব্রহ্মচর্য্য করে।
রাবণ বলে—সে নয় তারা রক্তবস্ত্র পরে॥
কুম্ভকর্ণ বলে—তবে কোন রাজার বেটা।
রাবণ বলে—সে নয় তার মাথায় আছে জটা॥
কুম্ভকর্ণ বলে—তবে হবে ব্যাধ-পুত্র।
রাবণ বলে—সে নয়, তার কান্ধে যজ্ঞসূত্র॥

কুম্ভকর্ণ বলে—তবে হবে দণ্ডধারী।
রাবণ বলে—তবে তার সঙ্গে কেন নারী॥

* * *

কুম্ভকর্ণ বলে—কহ কেমন মূর্ত্তি রাম।
রাবণ বলে—দেখি যেন দুর্ব্বাদল শ্যাম॥
তার ভাই লক্ষ্মণ তার চম্পকের সীমা।
রমণী ঐ দেখি যেন কাঞ্চন প্রতিমা॥
অপ্সরী মেনকা রম্ভা বিদ্যাধরী যত।
দময়ন্তী রতি সতী কেহ নয় তার মত॥
দশ হাজার দেবকন্যা আন্যাছি আমি আর।
দাসীর সমান কেহ না হইবে তার॥
গিয়াছি অনেক দেশ দেখ্যাছি অনেক ঠাঞি।
এমন রূপসী কন্যা কোথাও দেখি নাঞি॥
করে পদ্ম, পায়ে পদ্ম, পদ্মগন্ধ গায়।
চলিতে চরণ সঙ্গে মধুকর ধায়॥ ইত্যাদি

এইভাবে উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া এই পালা রচিত হইয়াছে। ইহাতে কবিচন্দ্রের সরস রচনার নিদর্শনও পাওয়া যায়। এই পালার অংশ বিশেষ অন্যত্রও মুদ্রিত হইয়াছে (D C. I., ১৩৬ পৃঃ)।

মতিরামের কুম্ভকর্ণের পালা

কবির নাম ছিল মতিরাম কর, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত তিনি দাস আখ্যাও গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

মতিরাম কর দাস কহে
কুছ খানে হোগা তোহ্মারে।

(কঃ বিঃ ২৭৩৬ সং পুথি, ৫ পৃঃ)

কবি বোধ হয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কবি ফকিররাম প্রভৃতির সমসাময়িক। নিদ্রাভঙ্গের পরে কুম্ভকর্ণ বলিতেছে—

কুম্ভকর্ণ বোলে কহো মোরে আভি।
কোনো বীর আয়া বধেঙ্গে সীতারি॥
জদি ইন্দ্র আওএ আভি জাউ সর্গে।
ফণী জদি আওএ বধে নাগবর্গে॥
বলিরাজ জুঝে বলিকো মারেঙ্গে।
অধো সপ্তলোক সমুদ্রে ডারেঙ্গে॥
ভৃগুরাম আওএ করে চূর ছাতি।
তপস্বীকো লেকে গলে দেঙ্গে কাতি॥
জদি চন্দ্র সাজে রবি ঋক্ষ লেকে।
আসোমান উঠি বধে উহু জাকে॥
নারায়ণ আপে আর আওঙ্গে।
ক্ষীরোদ সহিত আভি খাওঙ্গে॥
মেবে মন্ত্রদাতা জদি আওএ রুদ্রা।
তভি ফেঁক ডারে দরিয়া সমুদ্রা॥
জমরাজ হানে, লেকে আপ জঙ্গী।
সবি ডারে পেটে জেতে আওএ সঙ্গী॥ ইত্যাদি

এই উক্তি কুম্ভকর্ণের উপযুক্তই হইয়াছে। পাঠ করিলেই বীররসের আস্বাদ পাওয়া যায়।

দ্বিজ রামকৃত বিভীষণের রায়বার

কবি নিজের পরিচয় কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭০ সংখ্যক যে পুথিতে এই পালাটির অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে, তাহা ১০৯৮ সালে অর্থাৎ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়

সাহিত্য-পরিষদের ১০৬৭ সংখ্যক পুথিতেও এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যায়। ইহার তারিখ ১০৯০ সাল বা ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব কবি যে ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা ধারণা করা যাইতে পারে।

হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কা দগ্ধের পরে রাবণ সভায় বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন। সেই সময়ে বিভীষণ তাহাকে সীতা ফিরাইয়া দিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন রাবণ ও বিভীষণের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া কবি এই পালা রচনা করিয়াছেন। বিভীষণ বলিতেছেন—

যে দিবস গিয়া সীতা আনিলে পঞ্চবটে।
তদবধি লঙ্কায় যে অমঙ্গল ঘটে॥
দ্রব্যের আস্বাদ হরে পুষ্পে হরে গন্ধ।
নিরবধি শৃগাল কুক্কুরে করে দ্বন্দ্ব॥
প্রচণ্ড বাতাস বহে লঙ্কাপুরি লৈঞা।
রাত্রি দিন ডাকে শিবা মুখামুখী হৈঞা॥ ইত্যাদি

(রাবণের উক্তি) রাবণ বলে যে বলিছ মিথ্যা কভু নয়।
বানরে রাক্ষস মারে কোন শাস্ত্রে কয়॥
শৃগালে শার্দ্দুল জিনে কে দেখ্যাছে কবে।
এমন অদ্ভুত কর্ম্ম হয়্যাছে না হবে॥
সর্গ মর্ত্ত পাতাল দেখিলাঙ তিন লোক।
বানর বেটার কর্ম্ম দেখ্যা মর্ম্মে বাজে শোক॥
রামের সহিত কক্ষা করি সীতা আনিলাঙ যেন।
বানরের কি দোষ করিলাঙ ঘর পোড়াল্যেক কেন॥

(বিভীষণের উক্তি) বিভীষণ বলে যত দেবতা আনিলে হর‍্যা।
তা সভার বেটা আল্য বানর মূর্ত্তি ধর‍্যা॥
নিত্য আসিয়া পবন মন্দির ঝাটান।
তার বেটা ঘর পোড়াল্যেক বীর হনুমান॥

সূর্য্য জিন্যা করিয়াছ লঙ্কার দুয়ারী।
তার বেটা সুগ্রীব সাজিল দর্প করি॥
তিন সন্ধ্যা ব্রহ্মা আসি বালক পঢ়ান।
তার বেটা সাজিল ভল্লুক জাম্বুবান॥
বিশ্বকর্ম্মা বাড়ীর কর্ম্ম করে নিরন্তর।
তার বেটা নল সাজিল মহা ভয়ঙ্কর॥
অন্দরে চিকিচ্ছা করে ওঝা ধন্বন্তরি।
তার বেটা সুষেণ সাজিল দর্প করি॥
তিন সন্ধ্যা অগ্নি আসি করেন রন্ধন।
নীল সেনাপতি সাজে তাহার নন্দন॥
অশ্বশালে বন্দী থাকি ইন্দ্র হইল বধ।
তাহার বেটার বেটা সাজিল অঙ্গদ॥
নিত্য আসিয়া শশী ধরে ছত্রচাল।
তার বেটা সাজিল বানর দধিকাল॥
যম থাকিতে ঘোড়ার ঘাস আর কাটিবেক কেটা।
গয় গবাক্ষ তার সাজে অষ্ট বেটা॥

এইরূপ কথোপকথনের পরে বিভীষণ রাবণকে সীতা ফিরাইয়া দিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া বলিলেন—

বিভীষণ বলে রামে মানুস বল কেনে।
সপ্ততাল পাতাল হানিল জার বাণে।
রাবণ বলে বালি বানরা বিন্ধিল কতবার।
সেই ছিদ্রে বাণ জাইতে সক্তি বড় তার॥
বিভীষণ বলে রাম মানুস জদি হল্য।
তার হস্তে বিরদর্পে বালি কেন মৈল্য॥
রাবণ বলে সে মরিত আজি কিবা কালি।
পুরুষার্থ জানাইল মার‍্যা বুড়া বালি॥

এইভাবে অঙ্গদের রায়বারের ন্যায় উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিভীষণের কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া রাবণ তাঁহাকে পদাঘাত করেন। ইহাতে রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি রামের শরণাপন্ন হন।

কাশীনাথের কালনেমির রায়বার

অধ্যাত্ম রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ হইতে এই আখ্যায়িকা গ্রহণ করা হইয়াছে। রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। রামচন্দ্রের আদেশে হনুমান মহৌষধি আনয়নের জন্য ক্ষীর সাগরে গমন করিতেছিল। ইহা চর-মুখে জানিতে পারিয়া রাবণ হনুমানের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য কালনেমিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কালনেমি তপস্বীর বেশে হনুমানের গমনপথে অবস্থান করিতে থাকে। হনুমান তথায় উপস্থিত হইলে কালনেমি তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া স্নান করিবার জন্য এক জলাশয়ে প্রেরণ করে। যেখানে ধান্যমালী বা গন্ধকালী নামে এক দিব্যাঙ্গনা শাপ প্রভাবে মকরীরূপে অবস্থান করিতেছিল। হনুমানের হস্তে নিহত হইয়া সে দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এবং কালনেমির পরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হয়। জলাশয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হনুমান কালনেমির বধ সাধন করিয়াছিল।

বাল্মীকির রামায়ণে সুষেণের নির্দ্দেশক্রমে হনুমান ঔষধ আনয়নের জন্য কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড ১০২ম সর্গ)। ইহার পূর্ব্বেও ইন্দ্রজিতের শরে মূর্চ্ছিত রামলক্ষ্মণাদির চৈতন্যসম্পাদনের জন্য জাম্বুবানের নির্দ্দেশে সে উক্ত পর্ব্বত সহ ঔষধ লইয়া আসিয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৭৪ম সর্গ)। ইহাতে কালনেমি বধ, সূর্য্যকে কক্ষতলে আবদ্ধ করা, ভরতের শক্তি-পরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ নাই, অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিস্তৃত ভাবে এই সকল আখ্যায়িকা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম ও বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে। অধ্যাত্মের ক্ষীরসাগরের পরিবর্ত্তে পর্ব্বতের

পরিকল্পন। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে, এবং কালনেমির উপাখ্যান অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

কাশীনাথের রায়বারের দুইটি পুথির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (D. C. I., ১৫০, ১৫৮ পৃঃ, এবং ব-সা-প প, ১৩০৬, ৫২ পৃঃ)। এই পালার প্রারম্ভ এইরূপ—

	হনুমান	বলবান	গন্ধমাদন যায়।
	লঙ্কা হৈতে	শূন্যপথে	রাবণ দেখিতে পায়॥
বলে	ঘরপোড়াটাত	দেখি বিপরীত	কি করি উপায়।
তখন	ত্রাস পেঞা	রাবণ ভেঞা	কালনিমে ডাকায়॥
বলে ভাই	এধারে আস্য	কাছে বস্য	আমার কেবল তুমি
	তোমার তরে	রাখ্যাছি ঘরে	দেবকন্যা আমি॥
যায় দেখ	ঘরপোড়াটা	মরুক বেটা	মায়াপাতগা তুমি।
	সরোবরে	স্নান করিতে	খাবে কুম্ভীরিনী॥
ছলা করে	পাঠায়া দিবে	হুসার হবে	কি কৈব তুমার কাছে
	দেখছি ভালে	তোর কপালে	রাজপাট্টা আছে॥

ইহার পরে কিরূপে হনুমান এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কাশীনাথ ভণিতায় লিখিয়াছেন—

কাশীনাথ বলে	রাম পদতলে	কালনিমার রায়বার।
বাস মোর লক্ষ্মীপুরে	আছি টেরে	ভরসা রামের নাম॥

(D. C. I, ভূমিকা, XXIII পৃঃ)।

এই লক্ষ্মীপুর বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত।

সূর্পনখার রায়বার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৮১ সং পুথিতে এই পালার একটি অনুলিপি পাওয়া যায়। পুথিখানি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১-৪ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। কবির

ভণিতা নাই, অতএব ইহার রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ঘটনা অরণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত। রামচন্দ্রকে দেখিয়া সূর্পনখা মোহিত হইয়াছে। তখন তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য সে মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের নিকট গমন করিতেছে। কবি লিখিয়াছেন—

মাগি তখন, মোহিনি হল্য, রূপ ধরিল, মোহিতে রামের মন।
রূপের ছান্দে, মণি চন্দ্রে, আল করিল বন॥
কিবা তার দেহের বরণ, চান্দের কিরণ, মলিন হয়াছে লাজে।
হেম বরণি, জেন দামিনি, শোভিছে বন-মাঝে॥
ইত্যাদি

এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া সে রামের নিকট যাইয়া বলিল—

মোর বাসনা গেছে বসিতে কাছে, হইব তোমার নারি।
চান্দমুখখানি এ দিন রজনী দেখিব নআন ভরি॥

রামচন্দ্র তাহাকে লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পুনরায় রামের নিকট আসিয়া সীতাকে গ্রাস করিতে ধাবিতা হইলে রামের নির্দ্দেশে লক্ষ্মণ তাহাকে নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন।

রামায়ণের পদ

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণেও রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে কোন কোন কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে এইরূপ কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল।

(১)

প্রাণনাথ, তুমি নাকি যাবে বনবাসে।
সব ঠাই কানাকানি লোকমুখে ইহা শুনি
ভরত নাকি রাজা হইল দেশে॥

পরিহরি ঠাকুরাল গাছের পরিবে ছাল
মস্তকে ধরিবে জটাভার।
শুনিতে পরাণ কাঁপে কেমতে এমন রূপে
বিপিনে করিবে আগুসার॥
বাপ মায়ে দিয়া শোক কান্দাবে পুরের লোক
অনাথ করিয়া দাসদাসী।
অযোধ্যার রাজপাট ছাড়ি যাবে প্রাণনাথ
কি লাগিয়া হবে বনবাসী॥
কালি বৃদ্ধ মহারাজা পাত্রমিত্র ডাকি প্রজা
অধিবাস কৈল সূত্র-দণ্ড।
প্রভাতে তুলিয়া গা কি দোষে ভরতের মা
হেন সুখে পাড়িল পাসণ্ড॥
তুমি জগতের সার কি তোমাকে রাজ্যভার
কি তোমাকে নবদণ্ড ছাতা।
রহ কিবা যাহ বনে দয়া না ছাড়িহ মনে
সঙ্গে লয়্য অভাগিনী সীতা॥
মোর শিরে দিয়া হাথ সত্য কর প্রাণনাথ
অভাগিনী যাবে সঙ্গে লয়া।
নহিলে তিলেক থাক সম্মুখে দাণ্ডায়া দেখ
প্রাণ ছাড়ি চান্দমুখ চায়া॥
এতেক মিনতি করি রহে পদাম্বুজ ধরি
দয়া উপজিল রঘুনাথে।
বাণীকণ্ঠ কহে প্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
কৃপা করি লয়া যাবে সাথে॥[১]

১। কঃ বিঃ ২৫৪ সং পুথি হইতে। D. C. I., p. 199 দ্রষ্টব্য।

(২)

চাঁচর কেশজালে মল্লিকার মালে
বেড়নি লোটন সুবন্ধ রে।
অলির চয় চলে মল্লিকার মালে
পান করে মকরন্দ রে॥
অভরণ বিহীন দেখি এ শ্যাম-গায়।
প্রায় বুঝি কাড়্যা নিল ভরথের মায়॥
কপালে সিন্দুর করয়ে তম দূর
চন্দনের রেখা তায় রে।
নিন্দি কোকনদ ভাবিয়া রামপদ
শ্রীদীন দ্বিজ নিধি গায় রে॥

(৩)

ইন্দ্র আদি করি সুর নর দানব
ত্রিপুর জিনিল দশমাথে।
বিশ বাহু পর বিজই ধনুর্দ্ধর
নৃপতি নিশাচরনাথে॥
মণিময় কুণ্ডল রতনময় অভরণ
শোভা করেছে দশমুণ্ডে।
দিগবিজয় করি বিক্রম বল ধরি
ছত্র ধরাল নব দণ্ডে॥
সোই লঙ্কাপতি দৈব হরল মতি
বিপদ-সময়ে জাব ভেলা।
রতন মুকুট পর জলচর বানর
চরণ-ঘাত কত দেলা॥

হরি হরি দৈব-গতি নাহি জান।
কবহু রাজপদ করহু সুখসম্পদ
কবহু গুরু অপমান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর ভূপতি
বড় বলবন্ত গোসাঞি।
লিখিত ললাটে সুখ দুঃখ * *
আপন হাত কিছু নাই ॥[১]

(৪)

রঘুনাথ কপিসাত বধিবেক দশমাথ
হয়ে পার নদীনাথ, লঙ্কামে বৈঠে।
রণরঙ্গ কপিসুর সব দ্বার সব চুর
* * * তীর লএ বৈঠে ॥
বীরনকি দেখি দম্ফ দশদিক হল কম্ফ
কপিকুল রণ-ঝম্ফ, নিআ ধুম গগনে।
* * *
লোছমন্ত তিহ গেল গিরা সহ কত শৈল
হনুমন্ত তহি গেল, গন্ধর্ব্ব-সীমা।
পথমেচ আদি চ সঙ্গে করি মৃত (?)
পগড়ি বগল ভিত, বধি কালনিমা ॥
পন্থে ভরতসাত কর তেঁহি মুলকাত
লোছমন্ত জিয়াইআ লঙ্কা।
ভণয়ে ফকিররাম্ শত কোটি প্রণাম
বন্দ সদা হাম, হনুমান বঙ্কা ॥

১। কঃ বিঃ ২৪৮ সং পুঁথি হইতে। D. C. L, p. 194 দ্রষ্টব্য।

(৫)

বন্দিব অঞ্জনা-শুন   অসীম যাহার গুণ
(বীর) অনন্ত বিক্রম নাম হনু।
ফলভ্রমে শিশুকালে   দিবাকর ধরিল বলে
যেন গরাসিল অর্দ্ধ তনু ॥
জয় জয় রণধীর বীর মহাবল।
তপন যাহার গুরু   ভক্তি মুক্তি কল্পতরু
বন্দ বীরের চরণ যুগল ॥
জানকীর অন্বাষণে   প্রভু ভাই দুইজনে
ঋষ্যমুখে করাল্যে গমন।
খণ্ডায়্যা রাজার ভীত   শ্রীরাম করাল্যে মিত
বন্দো বীর পবন-নন্দন ॥
ইঙ্গিতে উদধি তরি   জানকীর ত্রাস হরি
অক্ষয় আদি মারিলে বীরগণ।
দগ্ধ করিল লঙ্কাপুরি   দশদ্বিপ (শির ?) দর্পহরি
বন্দো হেন বীরের চরণ ॥
নল উপলক্ষ হেতু   জলেতে বান্ধিলে সেতু
সময়ে তুষিলে প্রভু রাম।
কপিগণের ত্রাণকর্ত্তা   লক্ষ্মণের প্রাণদাতা
হেন বীরে করিয়ে প্রণাম ॥
জয় করিল লঙ্কাপুরি   বিভীষণে রাজা করি
দেশেরে আনিলে রঘুনাথে।
প্রভুর পদারবিন্দ   মকরন্দ মত্ত ভৃঙ্গ
হেন বীর বন্দিব যোড় হাতে ॥
হনুমানের নামগুণে   যে জন শ্রবণে শুনে
ভয় শোক দুঃখ নাহি জানে।

রাম তারে হন সুখী বরদাতা চন্দ্রমুখী
জয়যুক্ত রামের কল্যাণে ॥
মধুকণ্ঠের এই আশ পূরিবে রামের দাস
অশেষ খণ্ডায়্যা অপবাদ।
প্রভুর গুণ চরিত্র গাই শুনি দিবারাত্র
তিল আধ না করিহ বাদ ॥

(কঃ বিঃ, ২৮৬ সং পুথি ; D. C. I., ২২৬-৭ পৃঃ)

(৬)

[রামচন্দ্রের জন্য ভরত শত্রুঘ্নের আক্ষেপ]

কান্দিতে কান্দিতে বলে রাম কেনে বনে গেলে
অযোধ্যাক না আইলে আর।
দয়া ছাড়ি সর্ব্বজনে বসতি করিলে বনে
এতদিনে হল আথান্তর ॥
মনেতে ভরসা করি আশাতে নৈরাশ করি
রহিলাম (এ) চৌদ্দ বৎসর।

* * *

যদি প্রভু সেই এলে সভাকার প্রাণ নিলে
বধের ভাগী হইলে আপুনি।
অনল প্রবেশ করি কিবা বিষ খেয়া মরি
না রাখিব এ পাপ পরানী ॥
এত বলি দুটি ভাই ভূমে গড়াগড়ি যায়
প্রবোধ করেন পাত্রগণ।
উঠিয়া বসিলে খেনে কহিতেন সর্ব্বজনে
শুন ভাই নিশির স্বপন ॥
দুহে দুহা মুখ হেরি প্রেমজলে চান করি
রাম বলে ছাড়েন নিশ্বাস।

কৃপা কর গুণধাম গায় দ্বিজ কানুরাম
বন্দিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥৷

(কঃ বিঃ ১২৫ সং পুথি ; D. C. I , ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

[ইহা একটি স্বতন্ত্র পদ, কিংবা ত্রিপদী ছন্দে রচিত কোন আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ তাহা বুঝা যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উল্লিখিত পুথির শেষ ভাগে লিখিত আছে বলিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র পদ বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে কয়েকজন কানুদাসের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে সদাশিব কবিরাজের পৌত্র কানুরাম একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত। আবার অদ্বৈত শাখা গণনায় "কানু পণ্ডিতের" উল্লেখ দৃষ্ট হয় (চৈঃ চঃ, ১২শ পরিঃ)। উদ্ধৃত পদে "দ্বিজ কানুরামের" ভণিতা পাওয়া যাইতেছে মাত্র, অতএব কবির অন্যবিধ পরিচয় অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।]

(৭)

হনুমানের নিকট সীতার আক্ষেপ—

হনুরে, কহনা শ্রীরামগুণ কথা।
ভুবন-পাবন রাম নব দুর্ব্বাদল শ্যাম
কেমনে আছেন রাম তথা (?) ॥
রাম মোর না কৈল উদ্দেশ।
কানন-নিবাসী হইল রাক্ষসের হাথে মৈল (?)
ভাবিতে পরাণ হইল শেষ ॥
যদি না পাইব রঘুবরে।
সাগরে মরিব গিয়া রামপদ ধিয়াইয়া (?)
এই সত্য কহিনু প্রভুরে ॥
সীতার রোদন শুনি হনুমান বলে শুনি (?)
মরমে পাইল বড় বেথা।
দাশ নিধিরামে কয় শুন শুন মহাশয়
সব করে দারুণ বিধাতা ॥

(৮)

হনুমানের রামবন্দনা

কর অবধান নাথ শুন নিবেদন।
তোমার চরণ-ধূলি অমূল্য রতন ॥
জে চরণ পাইয়া ভোলা হইল পঞ্চানন।
জে চরণ ছলিলে বলি হইয়া বামন ॥
জেই চরণ মুনিগণ সদত ধিয়ায়।
হেন চরণের রেণু দেহ মোর গায় ॥
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী সর্ব্বলোকে জানি।
স্বামীর সাঁপেতে পাসান হইল আপনি ॥
পদধূলি দিয়া তারে করিলে নিস্তার।
হেন চরণ-রেণু বই গতি নাই আর ॥
জে চরণ পরশে আনন্দ বসুমতি।
জে চরণ হইতে আইল গঙ্গা-ভাগীরথি ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যেই চরণ-পঙ্কজ।
মোর শিরে দেহ হেন চরণের রজ ॥
পাসান করিলে মুক্ত দিয়া চরণ-রেণু।
সেই চরণ পেলে রাম মোর তনু ॥
অমর বাসব যদি সেবএ চরণ।
হেন চরণ-ধুলা দিয়া তোষ মোর মন ॥
হনুমানের বচন সুনিঞা রঘুনাথ।
কোলে করি হনুমানে চরণ-রেণু দিলা হনূর মাথ ॥
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় সুন বাছা হনু।
অক্ষয় কবজ পেলে চরণের রেণু ॥

(কঃ বিঃ ১১৪ সং পুথি, ৮৬ পৃঃ)।

(৯)

হনূমানের প্রতি রামের উক্তি

কোলেতে করিয়া হনু পুলকে পূরিত তনু
কহে রাম মধুর ভারতি।
সদত যে হরি লয় যমে কি করিব ভয়
তোমা হেন যাহার সারথি॥
তুমি দশরথ তাত শুনহে বানরনাথ
অবাদ করিয়ে কহি কথা।
তোমার যতেক গুণ কি কহিব পুনঃ পুন
মৃত শরীরে প্রাণদাতা॥
বিখ্যাত ত্রিভুবন আমরা ভাই চারিজন
ভিন্ন দেহ একই পরাণ।
তুমি তাতে জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার তুলনা নাই
সংশয়েতে তুমি পরিত্রাণ॥
যত দেখি জগজন প্রাণ বিনে নাঞি ধন
ভাবিয়া দেখিলাম ভালমতে।
এমন প্রাণদাতা তুমি তোমারে কি দিব আমি
হেন ধন নাঞি ত্রিজগতে॥
অযোধ্যার রাজ্যখণ্ড তোমারে ধরার দণ্ড
হইব তোমার আজ্ঞাকারী।
যত তুমি কৈলে শ্রম পঞ্চমাস বিক্রম
এক দণ্ডে সুধিতে না পারি॥
আশ্চর্য্য করিলে কাজ শুনহে বানরনাথ
যশ থুইলে ত্রিভুবন জিনে।
যত যত হইব আর সুধিতে নারিব ধার
করিয়া রাখিলে তুমি ঋণে॥

বলিবারে নাহি বোল   হের বাছা নেহ কোল
আপনায় প্রাণে কর সুখী।
অশেষ গুণের সিন্ধু   সংশয়কারে বন্ধু
তোমা হতে রামচন্দ্র সুখী॥
মধুকণ্ঠে বলে বাণী   শুন নাথ রঘুমণি
হনুমান করে অনুমান।
এই আমার হয় মন   তব পদে রহু মন
চরণ-রেণু দিয়া তুষ হনুমান॥

(কঃ বিঃ ১১৪ সং পুথি, ৮৬ পৃঃ)

(১০)

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ

উঠ উঠ লক্ষ্মণ ধানুকি।
কেবা করে রাজ্য পাট   রথ গজ বাজি ঠাট
কি করিবে বণিতা জানকি॥
মোর রাজ্যে হব রাজা   হরসিত যত প্রজা
নব দণ্ড ধরাবে তোমায়।
আসি ভরতের মাতা   * পণ্ড হইল তথা
জটা দিয়া বনেতে পাঠায়॥
এহেন সোনার নায়   শোণিতের ধারা তায়
কেমনে দেখিয়া জীব আমি।
এতদিনে বিধি বাম   লুকালে জানকি-নাম
বিদেশে ছাড়িএ গেলে তুমি॥
পড়িলে দারুণ শেলে   আমি যদি দেশে গেলে
সুধায় সুমিত্রা তব মাতা।
কান্দিয়াত উচ্চরায়   সুধায় তোমার মায়
লক্ষ্মণ এড়িয়াইলে কোথা॥

শমন-ভুবন যাহ আমাকে সঙ্গেতে লহ
সভে আমি অনলে সিন্ধি।
ধাম্মিক আসিয়া তায় শরণ নিলেক পায়
বিভীষণের সঙ্গে রহিলাম বন্দী॥
সীতা হেন পাব কত সুন্দরী সহস্র শত
তোমা ভাই না পাইব আর।
দ্বিজ মধুকণ্ঠে গান শোকে রাম অগেয়ান
নয়নে গলয়ে জলধায়॥

(কঃ বিঃ ১৫১ সং পুথি, ৩ পৃঃ)

(১১)

সীতার স্বয়ম্বর

জানকী মুখ তুলি চায় রাজপথে।
কুবলয় দলদাম নব দুর্ব্বাদল শ্যাম
শরধনু শোভে দুই হাতে॥
অনুজ জাএল পাসে মৃদুল করিঞা হাসে
নীল মেঘে জেন শক্র-ধনু।
বিধি করি নির্ম্মাণ কেমনে ধরিল প্রাণ
ভালে রামে ইহ কামতনু (?)॥
রাম মুণিত বেষ্টিত জাএ তিলেক দেখিব তাএ
সবে মোর এ দুই নঞান।
প্রতি অঙ্গে হএ আখি জুগ শত রআ দেখি
তবে কিছু জুড়াএ পরাণ॥
ইবে সুভ ভেল বিধি অযোধ্যার কলানিধি
উদয় করিল মিথিলাতে।
মনের তিমির রাশি ইবে সে হইল নাশি
ধনুক ভাঙ্গিব রঘুনাথে॥

সুনিঞা সখির বাণি আনন্দিত ঠাকুরাণি
পুলকিত ভেল রস তনু।
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় মনে না করিহ ভয়
রাম নিশ্চয় ভাঙ্গিব হরধনু॥

(৪৮৩১ সং পুথি, ৪-৫ পৃঃ)

(১২)

কি আজু পেখলু অনুপাম রঘুকুল জুবরাজে।
হেন মনে বাসি অভিমানে শশী
রহল জলনিধি মাজে॥
মুখ ঝল-মল ভুবন উজর
মকর কুণ্ডল সাজে।
সুরস সশোধর উদঅ করল
নিল জলধর মাঝে॥
আখি সেসএ জবে নিরখিএ
তাহার পরাণ পিএ (?)।
সে চারু বআনে জে হেরে নঞানে
ফেরিতে মেনে জিএ (?)॥
গউর শ্যাম তনু করে শোভে ধনু
কনক রচিত রেখা।
গউর প্রতিবিম্বু শ্যাম অঙ্গে দেখি
নিকসে কাঞ্চন রেখা॥
শোভে দুটি আখি জেবা অঙ্গে দেখি
পুন সে আনিলে লয় (?)।
পুরে মনোরথ হেরি জুগশত
লাখ নঞান জবে হএ॥
ধন্য সে জননী রাম গুণমনি
জাহার জঠরে জাত।
মধুকণ্ঠে কহে কৈউ মল্যাত (ন)এ
সীতাপতি রঘুনাথ॥ (৪৮৩১ সং পুথি, ৫ পৃঃ)

(১৩)

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

সীতা দাঁড়ায়্যা অগ্নির বিদ্যমান।
করি করপুটাঞ্জলি হেঠ মাথে মৈথিলী
অভিমানে সজল নয়ান॥
কহেন অগ্নির আগে সত্য আদি চারি যুগে
ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার গোচর।
কায়বাক্য মোর মনে নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণে
ছাড়িয়া প্রাণের রঘুবর॥
রঘুনাথ গুণমণি ইহা বই নাহি জানি
আদি অন্ত কথার প্রসঙ্গ।
তিল মাত্র থাকে পাপ ঘুচাবে মনের তাপ
প্রবেশে দহিবে মোর অঙ্গ॥
এত বলি ঠাকুরাণী কহিয়া বিনয় বাণী
প্রবেশিলা কুণ্ডের অনলে।
সীতার অঙ্গ পরশনে জীবন সফল মানে
যেন জননী বালকে নিল কোলে॥
তপ্ত কাঞ্চন জনু জিনিঞা সীতার তনু
ততোঽধিক হইল উজ্বল।
অগ্নিকুণ্ড মাঝে রয় তিল মাত্র নাহি ভয়
যেন জলের ভিতরে শৈআল॥
বানরগণ চমকিত কেহ নহে স্থির চিত
সভা মনে লাগিল তরাস।
অগ্নি কি করিলে হয় দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয়
বন্দিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৫৩৯-৪০ পৃঃ)

(১৪)

রামের বনগমন

ধরিয়া মাএর পায় রামচন্দ্র কয় তায়
পিতা হৈতে মাতা গুরু বট।
বেদশাস্ত্র জান রীত তুমি সব হিতাহিত
কোন্ মূঢ় বলে তোমায় খাট॥

যুবতীর পতি গতি পতি গুরু মৃত্যু সাথী
গুরুবাক্য লাঙ্ঘিবে কেমনে।
দূর কর যত তাপ লঙ্ঘিলে হবেক পাপ
অতএব যাত্যে হল্য বনে॥
পতি যুবতীর ত্রাতা জীবন-যৌবন-কর্ত্তা
মরিলে মরিবে তার সনে।
নাশিলে তাহার কথা পরকালে ঠেক সেথা
নিবেদিয়ে তোমার চরণে॥
রাজকুলে যাতে জন্ম জানহ সকল ধর্ম্ম
বনে যাত্যে না কর অন্যথা।
চৌদ্দ বৎসর যাব কোন কষ্ট নাহি পাব
মনে তুমি না ভাবিহ ব্যথা॥
রামচন্দ্র যত কয় রাণীর মনে নাহি লয়
পুত্রের সমান নাই কেহ্যে।
উথলিল শোকসিন্ধু ম্লান হৈল মুখইন্দু
লোচনে রাখিতে নারে লোহ॥
দ্বিজ মধুকণ্ঠে কয় রাণী স্থিরতর নয়
বিনাঞা বিনাঞা রাণী কান্দে।
পুত্র যায় বনবাস রাণী হৈল নৈরাশ
শোকাবেশে বুক নাহি বান্ধে॥

(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৫৪০-১ পৃঃ)

(১৫)

রাম-স্তব

গৌরীকান্ত পূজিত শান্ত যেই বেদান্ত কারণম্।
সগরভূপ কুলপ্রদীপ অমিত রূপ ধারণম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত কর্ম্ম পরব্রহ্ম সুরবরম্।
নমামি দেববৃন্দ-বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্॥
চরণকুঞ্জ মধুপ পুঞ্জ গুঞ্জমান লোভিতম্।
ভালে তিলক অধিক ঝলক জটা মুকুট-শোভিতম্॥
স্বর্ণ বর্ণ কুসুম-কর্ণ দীপ্ত চূর্ণ দিন করম্।
নমামি দেববৃন্দ বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্॥

খর্ব্ব-মহত গর্ব্ব-বিগত সর্ব্ব জগত বন্দিতম্ ।
অমৃতসান্দ্র বদন চন্দ্র মদনবৃন্দ নিন্দিতম্ ॥
চন্দ্রভাস নিন্দ্য হাস মন্দভাষ সুস্বরম্ ।
নমামি দেববৃন্দ—বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্ ॥
স্থিতি নিকুঞ্জ সুমনকুঞ্জ দুরিতপুঞ্জ পাবনম্ ।
স্বকীয় দাস হরণ-ত্রাস কৃতবিনাশ রাবণম্ ॥
সগুণ সিন্ধু উদিত ইন্দু প্রণত-বন্ধু ঈশ্বরম্ ।
নমামি দেববৃন্দ—বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্ ॥
শয়ন শেষ প্রভু রমেশ গুণ অশেষ ধারণম্ ।
নিগম-উক্ত ভয়-প্রযুক্ত ভকত-মুক্ত কারণম্ ॥
নিত্য-ভৃত্য— পূজিত সত্ত্ব দুরিত-দৈত্য বলহরম্ ।
নমামি দেববৃন্দ—বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্ ॥
বাহুদণ্ড অতি প্রচণ্ড প্রখর কাণ্ড মণ্ডিতম্ ।
রুচিকলাপ ধৃত সুচাপ অরিপ্রতাপ দণ্ডিতম্ ॥
উরসি ভাল অতি বিশাল মালজাল রুচিধরম্ ।
নমামি দেববৃন্দ্য—বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্ ॥
ধৃত সীতাঙ্ক রুচি-মৃগাঙ্ক নয়ন পঙ্করুহসমম্ ।
জলদ-দাম বিজিত কাম অঙ্গ শ্যাম অনুপমম্ ॥
তড়িত ভাস বাকল-বাস তমসনাশ-ছবিকরম্ ।
নমামি দেববৃন্দ-বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্ ॥
চরিত রাম অমৃতধাম সর্ব্বকাম পূর্ণিতম্ ।
শ্রবণে স্বাদ হত বিষাদ দ্বিজ প্রসাদ বর্ণিতম্ ॥°
ভণিত নব্য সুলভ কাব্য শুন সুভব্য সাদরম্ ।
নমামি দেববৃন্দ-বন্দ্য রামচন্দ্র সুন্দরম্ ॥

(জগদ্রামী রামায়ণ, ২৯৯ পৃঃ)

(১৬)

রামগুণ গাইতে গাইতে রে তনু
· পতন যদি রে হয় ।
যায়, অমর-ভুবনে চাপিয়া বিমানে
শমন চাহিয়া রয় ॥

অৰ্দ্ধনাভিকূপে ল'য়ে রে যখন ডুবায়
শত শমন আসিয়ে তারে
কি করিতে পারে।
পাতকী তরাতে শ্রীরামের নামটি
ওগো এসেছে সংসারে॥
(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বঙ্গবাসী সং, ৩৬৯ পৃঃ)।

(১৭)

রাম যা কর নিজ-গুণে
আমি ভজন সাধন জানিনে।
মিছে গেল দীনের দিন,
না হল ভজন ঘেরিল শমনে॥
যা করহে রামচন্দ্র, জগৎ-গোঁসাই।
আমার তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাই॥
মায়া-নদীর তীরে আছি, রাম,
তোমার চরণ করি সার।
ও রাঙ্গা চরণ তরি করি, রাম,
আমায় করহে পার॥ (ঐ, ৩৭০ পৃঃ)

মন্তব্য :—এই পদ দুইটি যিনিই রচনা করুণ না কেন, রাম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল।

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ

বর্ত্তমান ১৩৫৩ সালের ভারতবর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, মুরারি ওঝার সমসাময়িক এক কুবের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি "নবাশ্বিযুগ্মেন্দুমিতে শকাব্দে অর্থাৎ ১২২৯ শকে (১৩০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে) ভাস্বতীকরণের বৃত্তি রচনা করেন।" তৎপর দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"গ্রন্থ-রচনা কালে তাঁহার বয়স ন্যূনকল্পে ২৭ বৎসর ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মুরারি ওঝার জন্মাব্দও কিছুতেই তাহার পরে যাইবে না। কৃত্তিবাসের জন্মকালে তিনি জীবিত ছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর ধরিলেও উক্ত জন্মকাল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না" (ঐ, ৫৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখানে দেখা যায় যে, গ্রন্থ-রচনাকালে দীনেশ বাবু কুবের পণ্ডিতের বয়স ২৭ বৎসর ধরিয়া তাঁহার

জন্মাব্দ ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ সুস্থির করিয়াছেন। কেন, পঞ্চাশ বৎসর ধরিলে আপত্তি কি? টোলের পণ্ডিতদিগের সাধারণতঃ বেশী বয়সেই পাঠ-সমাপ্তি হয়। তারপর আরম্ভ হয় তাঁহাদের বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ণের অভিজ্ঞতা। ইহার পরে "বৃত্তি" রচনা করিতে ৫০ বৎসর বয়সের কল্পনা করা অযৌক্তিক নহে। তাহা হইলে ১৩০৭—২৩=১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবেরের জন্মাব্দ পিছাইয়া পড়ে। তারপর কৃত্তিবাসের জন্মকালে মুরারি ওঝার বয়স ১০০ বৎসর কল্পনা করা হইয়াছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, আমার ২০ বৎসর বয়সের সময়ে আমার প্রথম পুত্রের জন্ম হইয়াছিল, আর তাহার বয়স যখন ২২ বৎসর, তখন তাহার প্রথম কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অতএব আমি ৪২ বৎসর বয়সের সময়েই "দাদু" হইয়াছিলাম। এই জন্য একশত বৎসর কল্পনা করার কোনই প্রয়োজন নাই। এই হিসাবে উক্ত ১২৮৪+৪২=১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম সাল পাওয়া যায়। অতএব তাঁহার পক্ষে গণেশের সভায় উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশের অভাবে ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তারপর দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"মুরারি ওঝার জন্মাব্দও কিছুতেই তাহার পরে যাইবে না।" এইরূপ উক্তির যে কি সাথকতা রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ যে বৎসর দেহ রক্ষা করিয়াছেন, সেই বৎসরে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক কোন যুবকের মৃত্যু হইলেও তাহাকে রবীন্দ্র-নাথের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। অথচ তাঁহাদের বয়সের বিভিন্নতা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। দীনেশ বাবু যেসব সমীকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের বয়সের উল্লেখ রহিয়াছে কি? ইহার অভাবে কোন প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত আত্মবিবরণীতে রহিয়াছে যে, পাঠ সমাপনান্তেই তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অথচ দীনেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন—"পাঠ সমাপনের অব্যবহিত পরেই তিনি রাজদর্শন করেন এইরূপ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" আমরা কাহার কথা বিশ্বাস করিব? এইরূপ আলোচনা যে বিজ্ঞান-সম্মত তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তথাপি দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে কিছু নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। "কৃত্তিবাস পণ্ডিৎ রামায়ণগায়ণকর্ত্তা" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কৃত্তিবাস কেবল রামায়ণ রচনাই করেন নাই, কিন্তু তাহা গানও করিতেন। মহাভারত পাঠ করা হয়, গান করা হয় না। বোধ হয়, কৃত্তিবাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই এদেশে রামায়ণ গানের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাভারত

প্রবেশিকা

সংস্কৃত মহাভারত ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে মহাভারত আমরা পাইতেছি তাহা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মহাভারতের অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ে দেখা যায়, ব্যাসদেব প্রথমে উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া চব্বিশ হাজার শ্লোকে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তৎপর তিনি দেড় শত শ্লোকে ইহার এক অনুক্রমণিকা এবং ৬০ লক্ষ শ্লোকে এক বৃহৎ সংহিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে এক লক্ষ শ্লোক মর্ত্ত্যভূমিতে প্রচারিত রহিয়াছে। ইহাই এখন মহাভারত আখ্যায় অভিহিত হয়।[১] অতএব দেখা যাইতেছে যে, উক্ত প্রকার বর্ণনাতেই ইহার বিভিন্ন স্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তারপর গ্রন্থ-সমাপনান্তে ব্যাসদেব প্রথমতঃ ইহা তাঁহার পুত্র শুকদেবকে, এবং পরে জৈমিনি-বৈশম্পায়ন প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন করান (১।৬৩।৮৫-৮৬)। মতান্তরে বৈশম্পায়ন ইহা শুকদেবের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল শিষ্য আবার পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ব্যাস-ভারতে

১। বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র", ৯ম-১২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্ব্বপ্রথম বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক মহাভারত কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেইখানে উগ্রশ্রবা সূত তাহা শ্রবণ করেন। তৎপর তিনি নৈমিষারণ্যে শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে ইহা ঋষিগণের নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ভাবেই বর্ত্তমান ব্যাস-মহাভারত আমাদের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে দেখা যায় যে, মর্ত্ত্যে প্রচারিত মহাভারত একলক্ষ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল, অথচ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রদত্ত বিভিন্ন পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত শ্লোক-সংখ্যার নির্ঘণ্ট হইতে ৮৪,৮৩৬ শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত ২৪ হাজার শ্লোকের পরিবর্ত্তে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় রচিত হইবার কালে প্রায় ৮৫ হাজার শ্লোক মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার সহিত হরিবংশের ১২ হাজার শ্লোক যোগ করিলেও লক্ষ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। অথচ বর্ত্তমান মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেড়শত শ্লোকে মহাভারতের অনুক্রমণিকা প্রথমতঃ রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারতে ইহাতে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব ইহাতেও অতিরিক্ত ১২২ শ্লোক, এবং ঐ সকল শ্লোকে বর্ণিত উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এইভাবে বিভিন্ন যুগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া মহাভারত বর্ত্তমান আকৃতি লাভ করিয়াছে। শান্তি ও অনুশাসনিক পর্ব্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্ব্বের প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায়, আশ্বমেধিকপর্ব্বের অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সংযোজনা বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে (কৃষ্ণচরিত্র, ৯ম-১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে মহাভারতের প্রারম্ভ সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, কেহ কেহ "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই শ্লোক অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাভারতের প্রথম হইতে, কেহ কেহ আস্তীক পর্ব্ব

হইতে, কেহ বা বসু উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের প্রারম্ভের কল্পনা করিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। মহাভারতের পর্ব্ব-বিভাগে দেখা যায়, আদিপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে পৌষ্যপর্ব্ব বা উতঙ্কের উপাখ্যান শেষ হইয়াছে। গুরুদক্ষিণা প্রদানের জন্য পৌষ্যরাজার রাণীর কর্ণাভরণ আনিবার কালে তক্ষক কর্ত্তৃক তাহা আপহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিশোধ গ্রহণার্থে উতঙ্ক জন্মেজয়কে সর্পযজ্ঞ করিতে প্ররোচিত করেন। তৎপর পঞ্চম অধ্যায় হইতে পৌলোমপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ভৃগুবংশ কীর্ত্তন, ভৃগুর পুত্র চ্যবণের উৎপত্তি, ভৃগু কর্ত্তৃক অগ্নির প্রতি অভিশাপ প্রদান, রুরু ও প্রমদ্বরার বিবাহ এবং রুরু কর্ত্তৃক ডুণ্ডুভ সর্পের বধসাধন হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রসঙ্গে সর্পযজ্ঞের আখ্যায়িকার সূচনা পর্য্যন্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে পৌলোমপর্ব্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ে আস্তীক পর্ব্বের পরিসমাপ্তি। ইহাতে গরুড় ও সর্পগণের বিবরণ, সমুদ্রমন্থন এবং জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে। তৎপর সম্ভবপর্ব্বে বসু উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যগন্ধার জন্ম, শকুন্তলা এবং কচ ও দেবযানীর জন্ম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে। ব্রহ্মার অভিশাপে মহাভিষ নামক রাজা চন্দ্রবংশীয় নৃপতি প্রতীপের পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। এই পুত্রের নাম শান্তনু। গঙ্গা ইহার পত্নীত্ব স্বীকার করিয়া বসুগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অষ্টম বসু ভীষ্মরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করেন। এই ভীষ্মের আখ্যায়িকা হইতেই প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা ভাষা মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ বিভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থের প্রারম্ভের সূচনা করিয়াছেন।

মহাভারতকে পঞ্চম বেদ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বে এদেশে শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণের বেদে অধিকার ছিল না। বেদ অর্থে আমরা ঋক্-সামাদি সংহিতাচতুষ্টয়কেই বুঝিয়া থাকি। অতএব এই পঞ্চম বেদ সম্বন্ধে উক্ত বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমবাবু

লিখিয়াছেন—"Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সহিত সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। * * পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্ব্বজন মনোহর এমন সামগ্রীর সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি।" (কৃষ্ণচরিত্র, ১১শ অধ্যায়)। ব্যাসদেব নিজেও ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এক পবিত্র কাব্য রচনা করিবেন, যাহাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অভিব্যক্তি, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণাদি বর্ণিত হইবে। অতএব এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই উক্ত প্রকার যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারিবে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে—"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে এইরূপে মহাভারতের পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে পঞ্চম বেদ বলিলেও যদি আপত্তি উত্থাপিত হয়, এইজন্য ব্যাসদেব মহাভারতকে কাব্য গ্রন্থ রূপেই প্রচারিত করিয়াছিলেন। কাব্য-পাঠে সকলেরই অধিকার আছে। অতএব কাহারও পক্ষে ইহার ব্যবহার বারিত হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই রামায়ণ ও ভাগবত কাব্য-রূপেই প্রচারিত হইয়াছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা যে বিভিন্নযুগের লক্ষণাক্রান্ত তাহা উক্ত দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-

ব্যবস্থার অত্যধিক নিয়মানুবর্ত্তী বলিয়া রামায়ণের চরিত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মহাভারতের যুগে সমাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্য ব্যক্তি-মানস আর উক্ত প্রকারে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই। যে যুগে সমাজ ও শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছিল, রামায়ণের যুগ তাহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের ইতিহাসই ইহাতে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। অথবা পাশ্চাত্য মতানুযায়ী আদিম অবস্থা হইতে বীরত্বের যুগ অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই যে আদর্শ সমাজের উৎপত্তি হইয়া থাকে, বাল্মীকি আমাদিগকে তাহারই আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। আর ইহার পরবর্ত্তী মহাভারতের যুগ আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহাতে আধুনিকতার বিশিষ্টতাই বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই আমাদের নিকটে বেশী উপভোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার পর এদেশবাসিগণ ট্রাজিডি রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ মতবাদও এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে রামায়ণ ও মহাভারতকে ট্রাজিডি পর্য্যায়ে স্থাপন করা যাইতে পারে। রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন—তাঁহার অধিবাস পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে - কিন্তু প্রভাতে উঠিয়া তিনি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন করিলেন! লঙ্কাকাণ্ড করিয়া তিনি সীতাকে উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু অযোধ্যায় আসিয়া পুনরায় তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিতে হইল। ইহার পরে যখন তাঁহাকে আবার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন সীতা বসুমতীর গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন, তাঁহাকে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণের শ্মশানের উপরে রাজত্ব করিতে হইতেছে। চিরবাঞ্ছিত রাজ-সম্পদ্ এইরূপে তাঁহার নিকট অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব এই

উভয় গ্রন্থেই ট্রাজিডির বিশেষত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও "পুরস্কার" কবিতায় ইহার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, যথা—

তা'র পরে দেখ শেষ কোথা এর—
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসের,
এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।

অন্যত্র—

সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণ-সিংহাসনে।

স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্ম্ম-বিদার রব।

"জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়"
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস বলে' আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব।

এবং—

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির মানবের প্রাণে।

মহাভারত বলিতে এখন আমরা ব্যাস-রচিত গ্রন্থই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এদেশে জৈমিনি-রচিত ভারত-সংহিতাও বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ভাষা মহাভারত রচয়িতৃগণের মধ্যে অনেক কবি কেবলমাত্র অশ্বমেধ পর্ব্বটিরই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা সকলেই জৈমিনি-ভারত আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীরামদাস প্রভৃতি যে সকল কবির নামে সমগ্র মহাভারত প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও ব্যাসদেব-রচিত অশ্বমেধ পর্ব্বের পরিবর্ত্তে উক্ত জৈমিনি-ভারতই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ভাষা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব জৈমিনি-ভারতের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্যাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব অপেক্ষা জৈমিনি-ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বই কবিগণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মহাভারতের অনুক্রমণিকা অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, ব্যাসশিষ্য জৈমিনিও একটি ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাদ এই যে, উক্ত গ্রন্থ কবিত্বে ও ঘটনাবৈচিত্র্যে ব্যাসের মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে ব্যাসদেবের আদেশে ইহার প্রচার বারিত হইয়াছিল। সমগ্র জৈমিনি-সংহিতার মধ্যে এখন কেবলমাত্র অশ্বমেধপর্ব্বটিরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহার অন্য কোন পর্ব্ব এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হইলেও ভাষা-মহাভারত হইতে ইহার কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের আদি অনুবাদ-গ্রন্থগুলি সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহা প্রদর্শিত হইবে, কিন্তু ইহার যে অংশ এখন প্রচলিত

রহিয়াছে, তাহার বিশিষ্টতা প্রদর্শনের জন্য এখানে ব্যাস ও জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল।

জৈমিনি-ভারত

যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি-হত্যাজনিত দুষ্কৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাসদেবের পরামর্শে অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। কর্ণপুত্র বৃষকেতু ও ঘটোৎকচ-পুত্র মেঘবর্ণের সাহায্যে ভীম কর্ত্তৃক যৌবনাশ্বের নিকট হইতে অশ্ব আহরিত হইলে পর অনুশাল্ব তাহা অপহরণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তারপর যথাবিহিত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধানান্তে যদৃচ্ছা ভ্রমণের জন্য অশ্বকে মোচন করা হয়। বৃষকেতু, অনুশাল্ব, অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। অশ্ব সর্ব্বপ্রথম নীলধ্বজ রাজার মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করে। নীলধ্বজের মহিষীর নাম জ্বলা, পুত্রের নাম প্রবীর, এবং পুত্রবধূর নাম মদনমঞ্জরী। অগ্নিদেব তাঁহার কন্যা স্বাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্যানবিহারের সময় মদনমঞ্জরীর অনুরোধে প্রবীর অশ্ব ধারণ করেন। বৃষকেতুর সহিত যুদ্ধে প্রবীর বন্দী হন, কিন্তু নীলধ্বজ আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ইহার পরে অগ্নির প্রতি যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া নীলধ্বজ নগরে প্রবেশ করেন। এদিকে অর্জ্জুনের সহিত সন্ধি করিয়া অগ্নিদেব নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নীলধ্বজ অশ্ব প্রত্যর্পণ করাই সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু তাঁহার মহিষী জ্বলা ইহাতে স্বীকৃত না হওয়াতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে প্রবীরাদি নিহত হন, এবং নীলধ্বজ পরাজিত হইয়া নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক পত্নীর অমতেই অর্জ্জুনকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া জ্বলা দেবী মাহিষ্মতী পুরী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা উল্লুকের আবাসে গমন করেন, কিন্তু তথা হইতে বিতাড়িত

হইয়া গঙ্গাতীরে আগমন করেন। এই সময়ে তৎকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া গঙ্গা অর্জ্জুনকে এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার মস্তক ভূপাতিত হইবে। এইরূপে শত্রু-নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করিয়া জনা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বনেই জনা নাটক রচিত হইয়াছে। মাহিষ্মতী পুরীর রাজা নীল (ধ্বজের) উল্লেখ ব্যাস-ভারতের সভাপর্ব্বেও পাওয়া যায়। দিগ্বিজয় উপলক্ষে সহদেব এই পুরীতে উপস্থিত হইলে নীলের জামাতা অগ্নির সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল (ঐ, ৩০শ অধ্যায়)। তৎপর অশ্ব দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে এক মহতী শিলায় গাত্র ঘর্ষণ করিয়া শিলারূপে পরিণত হয়। এই উপলক্ষে মুনি উদ্দালক ও তাঁহার ভার্য্যা চণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অবাধ্যতার জন্য স্বামীর অভিশাপে চণ্ডী শিলারূপে পরিণত হইয়াছিল। অর্জ্জুনের স্পর্শে সে পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হয়। ইহার পরে অশ্ব হংসধ্বজের চম্পকনগরীতে প্রবেশ করে। পিতার আহ্বানে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তদীয় পুত্র সুধন্বা তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে তিনি এই বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। যুদ্ধে সুধন্বা, সুরথ প্রভৃতি নিহত হইলে হংসধ্বজ পরাজয় স্বীকার করেন। তৎপর প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং পরিণয়, ভীষণ রাক্ষসের উপাখ্যান এবং বভ্রুবাহনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বভ্রুবাহন অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর মস্তক ভূপাতিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সঞ্জীবক মণিস্পর্শে তাঁহারা পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। তৎপর ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ অশ্ব ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনসহ যাবতীয় বীরগণকে পরাজিত করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন ময়ূরধ্বজের নিকট গমন করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ময়ূরধ্বজ দেহার্দ্ধদানে সমুদ্যত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে বর দানে পরিতুষ্ট করেন। ইহার পরে যমের শ্বশুর বীরবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনাদির

পরাভব এবং উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। তৎপর চন্দ্রহাসের উপাখ্যান। কৃষ্ণার্জ্জুন চন্দ্রহাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জয়দ্রথপুর হইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন। অবশেষে মহাসমারোহে যজ্ঞ কার্য্য সমাধা হয়। ইহাই জৈমিনি-ভারত বর্ণিত অশ্বমেধ-পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ব্যাসভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বের সহিত এই আখ্যায়িকার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

ব্যাসরচিত অশ্বমেধ-পর্ব্ব

মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্ব ৯২ অধ্যয়ে সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম ৭২টি অধ্যায় বিবিধ ধর্ম্ম কথায় পরিপূর্ণ। ৭৩ম অধ্যায়ে যজ্ঞাশ্ব রক্ষায় অর্জ্জুন নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে যৌবনাশ্বের নিকট হইতে অশ্বগ্রহণের বিবরণ নাই, এবং বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের অর্জ্জুনসহ গমনেরও উল্লেখ নাই। অর্জ্জুন প্রথমেই ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মা, কেতুবর্ম্মা, ধৃতবর্ম্মা প্রভৃতিকে পরাজিত করেন, তৎপর অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জ্জুন বজ্রদত্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু নিহত করেন নাই। পরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথবংশীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জ্জুন তাহাদের রাজ্যে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া জয়দ্রথপুত্র সুরথ তৎকর্ত্তৃক পিতৃহত্যার বিষয় স্মরণ করিয়া দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। দুঃশলা তাহার পৌত্রকে সঙ্গে করিয়া অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। তৎপর মণিপুর। বভ্রুবাহন প্রথমে অর্জ্জুনকে অর্চ্চনা করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহা দ্বারা অপমানিত হইয়া অতিশয় বিমর্ষভাবে গৃহে যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার বিমাতা উলূপী নাগলোক হইতে আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। পিতাপুত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুন নিহত ও বভ্রুবাহন মূর্চ্ছিত হন। তৎপর সঞ্জীবনী মণি-প্রভাবে অর্জ্জুন

পুনর্জ্জীবিত হন। এই যুদ্ধে অর্জ্জুন ছিন্নশির হন নাই, বক্ষে আহত হইয়াছিলেন। ভীষ্মের নিধনের পরে বসুগণ গঙ্গার অনুমোদন গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে শাপযুক্ত করিয়াছিলেন। উলূপীর পিতা ইহা জানিতে পারিয়া দেবগণকে তুষ্ট করিয়া বভ্রুবাহন কর্তৃক নিধনে অর্জ্জুন শাপমুক্ত হইবেন, এইরূপ বরলাভ করেন। এই জন্যই উলূপী বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তৎপর অর্জ্জুন মগধরাজ মেঘসন্ধিকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কোশল দেশে গমন করেন। ইহার পরে চেদীরাজ শিশুপালের পুত্র শরভকে বশীভূত করিয়া অর্জ্জুন যথাক্রমে কাশী, অঙ্গ, কোশল ও কিরাত দেশ পরিভ্রমণ করেন। তৎপর দশার্ণ দেশের চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে বশীভূত করিয়া অর্জ্জুন নিষাদরাজ একলব্যের তনয়কে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরে দ্রাবিড়। অন্ধ্র প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া তিনি গান্ধার দেশে উপস্থিত হন। শকুনির পুত্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই দিগ্বিজয়-ব্যাপারে প্রবীর, সুধন্বা, তাম্রধ্বজ, চন্দ্রহাস প্রভৃতির উল্লেখ নাই। অন্যান্য বিষয়েও ইহার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। জৈমিনি-ভারতে অর্জ্জুন প্রবীর, সুধন্বা প্রভৃতি বড় বড় বীরগণকে নিহত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু ব্যাসভারতে তিনি সতত যুদ্ধকামী বীরগণের প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অশ্ব লইয়া বহির্গত হইবার কালে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"হতবান্ধব পার্থিবগণ তোমার প্রতিকূলাচারী হইলে তুমি তাহদিগকে নিহত করিও না।" এই জন্য অর্জ্জুন ইহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। জৈমিনি-ভারতে দেখা যায়, পরাজিত নৃপগণকে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসভারতে তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ব্যাসদেব-রচিত অশ্বমেধ-পর্ব্বের সহিত জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্ব্বের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। আখ্যায়িকার বৈচিত্র্যে

জৈমিনির গ্রন্থ চিত্তাকর্ষক বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে বোধ হয় ভাষা-মহাভারত রচয়িতৃগণ এই গ্রন্থকেই মূলতঃ অনুসরণ করিয়া অশ্বমেধ-পর্ব্বটি রচনা করিয়াছেন।

এদেশে অনেক কবিই ভাষা-মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল কবি ও তাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে আলোচনা হইবে তাঁহাদের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। ইহা হইতেই ভাষা-মহাভরতের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারা যাইবে।

১। মহাভারতের আদি অনুবাদক সঞ্জয়।
(নসরত সাহের সময়ে রচিত মহাভারতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই)।
২। কবীন্দ্র পরমেশ্বর
৩। শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব্ব
৪। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
৫। সারলা দাসের বিরাটপর্ব্ব
৬। দৈবকীনন্দনের কর্ণপর্ব্ব
৭। দ্বিজ অভিরামের অশ্বমেধপর্ব্ব
৮। রঘুনাথের অশ্বমেধপর্ব্ব
৯। রামচন্দ্র খাঁর অশ্বমেধপর্ব্ব
১০। দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব
১১। ঘনশ্যাম দাসের অশ্বমেধপর্ব্ব
১২। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত
১৩। কাশীদাসের মহাভারত
১৪। চন্দনদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব
১৫। বিশারদের মহাভারত
১৬। দ্বৈপায়নদাসের আশ্চর্য্যপর্ব্বাদি

১৭। নন্দরাম দাসের দ্রোণপর্ব্বাদি

১৮। দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত

১৯। কৃষ্ণানন্দ বসুর শান্তিপর্ব্ব

২০। দ্বিজ কৃষ্ণরামের অশ্বমেধপর্ব্ব

২১। অনন্ত মিশ্রের অশ্বমেধপর্ব্ব

২২। দ্বিজ গোবর্দ্ধনের গদাপর্ব্ব

২৩। রামলোচনের নারীপর্ব্ব

২৪। রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব

২৫-২৬। মহীন্দ্র ও উমাকান্তের দণ্ডীপর্ব্ব

২৭। রাজীব সেনের উদ্যোগপর্ব্ব

২৮। কুমুদ দত্তের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

২৯। জয়ন্তি দেবের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

৩০। বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারীর গীতার অনুবাদ

৩১। ভারত সাবিত্রী

৩২। রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা উপাখ্যান

৩৩। গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

৩৪। ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

৩৫। কবিচন্দ্রের মহাভারত

৩৬। ভবানী দাসের রামরত্নগীতা

ইহা ব্যতীত মহাভারত রচয়িতা আরও অনেক কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহাদের অনেকের গ্রন্থই নামে মাত্র প্রচারিত রহিয়াছে, বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরনন্দী

সঞ্জয়ের মহাভারত

এই তিন কবির মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সময় সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। হোসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁনের আদেশে কবীন্দ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খৃষ্টাব্দ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে কবীন্দ্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বিজয় ও সঞ্চয়ের সময় সম্বন্ধে এইরূপ কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। অন্য কোন উপায়ে ইহা স্থিরীকৃত করিতে পারা যায় কিনা প্রথমতঃ তাহাই দেখিতে চেষ্টা করা যাউক।

এই আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা সঞ্জয়ের মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পক্ষীরাজ গরুড়ের ভয়ে নাগপতি তক্ষক বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তক্ষকের এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম সারদা। মহারাজ পরীক্ষিত বিষ্ণু-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তক্ষক ভাবিলেন যে, পরীক্ষিতকে কন্যাদান করিতে পারিলে তাঁহার অনুগ্রহে বোধ হয় বিষ্ণু-ভক্ত গরুড়ের ভয় হইতে তিনি মুক্তি পাইতে পারেন। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি কন্যাসহ ব্রাহ্মণবেশে পরীক্ষিতের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং নির্জনে তাহার ভয়ের কারণ বিবৃত করিয়া পরীক্ষিতকে কন্যদান করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে পরীক্ষিত তাহাকে গরুড়ের আক্রমণ হইতে অভয় প্রদান করেন। তৎপর ব্রহ্মশাপের প্রভাবে শ্বশুর তক্ষক আসিয়া পরীক্ষিতকে দংশন করে। এইভাবে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে পর সারদার গর্ভসম্ভূত তাঁহার পুত্র জন্মেজয় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদিন ব্যাসদেব তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলে তিনি বর্ত্তমান থাকিতেও কুরুপাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কেন ধ্বংস প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, ইহার কারণ জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব বলিলেন যে, তিনি কুরুপাণ্ডবগণকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করেন নাই। ইহা বলিয়াই পুনরায় ব্যাসদেব বলিলেন—"তুমি ইহাতে বিস্মিত হইও না, কারণ আমি তোমাকে এখন যে উপদেশ প্রদান করিব তাহাও হয়ত তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়া জন্মেজয় বলিলেন যে, তিনি ব্যাসের উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। তখন ব্যাস বলিলেন—

ব্যাস বোলে যুণ বলি রাজা মহাসত্ত।
রাজদ্বারে প্রভাতে আসিব এক রথ॥
রজনী প্রভাত কালে না হইবা বাহির।
অন্তসপুরে থাকিবা মন করি স্থির॥
অন্তসপুরে হোন্তে জদি নিকল রাজন।
কালি জদি কদাচিৎ বৈস সিংহাসন॥
সিংহাসনে বৈস জদি যুণ কহি সার।
কেহ জদি কহে না যুণিবে সমাচার॥
রথ আইল কহে জদি যুণহ রাজন।
রাজদ্বারে বাহির না হইবা কদাচন।
জদি রাজদ্বারে জাও রথ না চাহিবা।
জদিবা চাহ রথ তাতে না চড়িবা॥
জদি বা রথে উঠ নৃপতি-নন্দন।
রথে চড়ি কোন দিকে না জাইবা আপন॥
অন্য দিকে জাও জদি না জাইও দক্ষিণে।
আমার বচন বাপু রাখিবা জতনে॥
জদি বা দক্ষিণে জাও, এক পুরী পাইবা।
কদাচিৎ পুরীমধ্যে প্রবেশ না হইবা॥

পুরীমধ্যে জাও জদি পাইবা এক কন্যা।
সর্ব্বসুলক্ষণা সেই রূপে গুণে ধন্যা॥
সেই পুরীমধ্যে রাজা যদি তুমি জাহ।
কদাচিৎ না করিঅ তাহারে বিবাহ॥
জদি বা বিবাহ কর সেই রূপবতী।
দেশে না আনিবা তারে যুন মহামতি॥
জদি বা দেশেতে আন পরমাসুন্দরী।
কদাচিৎ তাহারে না কর পাটেশ্বরী॥
যদি পাটেশ্বরী কর, পাইবা দুঃখভার।
এ বলিয়া মনে মনে হাসিলা অপার॥

ব্যাসের উপদেশ শুনিয়া জন্মেজয় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। কিন্তু পরদিন প্রভাতেই রথ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই রথে চড়িয়া রাজা দক্ষিণদিকের পুরী হইতে কান্তবতী নামক কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া পাটেশ্বরী করিলেন। একদিন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি জন্মেজয়ের পিতৃশ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করিতে আসিলে কান্তবতী তাহার মস্তকে শৃঙ্গ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে ঋষ্যশৃঙ্গের বদনেও হাসি ফুটিয়া উঠে। জন্মেজয় ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডাঘাতে মুনির একটি শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং তাহা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হয়। ইহাতে তিনি জন্মেজয়কে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইতে অভিশাপ প্রদান করেন। ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি জন্মেজয়কে মহাভারত শ্রবণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। জন্মেজয় তখন ব্যাসদেবকে স্মরণ করিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—

ব্যাস বলে তাহা কহি শুন নরপতি।
তবে সে বিপদ হোতে পাইবা অব্যাহতি॥

জএমুণি দিলাম রাজা তোহ্মা বিস্তমান।
জএমুণি সকল কথা কৈব তোহ্মা স্থান।
জএমুণি কহন্ত কথা জন্মেজয় শুনে। ইত্যাদি

এখন দেখা যাইতেছে যে, এই সকল আখ্যায়িকা ব্যাসদেবের মহাভারতে নাই। কিন্তু ইহাও অনুধাবন করা যায় যে, ভাষা মহাভারত রচনা করিবার কালে সঞ্জয় নিশ্চয়ই কোন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত উল্লেখে জৈমিনির নাম থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জৈমিনির মহাভারতই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সঞ্জয় মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক ব্যাস-ভারত বিবৃত হয়, কিন্তু এখানে জন্মেজয়কে মহাব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য জৈমিনি কর্ত্তৃক মহাভারত বিবৃত হইয়াছে। ব্যাস-ভারতের সহিত এই আখ্যায়িকার পার্থক্য দৃষ্টে এই ধারণাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, সঞ্জয় জৈমিনিভারতই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অধুনা অপ্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সঞ্জয়ের সময়ে বোধ হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ঘটনার এইরূপ বিচিত্রতা যে জৈমিনি ভারতের প্রধান লক্ষণ, তাহা জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্বের সহিত ব্যাসদেবের অশ্বমেধপর্ব্ব তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কোন গ্রন্থে এইরূপ অদ্ভুত বর্ণনা না থাকিলে সঞ্জয় নিজের কল্পনাবলে ইহা রচনা করিয়া প্রচারিত করিতে সাহসী হইতেন না। সঞ্জয়ের গ্রন্থে বানরকর্ত্তৃক গঙ্গা-পরিগ্রহ, এবং ঐ বানরের শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণের অদ্ভুত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ইহাও জৈমিনি-ভারতের অঙ্গীভূত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাস-ভারতবহির্ভূত সমগ্র দণ্ডীপর্ব্বটী জৈমিনির রচিত বলিয়া ধারণা করাও অসঙ্গত নহে। "গান্ধারীর দ্বাদশবর্ষ গর্ভধারণ ও গর্ভচিকিৎসা, বিরাটপর্ব্বে উত্তর গো-গৃহে যুদ্ধকালে উত্তরের সারথী হইয়া রথে উঠিবার কালে দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুনের রসিকতা, রাজসূয় যজ্ঞকালে হনুমানের উপর দিয়া সসৈন্যে অর্জ্জুনের লঙ্কা গমন, খাণ্ডবদাহনকালে নাগিনী ও তৎপুত্রসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ" প্রভৃতি

ব্যাস-ভারতবহির্ভূত ঘটনাগুলি যে জৈমিনিভারতে ছিল ইহাও ধারণা করা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ আদর্শ হইতে যে, প্রচলিত ভাষামহাভারতে অনেক ঘটনা সংযোজিত হইয়াছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। ব্যাসভারতে বর্ণিত আছে যে, অর্জ্জুন কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সম্মতি-ক্রমে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সহিত যাদবগণের সেই সময়ে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। চর আসিয়া যখন যাদবসভায় সুভদ্রাহরণ ব্যাপার বর্ণনা করিল, তখন যাদবগণ সকলেই যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহারা অবশেষে অর্জ্জুনকে আনিয়া কন্যাদান করেন। অথচ কাশীদাসের মহাভারতে রহিয়াছে যে, বলরাম সুভদ্রাকে বিবাহ করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি বরবেশে সজ্জিত হইয়া ভীমসহ দ্বারকাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় ইহাও জৈমিনি-ভারত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গেলেও এই সকল অপূর্ব্ব বর্ণনা হইতে ইহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। সঞ্জয়ের গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতেও জৈমিনির উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

জএমুণি কহিল কথা ভারথ-তন্তর।
মুনিআ রাজার রোগ খণ্ডিলেক সব॥
তিন কথা জন্মেজয়ের না লইল মন।
তিনখণ্ড রোগ রৈল বজ্রলেপন॥

(কঃ বিঃ ২০৩০ সং পুথি, ১২৬ পত্র)

অতএব সঞ্জয় যে জৈমিনির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অনুমান মাত্র নহে, অতীব সত্য ঘটনা, কারণ ইহার আদি-অন্ত একই সূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সঞ্জয়ের ভণিতা আলোচনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (ব-সা-প-প, ১৩৪৪, ১৭৪-২১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য),

আবার কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সন্দেহের নিরসনও করিয়াছেন (ঐ, ১৩৩৫, ১৩১-১৪৩ পৃঃ)। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই ভণিতা লইয়া আলোচনা করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ১৪২ পৃঃ), কারণ এক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুথিতেই নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতা দৃষ্ট হয়—

ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥

(ঐ, ৫৭৭ পত্র)

অন্যত্র—

সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা।

(ঐ, ২৩৩ পত্র)

সঞ্জয়ের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই প্রকার উক্তি রহিয়াছে—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত-কথা কহিলেক মর্ম্ম॥

(ঐ, ৪৩৬ পত্র)

অন্যত্র—

হরিনারায়ণ দেব দিনহিন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্ব ভারতি॥

(বা-প্রা-পু-বি, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৭২ পৃঃ)

এবং—

রচনা বিসেসত নানারসমএ।
হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জএ॥

(ঐ)

ইহাতে বোধ হয় হরিনারায়ণ দেব "সঞ্জয়" এই উপনামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হোসেন সাহ ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

তাঁহার সেনাপতি পরাগল খানের সভায় মহাভারত পঠিত হইত ইহা কবীন্দ্রের রচনা হইতে জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ইহাই সঞ্জয়ের মহাভারত। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন মহাভারত এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া সঞ্জয়কেই মহাভারতের আদি রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। তিনি লিখিয়াছেন—"যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে। মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোকহিত-সংকল্পে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, প্রতিপত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৪২ পৃঃ), যথা—

অতি অন্ধকার যে মহাভারত-সাগর।
পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল॥ (বে-গ-পু, ৪৬২ পৃঃ)

অন্যত্র—

ভারথের পুন্ন কথা নানা রসময়।
লোক বুঝাবার হেতু কহিলা সঞ্জয়॥

(কঃ বিঃ ৬১১৫ সং পুথি)

এই জাতীয় উক্তি পাঠ করিলেই মনে হয়, "মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচার করেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৪২ পৃঃ)। বস্তুতঃ যে ভাবে এই সকল উক্তি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এই গ্রন্থই যে মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদ এইরূপ ধারণাই জন্মিয়া থাকে। "বিশেষতঃ সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্ব্ব ৪ পত্রে, অনুশাসনপর্ব্ব ৩ পত্রে, মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব ৩ পত্রে, ও সৌপ্তিকপর্ব্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ; সুতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন সামগ্রী ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।"

(ঐ, ১৪১ পৃঃ)।

ভণিতাতে কবির নামের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ সঞ্জয়ের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইহাও প্রচারিত হইয়াছে যে, শ্রীকর নন্দীর গ্রন্থই সঞ্জয়ের নামে চলিয়া যাইতেছে। নন্দী-কবি সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

কবীন্দ্রের মহাভারত

কবীন্দ্র নিজের গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেন-মতে ধর্ম্ম রহিল বনের ভিতর॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত বসতি।
কেন-মতে তারা সবে পাইল বসুমতী॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষিপ্ত করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥
তাঁহার আদেশ-মাল্য মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র কহিল কথা পাঁচালী রচিয়া॥

অতএব পরাগল খানের সভায় যে মহাভারত পঠিত হইত, তাহা কবীন্দ্রও স্বীকার করিতেছেন। ইহা বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ ছিল বলিয়া একদিনে পাঠ করিয়া শেষ করা যাইত না। এইজন্য পরাগল ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাহারই ফলে কবীন্দ্রের মহাভারত রচিত হইয়াছিল। ইহা যে প্রথমতঃ অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারেই রচিত হইয়াছিল, তাহারও নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে। আর ইহাও বুঝিতে পারা

যায় যে, সেই বৃহৎ গ্রন্থখানি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিবার সুযোগও কবীন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কবীন্দ্রের যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে প্রায় ১৭০০০ হাজার শ্লোক রহিয়াছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সং, ১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এত বড় গ্রন্থ একদিনে পাঠ করা অসম্ভব বলিয়া ইহাকে কবীন্দ্রের আদি রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহা তাঁহার গ্রন্থের পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। এই সময়ে কবীন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রচনার সহিত অন্য কবিগণের রচনা যোগ করিয়া ইহাকে বর্দ্ধিত আকারে পরিণত করা হইয়াছে। কবীন্দ্রের নিজের উক্তি, এবং তাঁহার গ্রন্থে যে অন্য কবির রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারা যায়।

এখন দেখিতে হইবে, কবীন্দ্রের পূর্ব্বে যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় কিনা। প্রাচীনতম কবিগণের মধ্যে একমাত্র বিজয় ও সঞ্জয়ের গ্রন্থই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কাহার আদর্শ কবীন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বিজয়ের আদর্শ যে কবীন্দ্র গ্রহণ করেন নাই, তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে। বিজয়ের গ্রন্থ ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতের আদর্শে রচিত হইয়াছে, কিন্তু কবীন্দ্রের গ্রন্থে জৈমিনি ভারতের উল্লেখ রহিয়াছে। সঞ্জয়ও জৈমিনির মুখেই জন্মেজয়কে মহাভারত শুনাইয়াছেন। (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত, ভূমিকা, ॥৵৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব আদর্শ হিসাবে কবীন্দ্র যে সঞ্জয়কে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিজয়ের মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"কবীন্দ্রের উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র ভারত-রচনা করিবার পূর্ব্বে সুলতান হোসেন শাহের পুত্র চট্টগ্রাম-জয়ে প্রেরিত নসরত খাঁও (চট্টগ্রাম বাস-কালে) অপর এক ভারতপাঞ্চালী প্রকাশ করাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই ভারত-পাঞ্চালী-রচয়িতার নাম কবীন্দ্র উল্লেখ

করেন নাই। অধিক সম্ভব, সেই মহাভারতকারের নাম সঞ্জয়, অথবা তাঁহার আদর্শ কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি। পূর্ব্বতন রচনা বলিয়া কবীন্দ্র অনেক স্থলেই সঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছেন।" (ঐ, ॥০—॥/ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঋষ্যশৃঙ্গের অভিশাপগ্রস্ত জন্মেজয়কে কুষ্ঠ-ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য সঞ্জয় জৈমিনির মুখে তাঁহাকে মহাভারত শুনাইয়াছেন, আর "কবীন্দ্র পরমেশ্বরও এইরূপে জৈমিনির মুখে ভারত আরম্ভ করিয়াছেন। সঞ্জয় বানর কর্ত্তৃক গঙ্গা পরিগ্রহ ও সেই বানরের শান্তনুরূপে আবির্ভাব ইত্যাদি যে সকল গল্প করিয়াছেন, কবীন্দ্রের পরাগলী ভারতেও তাহা অবিকল বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সঞ্জয়ের ভারত-পাঁচালী ও কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত এক ছাঁচে ঢালা" (ঐ, ॥৵০ পৃঃ)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবীন্দ্র সঞ্জয়ের গ্রন্থই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার প্রথমেই গ্রন্থকার সংস্কৃত শ্লোকে ব্যাসদেবকে বন্দনা করিয়াছেন। তৎপর বৈসম্পায়নের মুখে জন্মেজয়কে মহাভারত শুনান হইয়াছে। ইহাতে যে ব্যাস-ভারতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সঞ্জয় ও কবীন্দ্র জৈমিনির আদর্শে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন, অতএব প্রথমেই আদর্শগত বিভিন্নতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা প্রথমতঃ নগেন্দ্রবাবুর উক্তি লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, পরাগলী মহাভারতের কতকগুলি উপাখ্যান এবং অপ্রাসঙ্গিক ও মূল মহাভারত বহির্ভূত কথাগুলি বাদ দিলে আমাদের আলোচ্য বিজয় পণ্ডিতের ভারত কথার সহিত (কবীন্দ্রের রচনার) সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হয়।"

(ঐ, ভূমিকা, ৵০ পৃঃ)। অন্যত্র "সঞ্জয়ের শকুন্তলার উপাখ্যান, যযাতি-চরিত ও শান্তনুচরিত প্রভৃতি ভারতের প্রথমাংশ বাদ দিয়া কৌরব ও পাণ্ডব-গণের উৎপত্তি হইতে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত সঞ্জয় যেরূপ ভাবে ও যেরূপ ভাষায় রচনা করিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বিজয়পণ্ডিতের রচনার মধ্যেও আমরা ঐরূপ ভাব ও ভাষার ঐক্য পদে পদে পাইয়াছি। এমন কি অনেক স্থানে শ্লোকে শ্লোকে কথায় কথায় মিল রহিয়াছে, এরূপ অপূর্ব্ব একতা বিরাটপর্ব্ব হইতেই সমধিক লক্ষিত হয়। দেখিলেই বোধ হইবে যেন, একই ব্যক্তির করকমল বিনিসৃত। সুবিজ্ঞ সমালোচক উভয়েরই রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্বীকার করিবেন, এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহাই নকল করিয়াছেন।" (ঐ, ৸০-৸৵০ পৃঃ)। আমরাও এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বিজয়পণ্ডিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিকল্পনা অর্থহীন হইয়া পড়ে, কারণ সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনাই তাঁহার গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে একের রচনা অপরের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবার কারণ কি, ইহাই প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সঞ্জয় ও কবীন্দ্র জৈমিনিভারত আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই কবির রচনা এবং শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্ব্ব হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে জৈমিনি-ভারতই বিশেষ প্রচলিত ছিল। পরে ব্যাস-ভারতের প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়। এই সন্ধিক্ষণে সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনা আত্মসাৎ করিয়া বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের উদ্ভব হইয়াছে। মহাভারত ব্যাসদেবই রচনা করুণ, আর জৈমিনিই রচনা করুণ, ইহাতে ঘটনার সাদৃশ্য থাকিবেই, যেমন শান্তনুর সহিত গঙ্গার বিবাহ, গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের উৎপত্তি, মৎস্যগন্ধার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম ইত্যাদি। এই মূল আখ্যায়িকা অব্যাহত রাখিয়া জৈমিনি হয়তঃ তক্ষকের কন্যা সারদার সহিত পরীক্ষিতের বিবাহ, এবং বানরের পান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি

উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, আর ব্যাসদেব তাহা করেন নাই। পরে মহাভারতের আদি রচয়িতা ব্যাসদেবের গ্রন্থই প্রসিদ্ধি লাভ করিলে তাঁহার শিষ্য জৈমিনিরচিত ভারত অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের গ্রন্থের সংস্কার করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ইহারই ফলে কিভাবে বিজয় পণ্ডিতের গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের বন্দনার প্রথম দুইটি শ্লোক ("নারায়ণং নমস্কৃত্য" এবং "তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিত-শুদ্ধবুদ্ধিং" ইত্যাদি) কবীন্দ্রের ভারতেও পাওয়া যায়। তৎপর ইহার প্রারম্ভসূচক—

প্রণমহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় গুণের নিধান॥

শ্লোকের পরিবর্ত্তে কবীন্দ্রের গ্রন্থে আছে—

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধান।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ প্রধান॥

ইহার পরবর্ত্তী চারিটি শ্লোকের—

সংহিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে শুনি।
. চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে ধ্বনি॥
এক লক্ষ শ্লোক মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত।)

সহিত যে কবীন্দ্রের রচনার সামঞ্জস্য আছে, তাহা নগেন্দ্রবাবু তারকা-চিহ্নিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে মহাভারতের আখ্যায়িকা

জন্মেজয় বসিয়াছে সভার মাঝারে।
দৈবে ব্যাসমুনি তথা আইলা সত্বরে।
নানাবিধ প্রকারে পূজিল মহীপতি।
ইতিহাস কথা মুনি কহ মহামতি।

মুনির সাক্ষাতে রাজা কৈল নিবেদিত।
তোমার প্রসাদে মুনি জানিব বিহিত ॥
নৃপতির কথা শুনি বোলে মুনিবর।
সকল কহিতে আমি নাহি অবসর ॥
শিষ্যেরে কহিয়া দিল মুনি বিদ্যমানে।
কহিল সকল কথা শুন সাবধানে ॥
এত বলি ব্যাসমুনি গেলা তপোবন।
কহেন বৈসম্পায়ন সকলে শ্রবণ ॥ ইত্যাদি

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত কীর্ত্তিত হইয়াছিল ইহাই ব্যাস-ভারতের আখ্যায়িকা। কিন্তু এখানে যজ্ঞের কোনই উল্লেখ নাই, অধিকন্তু সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের ভারতে যেমন বর্ণিত আছে যে, অন্য এক সময়ে ব্যাসদেব জন্মেজয়ের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এখানে সেইরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে বিভিন্নতা এই যে, উক্ত দুই কবির ন্যায় জৈমিনির মুখে মহাভারত না শুনাইয়া বিজয়পণ্ডিত উদ্ধৃত উল্লেখের শেষ পঙক্তিতে বৈসম্পায়নের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতেই ব্যাসভারতের আদর্শ প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং এইজন্যই এই কয় পঙক্তির রচনা সাদৃশ্য সঞ্জয় বা কবীন্দ্রের গ্রন্থে লক্ষিত হয় না। তারপর বানরের শান্তনুরূপে আবির্ভাবের বিবরণ এই গ্রন্থে থাকিতেই পারে না, কবি লিখিয়াছেন—

দেবচক্রে গঙ্গা হইলা শান্তনুর নারী।
প্রতিজ্ঞা করাইল তারে জাহ্নবী সুন্দরী ॥ ইত্যাদি

এই দেবচক্রের বিবরণ জৈমিনি-ভারতে বিস্তৃত ভাবেই পাওয়া যায়। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, মহাদেবের কৌশলে গঙ্গাকে শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল (বিজয়ের মহাভারত, ভূমিকা, ১।৶০—১৷৷৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ যখন এই দুই পঙক্তির (এবং পরবর্ত্তী কয়েক পঙক্তিরও) রচনা-সাদৃশ্য কবীন্দ্রের ভারতে লক্ষিত হয়, তখন স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, সঞ্জয় ও

কবীন্দ্রের রচনা প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া ব্যাস-ভারতের আদর্শ-প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বিজয়-পণ্ডিতের গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব যিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজয়ের ভণিতা লইয়া আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আরও স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে।

কবীন্দ্রের ভণিত সাধারণতঃ এইপ্রকার—

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

অথবা—

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করয়ে উদ্ধার॥

আর বিজয়পণ্ডিতের ভণিতা এইরূপ—

বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি॥

আদিপর্ব্বে ১৯১ এবং ৫৫২ সং শ্লোকদ্বয়ে উক্ত প্রকার দুইটি মাত্র ভণিতা রহিয়াছে। আর এইরূপ ভণিতাই বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি পর্ব্বে পাওয়া যায়। ইহাই বিজয়ের সাধারণ ভণিতা। কিন্তু দুই এক স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, যেমন সভাপর্ব্বের শেষে—

বিজয়-পাণ্ডব নাম সভাপর্ব্ব অনুপাম
অমৃতলহরী বরিষণ।
এহি পর্ব্ব ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
বিজয় পণ্ডিতের সুবচন॥

এবং গ্রন্থ শেষে—

বিজয় পণ্ডিতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পায় পরিত্রাণ॥

সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই দুইটি মাত্র ভণিতায় বিজয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিজয়ের সভাপর্ব্বের অধিকাংশ যে ভাবে ত্রিপদী ছন্দে রচিত রহিয়াছে, তাহারও অধিকাংশ শ্লোকের সহিত কবীন্দ্রের রচনা-সাদৃশ্য দেখা যায়। একজনের গ্রন্থ অপরে অনুকরণ না করিলে ছন্দ ও ভাষার এমন সামঞ্জস্য সংঘটিত হইতে পারে না। এই সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে যে, জৈমিনির আদর্শে রচিত সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের মহাভারত ব্যাস-ভারতের আদর্শে সংস্কৃত করিয়া বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবীন্দ্রের "বিজয় পাণ্ডব কথা" রূপান্তরিত হইয়া দুই এক স্থানে বিজয় পণ্ডিতে পরিণত হইয়াছে, নতুবা প্রায় সর্ব্বত্রই কবীন্দ্রের ভণিতার অনুকরণই লক্ষিত হয়।

এই তিনজন কবি লইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।[১] কাহারও মতে কবীন্দ্রের মহাভারই বিজয়ের নামে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর মতে বিজয়ের ভারতই কবীন্দ্রের গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। এই ধারণা যে সঙ্গত নয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। আবার কাহারও মতে সঞ্জয়েয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সঞ্জয়ের আদর্শ যে সংক্ষিপ্ত হইয়া কবীন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সঞ্জয়ের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এই সকল মত-বিরোধের মূলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ ঘটিত ঝগড়ার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের দীনেশবাবু সঞ্জয়, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের আদি রচয়িতা রূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন, আর পশ্চিম বঙ্গের নগেন্দ্রবাবু সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনার সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও বিজয়ের গ্রন্থকে কবীন্দ্রের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমিও পূর্ব্ববঙ্গবাসী, অতএব এই বিষয়ে

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩, ২৪, ৩৪, ৩৫ সংখ্যা; সাহিত্য, ১৩০২, ১৩০৯ সাল, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত কবীন্দ্র ভারতের ভূমিকা, নগেন্দ্রবাবু সম্পাদিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কোন কথা বলিতে আমার স্বভাবতই সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তথাপি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে কিছু বলিতে হইতেছে। ভাগীরথীতীরের আধুনিক সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সমৃদ্ধি পীড়াদায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, যে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এখন তাঁহারা গৌরব অনুভব করেন, সেই "বঙ্গ" শব্দে পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইত? পরে এই সংজ্ঞায় সমগ্র প্রদেশটি পরিচিত হইতেছে। তারপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবের পিতাই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া নবদ্বীপে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। অদ্বৈতপ্রভু ও কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষেরাও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অধিকাংশ বৈষ্ণবই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইতিহাসের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হয়। মুসলমানগণের আগমনের পরে সেনবংশীয় রাজগণ বহুদিন পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে তাঁহাদের আশ্রয়েই হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষিত হইয়াছিল, এই ধারণাই যুক্তিসঙ্গত। পরে যখন নবদ্বীপ পুনরায় বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হয়, অথবা পূর্ব্ববঙ্গেও "প্রমাদ" উপস্থিত হয়, তখন ঐ স্থান হইতে অনেকে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য, অথবা ঐ "প্রমাদ" এড়াইবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতেই সেই সময়কার নবদ্বীপের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তারপর ইংরাজ রাজত্বে কলিকাতায় রাজধানী স্থাপিত হয়। যেখানে পূর্ব্বে "রাতে মশা ও দিনে মাছির" উৎপাতে লোকে অস্থির হইয়া উঠিত, সেখানে পাশ্চাত্য আদর্শে নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আর ইহারই আকর্ষণে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গজ কায়স্থ প্রতাপাদিত্যের দেশ হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইভাবে অর্ব্বাচীন ভাগীরথীতীরের সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন পূর্ব্ববঙ্গের প্রাধান্য ছিল, তখন পূর্ব্ববঙ্গের ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত। এখন "করিমু" "যাইমু" "খাইমু" প্রভৃতি অপ্রচলিত

হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে ইহাদের অবাধ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ বর্ত্তমানে ভাগীরথীতীরের সভ্যতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উড়িয়া "যাউছি" "খাউছি"র সমপর্য্যায়ভুক্ত যাচ্ছি, খাচ্ছি এখন সাহিত্যে চলিয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃতির কেন্দ্রের পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যের ভাষার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। যাহাই হউক, দীনেশবাবুর সিদ্ধান্ত ভাগীরথীতীরের আধুনিক সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে যে আনন্দদায়ক হয় নাই তাহা নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কবীন্দ্রের মহাভারত সম্পাদিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, কবীন্দ্র কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন, এবং তিনি প্রায় ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অথচ কবীন্দ্রের ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, হোসেন সাহের সেনাপতি পরাগলের আদেশে কবীন্দ্র গ্রন্থ রচনা করেন। হোসেন সাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩—১৫১৮ খৃষ্টাব্দ। অতএব এই সময়ের মধ্যেই কবীন্দ্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এই ধারণাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ গ্রন্থমধ্যে পরাগলকে হোসেনের সেনাপতি রূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে কবি যে কোচবিহারের রাজার মন্ত্রী ছিলেন এই উক্তির সার্থকতা কি? এইভাবে ইহার সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে। মনে করুণ ২৫ বৎসর বয়সের সময়ে প্রায় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কবীন্দ্র মহাভারত রচনা করেন। তৎপর পরাগলের পতনের পরে দীর্ঘ জীবনলাভ করা হেতু কবীন্দ্রের নরনারায়ণের মন্ত্রী হওয়া অসম্ভব নহে, কারণ তখন (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হয়। হয়ত এই মন্ত্রীত্ব করিবার কালে তিনি গৌরীপুর অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর এই জন্যই "গৌরীপুর রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ" হওয়াও কবীন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব হয়না। অতএব গৌরীনাথ শাস্ত্রী-লিখিত

বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। তথাপি ইহাতে তাঁহাকে উত্তরবঙ্গের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ণ-হিন্দুগণের পরিচয় লইলে জানা যায় যে, তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া বর্ত্তমান বাসস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কবীন্দ্রও হয়তঃ প্রথম জীবনে অন্যস্থান হইতে (ইহা পশ্চিমবঙ্গও হইতে পারে—আশা করি ইহাতে ভাগীরথী তীরের সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণ পরিতৃপ্ত হইবেন) আসিয়া চট্টগ্রামের নিকটে বিষয়কর্ম্মের জন্য কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, পরে তথা হইতে পুনরায় নরনারায়ণের মন্ত্রিত্ব লইয়া গৌরীপুরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, পূর্ব্ববঙ্গেই এই কবীন্দ্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, উত্তরবঙ্গে নহে। পরে এই গ্রন্থ কেবল চট্টগ্রাম অঞ্চলে নহে, ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া, কোচবিহার, রঙ্গপুর, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, এমন কি (নগেন্দ্র বাবুর মতে) বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরেও প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সঞ্জয়ের গ্রন্থ বঙ্গের সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, যদিও উভয়ের গ্রন্থই এক আদর্শে রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সঞ্জয় বোধ হয় কবীন্দ্রের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। অথবা কবীন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ভারত রচিত হইবার পরে রাজানুগ্রহে রচিত বলিয়া কবীন্দ্রের ভারতই প্রাচীনতম সঞ্জয়ের ভারতের প্রচার সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এই ভাবেই জৈমিনি-ভারত ব্যাস-ভারত কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছে, আবার জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্ব ব্যাসের অশ্বমেধ পর্ব্বকে বিতাড়িত করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

সঞ্জয়ের গ্রন্থই প্রাচীনতম, এবং কবীন্দ্র যে ইহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বানরের উপাখ্যান সম্বন্ধে সঞ্জয় লিখিয়াছেন—

ইক্ষ্বাকুকুলেতে জন্ম রাজা মহাভীষ।
দানধর্ম্ম শতকর্ম্ম করেন্ত বিশেষ॥

সহস্র অশ্বমেধ কৈল রাজসূয় শত।
তাই স্বর্ণরথে চড়ি গেল স্বর্গ-পথ॥
মনুষ্য হইয়া রাজা দেবলোকে বৈসে।
নিত্য নিত্য গিয়া রাজা ব্রহ্মাকে সম্ভাসে॥
একদিন দেবসভা ব্রহ্মার সদন।
সভা করি বসিলেক যত দেবগণ॥
গঙ্গা দুর্গা বসিয়াছে লক্ষ্মী সরস্বতী।
সেই সভাতে আছেন ভীষণ নরপতি॥
হেনকালে আইল তথায় প্রচণ্ড পবন।
জাহ্নবীর উরু হইতে উড়াইল বসন॥
বিবস্ত্র দেখিয়া গঙ্গা বড় পাইল লাজ।
লাজে হেট মাথা কৈল দেবের সমাজ॥
মহাভীষ নরপতি একদৃষ্টে চাহে।
তাহা দেখি ক্রোধ করি বলিলা ব্রহ্মাএ॥
নিশঙ্কে চাহসি গঙ্গা লজ্জা না ভাবিয়া।
এই পাপে মর্ত্ত্যে যাও মনুষ্য হইয়া॥
উলটি চাহিয়া গঙ্গা ক্রোধে দিলা শাপ।
পশু হইয়া পৃথিবীতে জন্ম মহাপাপ॥
সাপ পাইয়া মহারাজা দুঃখ ভাবি মন।
করযোড়ে ব্রহ্মা-স্থানে বলিলা বচন॥
কোথাতে যাইব আমি জন্ম কার ঘর।
এই আজ্ঞা কর মোরে জগৎ ঈশ্বর॥
ব্রহ্মা বলে জ্ঞানহীন শুনরে বর্ব্বর।
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হইয়া বানর॥
তার পাছে জন্মিবা গিয়া হস্তিনাপুরী গ্রাম

প্রদীপ রাজার ঘরে শান্তনু হৈব নাম ॥
মৃত্যুকল্প হইয়া রাজা চলি গেলা ঘর ।
পশুরূপ হইয়া তবে জন্মিলা বানর ॥
মহাভারতের কথা নানা রসমএ ।
লোক-তরিবার হেতু কহিলা সঞ্জএ ॥

কিন্তু কবীন্দ্রের গ্রন্থে মহাভীষণ রাজার এই আখ্যায়িকা সম্পূর্ণই বাদ দিয়া সংক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ—

এ বোলিয়া মুনিগণ হলো অন্তর্ধ্যান ।
জয়মুনী কহন্ত কথা রাজা বিগুমান ॥
আদিপর্ব্ব কহিব বংশের উতপতি ।
মহীনামক রাজা ছিল পূর্ব্বে কপিপতি ॥
এক ব্রত জিতেন্দ্রিয় শঙ্কর ভকতি ।
শঙ্করে আছয়ে বড় পরম পিরীতি ॥
ভকত-বৎসল বীর ত্রিদশ-ঈশ্বর ।
তুষ্ট হইয়া বলে কপি তুমি মাগ বর ॥
বড় তুষ্ট হইয়াছি তোমা ভক্তি লাগি ।
মনের বাঞ্ছিত বর মোতে লও মাগি ॥
সত্য সত্য বুলি আহ্মি নাহিক সংশয় ।
যেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে কপি নামে মহী ।
অতি ভয়ে কহিলেক শুন হর কহি ॥
আপনে হইয়া তুষ্ট দিতে চাহ বর ।
মনের অভীষ্ট-কহিতে বাসি ডর ॥
শুন হর মনের মোর যে অভীষ্ট ।
কহিতে অসভ্য কথা শুনিতে গরিষ্ঠ ॥

শঙ্করে বোলন্ত তুমি ভয় পরিহর।
মনের বাঞ্ছিত যেই মাগি লও বর॥
পাইয়া অভয় বাণী কহে কপিপতি।
সুরেশ্বরী গঙ্গারে অভীষ্ট মোর মতি॥
মহাদেব বোলে কপি আজু যাও ঘর।
কালিকা প্রভাতে তুমি যাইও গঙ্গাতীর॥
ইত্যাদি।

এখানে সঞ্জয়ের মহাভীষ রাজা মহীনামক বানরে পরিণত হইয়াছে, অথচ এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে স্বর্গের ঘটনা রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই। তথাপি উভয়ের রচনা-সাদৃশ্য প্রদর্শন করিবার জন্য সঞ্জয়-ভারত হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

উলুক বানরকুলে মহারাজ হরি।
একমনে চিন্তে হরি পূজে হর-গৌরী॥
কঠোর তপস্যা করি আরাধিল হর।
ভকতবৎসল দেব দিতে আইলা বর॥
বড় তুষ্ট হইল আমি তোমার ভক্তি লাগি।
মনের অভীষ্ট বর তুমি লও মাগি॥
সকল কহিল আমি নাহিক সংশএ।
জেই বর চাহ দিব নাহি কর ভএ॥
শুনিয়া হরের বাক্য কপিরাজ হরি।
অতি ভয় করি বোলে করযোড় করি॥
যদি মোরে বর দিবা মনের বাঞ্ছিত।
সুরেশ্বরী গঙ্গারে আবিষ্ট মোর চিত॥
শঙ্কর বোলেন হরি তোরে দিলাম বর॥
কালি আসি গঙ্গা তুমি লয়া যাও ঘর॥

উভয়ের রচনা যে একই ছাঁচে ঢালা, ইহা পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী ঘটনা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—পরদিন প্রাতে গঙ্গাসহ শিব নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তিনি পবনকে স্মরণ করাতে পবন আসিয়া গঙ্গার বস্ত্র উড়াইয়া দিল। গঙ্গা লজ্জিত হইয়া দেখিলেন পিছনেই কপি রহিয়াছে। তখন হর বলিলেন—তোমার অঙ্গ এই কপি দেখিয়াছে বলিয়া আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি ইহার সহিত গমন কর। কপির সহিত যাইতে যাইতে গঙ্গা ভাবিলেন—কৌশলে ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইবে। তখন তিনি কপিকে বলিলেন—তোমার শরীর লোমশ, অতএব আমাদের মিলন হইতে পারে না। তুমি অগ্নিতে লোম দগ্ধ কর। কপি বলিল—অগ্নিতে প্রবেশ করিতে আমার ভয় হয়। গঙ্গা বলিলেন—আমার প্রভাবে তোমার অনিষ্ট হইবে না। পরীক্ষা করিবার জন্য কপি প্রথমে একটি অঙ্গুলি অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দেখিল যে, তাহা দগ্ধ হইতেছে না। ইহাতে সাহসী হইয়া সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে গঙ্গা আসিয়া শিবকে কপির মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন—তুমি কৌশলে আমাকে ভাড়াইতে আসিয়াছ। ঐ কপি প্রদীপের ঘরে শান্তনুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি যাইয়া তাঁহার পত্নীরূপে বার বৎসর অবস্থান করিয়া অষ্টবসুকে উদ্ধার কর। এখানেই ঘটনা-স্রোত ব্যাস-ভারতের দিকে ধাবিত হইয়াছে, আর এই আদর্শই অবলম্বন করিয়া বিজয়পণ্ডিতের ভারতে দেবচক্রের উল্লেখে শান্তনুর আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, জৈমিনি-ভারতের আদর্শে রচিত সঞ্জয়ের গ্রন্থই প্রাচীনতম, কবীন্দ্র ইহারই এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আর এই উভয় গ্রন্থই ব্যাস-ভারতের আদর্শে সংস্কৃত হইয়া বিজয়ের ভারতের সৃষ্টি করিয়াছে। বিজয়ের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থে সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনা-সাদৃশ্য দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহা দ্বারা অথবা

তাঁহার নামে এই সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। অধুনা যে সকল পুথি লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি তাহাদের প্রায় সকলই সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। অতএব কবিদের সময়ের বহু পরে তাহারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহারা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথির কথাই বলিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৫৫ সংখ্যক পুথি হইতে আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু ঐ পুথিতেই আছে—"বৈসম্পায়ন বোলে কর অবধান।" এবং অন্যত্র—"মুনি বোলে যুন তোমি (রাজা) পরীক্ষিত।" (ঐ, ১২৬ পৃঃ)। অথচ পুথির প্রথমেই লিখিত হইয়াছে যে, কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভের জন্য জন্মেজয় জৈমিনির নিকট মহাভারত শুনিতেছেন। অতএব এই ব্যাস-ভারত ও ভাগবতের অপূর্ব্ব সম্মিলন যে অজ্ঞ লেখকদিগের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কবিগণকে এই জন্য দায়ী করা যায় না। এই ভাবে আবর্জ্জনা ঘটিয়া প্রকৃত সত্যের উদ্ধার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এইভাবেই কাশীদাসের মহাভারতে অন্যের রচনা এবং সঞ্জয়-ভারতেও অন্য কবির ভণিতা দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের আদি রচনাও যে এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

মহাভিষ রাজার উপাখ্যান দেবীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও বর্ণিত রহিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, মহাভিষ রাজা বিগত বস্ত্রা গঙ্গার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাও তাঁহার প্রতি প্রণয় সহকারে চাহিয়াছিলেন। এজন্য ব্রহ্মা মহাভিষকে মর্ত্ত্যে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন, আর যেহেতু গঙ্গা মহাভিষকে প্রেমের চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি গঙ্গাকে মহাভিষের পত্নী হইবার নির্দ্দেশ দেন। এই আখ্যায়িকায় মহাদেবের কৌশল ও মহাভিষের বানর রূপে জন্মগ্রহণ করিবার প্রসঙ্গ নাই। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় যে, জৈমিনি ভারতের আদর্শই সংক্ষেপে দেবী ভাগবতে অনুসৃত হইয়া থাকিবে।

ইহার পরে এই গ্রন্থে শান্তনু, গঙ্গা, ভীষ্ম, ও মৎস্যগন্ধার উপাখ্যান লইয়া মহাভারতের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে মহাভিষ রাজার উপাখ্যানের প্রাচীনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব সঞ্জয়, কবীন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ কল্পনাবলে নূতন কিছু সৃষ্টি করেন নাই। জৈমিনিভারতের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া এই দেশে যে ধীরে ধীরে ব্যাসভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহার দৃষ্টান্ত সঞ্জয়-ভারতের উল্লেখ হইতে পাওয়া যায়। সঞ্জয়ের দাহপর্বে—

মুনি বোলে শুন বাপু সারদানন্দন।
দাহপর্ব্ব কথা কহি শুন বিবরণ॥
(বাপ্রাপুবি, ১।১, ৭৯ পৃঃ)

অতএব সারদার পুত্ররূপে এখানে জন্মেজয়কে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে জৈমিনিভারতের আদর্শই প্রতিফলিত রহিয়াছে। অনেক ভণিতাতেও জৈমিনির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

জয়মুনি কহন্ত রাজা কর অবধান।
এই পরে বনপর্ব্ব হইল সমাধান॥
(ঐ, ৯০ পৃঃ)

অন্যত্র— তার পরে জন্মেজয় জয়মুনিতে পুছে।
কহ শুনি মুনি গোসাঞি কিবা হইল শেষে॥
(ঐ, ৯১ পৃঃ)

কিন্তু যে বনপর্ব্বের ভণিতা উপরে উদ্ধৃত করা হইল তাহারই পরিসমাপ্তিতে রহিয়াছে—

এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কবিতা॥
সেই শ্লোক অতি যত্নে করিয়া পয়ার।
সঞ্জয়ে কহিল পাপী ভব-তরিবার॥ (ঐ, ৯০ পৃঃ)

অন্যত্র—

তবে বৈশম্পায়নে কহে শুন জন্মেজয়ে।
মহাপুণ্য সার কথা বিরাট পর্ব্বএ ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা শুনি জন্মেজয়।
ব্যাস-উপদেশ জাহা কহিল সঞ্জয় ॥

(ঐ, ৯০ পৃঃ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জৈমিনির আদর্শে রচিত সঞ্জয়ের মহাভারতকে বৈশম্পায়ন ও ব্যাসদেবের উল্লেখে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছিল। এখানে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনসূচক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। আবার একই গ্রন্থে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, গঙ্গাদাস সেন, কবিচন্দ্র দাস প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়। (বাপ্রাপুবি, ১।১, পৃঃ ১৭২)। ইহা পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণের অপকীর্ত্তি। বাইশ কবির মনসার পুথির ন্যায় অনেক কবির রচনা একই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমানকালের "চয়নিকা" জাতীয় গ্রন্থ মাত্র।

সঞ্জয়ের নামে প্রচারিত "ভারতসাবিত্রী" ও "ভগবদ্গীতানুবাদ" গ্রন্থদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায় (বাপ্রাপুবি, ১।১, পৃঃ—১৭৪—৫)। ভগবদ্গীতানুবাদ পুথির বন্দনাংশে আছে—

গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে (?) রাধাকান্ত নমস্তোতে ॥

খেতুরীর উৎসবে প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহ সকলের বন্দনায় মনে হয় যে, পুথিলেখক চৈতন্য পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা সঞ্জয়ের বন্দনা নহে।

শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্ব্ব

শ্রীকরনন্দীকে মহাভারত রচনার আদিযুগের শেষ কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আদর্শে রচিত বিজয়ের গ্রন্থ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, অতএব তিনি অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৬৭ সংখ্যক পুথিতে সঞ্জয়ের অশ্বমেধ পর্ব্বের যে অনুলিপি রহিয়াছে তাহাতে নীলধ্বজের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধের বিবরণাদি বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই পর্ব্বটিও যে জৈমিনির আদর্শে রচিত হইয়াছিল তাহার ধারণা করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রও যে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকর নন্দীর উল্লেখ হইতেই জানিতে পারা যায়, যথা—

অশ্বমেধ পর্ব্ব যত তন্ত্রের সার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥

(মুদ্রিত গ্রন্থ, ১৪০ পৃঃ)

অতএব নন্দী কবি অশ্বমেধপর্ব্বের তৃতীয় অনুবাদক। সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনায় যাহার প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছিল, শ্রীকরনন্দীর গ্রন্থ তাহারই পূর্ণতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, পরাগলের পুত্র ছুটিখান—

একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥

অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥১
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার ;
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগৎ সংসার ॥
তাহার আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া ॥

(ঐ, ৪ পৃঃ)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ছুটি খানের সভায় জৈমিনি-সংহিতা পঠিত হইত। কিন্তু প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ, না ইহার কোন অনুবাদ পাঠ করা হইত? টীকাটিপ্পনী সহ সংস্কৃত মহাভারত শুনিবার মত ধৈর্য্য ও অবসর এই পাঠান শাসনকর্ত্তার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ ইহার পূর্ব্বেই যখন অনুবাদের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ রচিত কোন অনুবাদ-গ্রন্থ পঠিত হইত বলিয়াই মনে হয়। ছুটিখানের পিতা পরাগলের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কবীন্দ্রের গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় কবীন্দ্রের রচনা অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া (পরে দ্রষ্টব্য) খান মহাশয়ের মনঃপুত হয় নাই, এইজন্য তিনি নন্দী-কবিকে

১। ইহার পরে কোন কোন পুথিতে নাকি নিম্নলিখিত দুই পঙক্তি পাওয়া যায়—

ব্যাসগীত ভারত শুনিল চারুতর।
যার হেতু জৈমিণিএ রচিল সকল ॥

পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন এই দুই পঙক্তি যে পরবর্ত্তী সংযোজনা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ছুটি খানের সভায় জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্বই পঠিত হইতেছিল, তাহা হইতে যে ব্যাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব "চারুতর" ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ পরবর্ত্তী সকল কবিই জৈমিনির আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ নন্দী কবির অশ্বমেধ পর্ব্বও যখন জৈমিনির আদর্শেই রচিত হইয়াছে, তখন তিনি যে চারুতর ব্যাসভারত রচনায় আদিষ্ট হইয়াছিলেন ইহাও বলা যাইতে পারে না। এই জন্য মনে হয়, এই গ্রন্থে ব্যাস-ভারতের আদর্শ আরোপিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন অজ্ঞ লেখক কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে এই দুই পঙক্তি সংযোজিত হইয়াছে।

পুনরায় ইহার অনুবাদ রচনা করিতে আদেশ প্রদান করেন। কবীন্দ্রের ভারতে যেমন তাঁহার পিতার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, শ্রীকর নন্দীর রচনাতেও তেমনি তাঁহার যশঃ জগতে প্রচারিত হইবে, ইহাই ছিল ছুটিখানের উদ্দেশ্য। তথাপি তিনি যে সমগ্র মহাভারত রচনা করিবার আদেশ প্রদান করেন নাই, তাহা উদ্ধৃত উল্লেখের "এহি কথা দেশীভাষায়" রচনা করিবার প্রসঙ্গ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র জৈমিনি সংহিতার মধ্যে অশ্বমেধ পর্ব্বটাই তাঁহার সভায় পঠিত হইতেছিল, ইহাই জানা যাইতেছে। তিনি কবিকে তাহাই রচনা করিবার আদেশ করেন, ইহাই উদ্ধৃত উল্লেখের মর্ম্মার্থ। কবীন্দ্রের অশ্বমেধপর্ব্ব কেবল ছুটিখানের নহে, পরবর্ত্তী অনেকেরই সন্তোষ বিধান করিতে পারে নাই, কারণ কবীন্দ্রের মহাভারতের অনেক পুঁথিতে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্ব্ব সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবীন্দ্র রচিত এই পর্ব্বটি অসম্পূর্ণ ছিল (পরে দ্রষ্টব্য), এই জন্যই পুনরায় ইহার অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকিবে।

পরাগল খান হোসেন সাহের সমসাময়িক। অতএব তাঁহার পুত্র ছুটিখানের আদেশে যে গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

শ্রীকর নন্দীর পক্ষে জৈমিনি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইবার কারণ রহিয়াছে। ছুটিখানের সভায় ঐ গ্রন্থই পঠিত হইত, এবং ইহার পূর্ব্বে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র ইহারই অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিমেন। পূর্ব্ববঙ্গে তখন জৈমিনি ভারতের প্রভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীকর নন্দীর পরে যাঁহারা অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও জৈমিনি-ভারতই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্যাসদেবের অশ্বমেধ-পর্ব্ব কাহারও মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারে নাই। কাশীরাম দাস ব্যাস-ভারতের অনুবাদ করিলেও অশ্বমেধ পর্ব্বটি জৈমিনি ভারতের আদর্শেই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা অপেক্ষাকৃত সরল হইলেও শ্রীকর

নন্দীর ন্যায় তিনি সর্ব্বতোভাবে জৈমিনিকে অনুসরণ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে চণ্ডীর আখ্যায়িকা লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

উদ্দালক মুনির সহিত চণ্ডীর বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহকালে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক "সর্ব্বদা স্বামীর কার্য্য করিও" এইরূপ উপদেশের উত্তরে চণ্ডী বলিয়াছিলেন—"আমি কখনও স্বামীর কার্য্য করিব না" ইহার পরে উদ্দালক যাহা বলিতেন, চণ্ডী তাহারই বিপরীত কার্য্য করিতেন। ইহাতে উদ্দালক বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন কৌণ্ডিন্য মুনি তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিষাদের কারণ অবগত হইলেন। ইহার প্রতীকারকল্পে তিনি উদ্দালককে বলিলেন—"তুমি যাহা করাইতে অভিলাষ কর, চণ্ডীকে তাহা করিতে নিষেধ করিও। তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদিত হইবে।" এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া উদ্দালক দেখিলেন যে, চণ্ডীর দ্বারা সহজেই ইপ্সিত কার্য্য করান যাইতে পারে। একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে তিনি ভ্রমবশতঃ পিণ্ডসকল গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য চণ্ডীকে বলিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া চণ্ডী তাহা গোময় কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তিনি চণ্ডীকে পাষাণ হইবার অভিশাপ প্রদান করেন, এবং অর্জ্জুনের স্পর্শে তাঁহার মুক্তি হইবে, ইহাও ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাই জৈমিনিভারত-বর্ণিত চণ্ডীর আখ্যায়িকা। শ্রীকর নন্দী মূলের অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসের মহাভারতে আছে যে, কৌণ্ডিন্য আসিয়া উদ্দালককে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

পিতৃশ্রাদ্ধ আসি এবে হৈল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী, মনে হই ভীত ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন, শ্রাদ্ধ করিবে প্রভাতে।
দেখি চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে ॥

রাত্রি গতে উদ্দালক প্রত্যুষ বিহানে।
জিজ্ঞাসিল চণ্ডীরে মুনির বিষ্ময়মানে ॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ শুনহ বচন।
চণ্ডিকা বলিল, শ্রাদ্ধ নাহি প্রয়োজন ॥
তাহা শুনি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
লোচন আরক্ত করি চণ্ডীকে কহিল ॥
স্বামীর বচন পাপী নাহি শুন কাণে।
শিলারূপা হও গিয়া আমার বচনে।

(উদ্ভটসাগর সং, ১৩৭৫ পৃঃ)

এখানে দেখা যায় যে, কৌণ্ডিন্যের শাপে চণ্ডী শিলাতে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা কাশীরাম দাসের স্বীয় কল্পনা-প্রসূত। জৈমিনি-ভারতে ইহার উল্লেখ নাই। এইরূপে তুলনা করিলে শ্রীকর নন্দীর রচনাই মূলের অনুরূপ হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। কবি ভণিতাতেও ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা—

শ্রীকর নন্দী কহে বিচারিআ পোতা।
কহিল জেহেন ছিল জয়মুনি গাথা ॥

(মুদ্রিত সং ৪৬ পৃঃ)

অন্যত্র—

শ্রীকরনন্দিএ কহে দেখিয়া সংহিতা।
জয়মুনি কহিলেক ভারতের কথা ॥

(ঐ, ২৪ পৃঃ)

কবির ভাষায় 'আহ্মি', 'তুহ্মি', 'কেহ্নে' 'জিজ্ঞাসন্ত', বোলন্ত, প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাচীনত্বের নিদর্শন। মাইকেলের ন্যায় তিনিও এই গ্রন্থে অনেক নামধাতুর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। নাদিলা, আরম্ভিলা,

আন্ধারিলা, শাস্তাইল প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। (মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। স্থানে স্থানে কবি রচনা-কৌশলেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

শান্ত দান্ত বলবন্ত অতিশয় পুণ্যবন্ত
কৃষ্ণ জার দ্বিতীয় শরীর।
হাতেত গাণ্ডীব ধনু কবচে জড়িত তনু
সাজে ধনঞ্জয় মহাবীর॥
অঙ্গরাগ পরিমল তনু অতি সুবিমল
দিব্য সর প্রভাবে মণ্ডিত।
কিরীটি-মণ্ডিত শির তনু অতি সুরুচির
দিব্য মণিরত্নে বিভূষিত॥ ইত্যাদি—

মুদ্রিত সং, পৃঃ ৪৭

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, কবীন্দ্র রচিত মহাভারতের ঋণ কবি স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যথা—

শ্রীচরণ বন্দিয়া অশ্বমেধ সমর্পিয়া।
শেষ কহি কবীন্দ্র কৃত সব বিরচিয়া॥
অশ্বমেধ শেষ আছিল যে কথন।
কবীন্দ্র রচিত গাথা লিখিত কারণ॥ (ঐ, ১৩৯ পৃঃ)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জৈমিনির সমগ্র অশ্বমেধপর্ব্ব কবীন্দ্র অনুবাদ করেন নাই। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা রচনা করিয়া নন্দী কবি ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন। আর এই উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ছুটি খানের সভায় কবীন্দ্রের মহাভারতই পঠিত হইত, সংস্কৃত মহাভারত নহে, আর এই অসম্পূর্ণ ভারতই সম্পূর্ণ করিবার জন্য ছুটি খান আদেশ করিয়া থাকিবেন।

অধুনা কেহ কেহ শ্রীকরনন্দীকে সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা রূপে কল্পনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু নন্দী কবির গ্রন্থেই রহিয়াছে—

অশ্বমেধ-কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী-ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।

অতএব একমাত্র অশ্বমেধপর্ব্ব রচনা করিবার আদেশই নন্দীকবি লাভ করিয়াছিলেন, আর গ্রন্থশেষেও দেখা যায় যে, তিনি, কবীন্দ্রের অসম্পূর্ণ অংশই সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই জন্যই কবীন্দ্রের অশ্বমেধপর্ব্ব অপেক্ষা নন্দী কবির অশ্বমেধপর্ব্ব বৃহৎ হইয়াছে। ইহা বড় হইয়াছে বলিয়া ইহা বলা চলে না যে—"শ্রীকর নন্দীও পুরা ভারত পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন," কারণ নন্দী কবির নিজের উক্তিতেই ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হয় (উদ্ধৃত উল্লেখ দ্রষ্টব্য)। অন্যত্র—"কবীন্দ্র জৈমিনি-ভারত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর শ্রীকর সঞ্জয় (বা বৈশাম্পায়ন) ভারত অবলম্বন করিয়াছিলেন।" দিনে ডাকাতীর কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, এখানে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল। নন্দী কবির গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, ইহা জৈমিনি-ভারতেরই আদর্শে রচিত হইয়াছে। ছুটিখানের সভায় কবীন্দ্রের অশ্বমেধ-পর্ব্বই পঠিত হইত, এবং তাহাই সম্পূর্ণ করিবার জন্য নন্দীকবি আদিষ্ট হইয়াছিলেন, আর গ্রন্থশেষেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে কবীন্দ্রের অশ্বমেধ পর্ব্বটিই মাত্র তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহা দ্বারা সমগ্র মহাভারত রচনার পরিকল্পনা যুক্তিহীন নহে কি? আর বৈশম্পায়ন-ভারত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহাও সেইরূপ যুক্তিহীন, কারণ গ্রন্থ রহিয়াছে জৈমিনি-ভারতের, ইহাকে কোন্ যুক্তিবলে যে ব্যাসভারত বলা যাইতে পারে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। কিন্তু পাঠান্তরে রহিয়াছে—"ব্যাসগীত ভারত শুনিল চারুতর।" ব্যাসের অশ্বমেধপর্ব্ব যে জৈমিনির

অশ্বমেধপর্ব্ব অপেক্ষা চারুতর নহে, তাহা পরবর্ত্তী ভাষা-মহাভারত রচয়িতৃ-গণের সাক্ষ্য হইতে, এবং উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই পাঠান্তর হইতে বুঝা যায় যে পরবর্ত্তীকালে শ্রীকরনন্দীর গ্রন্থকেও ব্যাস-ভারতের অনুবাদরূপে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহা আমগাছকে কাঁঠাল গাছ রূপে পরিচিত করিবার প্রচেষ্টার ন্যায় হাস্যকর। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সমালোচকগণ এই ফাঁকিতেই ধরা দেন! অথবা ইহা উদ্দেশ্য-মূলক। দীনেশবাবু সঞ্জয়কে মহাভারতের আদি রচয়িতা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে কিছু না বলিলে নূতন গ্রন্থ রচনার সার্থকতা কি?

সারলা দাসের বিরাটপর্ব্ব

উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে (১৪৩৫-১৪৬৯ খ্রীঃ) সারলা দাস উড়িয়া ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন অতএব এই গ্রন্থ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। "সারলা দাস" কবির ব্যক্তিগত নাম নহে। ইনি সারলা চণ্ডীর উপাসনা করিতেন বলিয়া উক্ত নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার একটি ভণিতায় পাওয়া যায়—

ঝঙ্গের পুরবাসিনী হিঙ্গুলা চণ্ডী সারোলে।
সে মোর তুলসী-মাল হেলে বক্ষস্থলে॥

কবি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য "শূদ্রমুনি" রূপেও নিজেকে পরিচিত করিয়াছেন। (Typical Selection from Oriya Literature, Vol I, Introduction p.p. XXVII—VIII)।

সারলা দাসের ভনিতায় বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বিরাটপর্ব্বের এক গ্রন্থ এদেশে প্রচারিত রহিয়াছে। ইহাতে সারলা দাসকে উৎকল-ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, যথা—

মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
শ্লোকছন্দে রচিলেন উৎকল ব্রাহ্মণ॥ (কঃ বিঃ, ২৪৪২ সং পুথি)

এই গ্রন্থের আংশিক বিবরণ বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের ৭১৭-৭২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ভণিতার নির্দ্দেশানুযায়ী কবিকে উৎকল দেশীয় বলিয়াই ভ্রম হয়, কিন্তু গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এ দেশীয় কোন অজ্ঞাতনামা কবি সারলা দাসের ভণিতায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ উৎকল কবির গ্রন্থে বৈবস্বত মনুর প্রশ্নে অগস্ত মুনি মহাভারতের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছিলেন, যথা—

বৈবস্বত মনু পুছা কলে অগস্তিঙ্কি।
কহ হে মহাপণ্ডিত দিব্যরস ছাঙ্কি॥ ইত্যাদি
(উৎকলী মহাভারত, ৪ পৃঃ)

কিন্তু বাঙ্গালা মহাভারতে বক্তা বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা জন্মেজয়। অতএব এই উভয় গ্রন্থ একই আদর্শে রচিত হয় নাই, এবং এক গ্রন্থ অপর গ্রন্থের অনুবাদও নহে।

দ্বিতীয়তঃ উভয় গ্রন্থে ভণিতার ধারা একই প্রকার নহে, যথা—

সারলা দাস কহই পূছমো মানস।
বদয়ন্তি শূদ্রমুনি শারলাঙ্ক দাস॥

এবং—শূদ্রমুনি শারলাঙ্ক মুক্তিপথ দেব। ইত্যাদি

(উৎকলী ভারতে)

আর—সারদা ভাবিয়া সারল কবি ভণে।
রচিল ভারথ-কথা উৎকল ব্রাহ্মণে॥

(বাঙ্গলা ভারতে)

তৃতীয়তঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে উৎকলদেশীয় কবি বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়া যে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

চতুর্থতঃ উভয় গ্রন্থের রচনাতেও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। বিরাটের সভায় যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইলে বিরাটরাজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

কহছন্তি ধর্ম্মসুত শুন মৎস্য রায়ে॥
যাহা পচারিল তাহা শুন হে নৃপতি।
পশ্চিম সৌরাষ্ট্রকুঞ্জ গল চক্রবর্ত্তী॥
চন্দ্র গোত্রে ধর্ম্মদাস পণ্ডা আন্ত পিতা।
ভোজনন্দিনী অটন্তি আন্ত নিজ মাতা॥

(উৎকলী ভারত)

কিন্তু—শুনিয়ে রাজার বোল ধর্ম্মের নন্দন।
কহিতে লাগিলা তবে জাতিএ ব্রাহ্মণ॥
বৈয়াগ্র (বৈয়াঘ্র্য) আমার গোত্র কঙ্ক ধরি নাম।
দ্যূতেতে নিপুণ আমি অতি অনুপাম॥
(বাঙ্গালা মহাভারত)

তুলনীয়—বৈয়াঘ্র্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি।
(কাশীদাসী মহাভারত)

এই সকল কারণে মনে হয় যে, বাঙ্গালা মহাভারত সারল কবির নামে অন্য কেহ রচনা করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় চৈতন্যদেবের পুরী গমনের পরে উৎকলী ভারত কোন বাঙ্গালী কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। পরে সারলার নামে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সারল কবি-রচিত নরমেধ-যজ্ঞের একখানি পুঁথিও পাওয়া যাইতেছে (ব-সা-প-পুথি, সং ১২৫০)। ভণিতা এইরূপ—

সারদার পদরজ বন্দিয়া মাথায়।
শ্রীমহাভারত যে সারল কবি গায়॥
(ঐ, পৃঃ ১০)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই পালা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু জন্মেজয়ের প্রশ্নে এই আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। সারলের মহাভারতের শ্রোতা বৈবস্বত মনু, অতএব মূল গ্রন্থের সহিত ইহার আদর্শগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। আবার এই কবির ভণিতায় রচিত বাঙ্গালা মহাভারতে জন্মেজয় শ্রোতা, এবং বক্তা বৈশম্পায়ন। অতএব এই নরমেধযজ্ঞ এবং সারলের মহাভারত একই কল্পনার বিষয়ীভূত বলিয়া মনে হয়।

যযাতির পিতা নহুষ ব্রহ্মশাপে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতীকার কল্পে বশিষ্ঠের পরামর্শে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ঋতুধ্বজ নামক

এক ব্রাহ্মণ কুমারকে বলিদানের নিমিত্ত ক্রয় করা হইয়াছিল। বলির পূর্ব্বে ভগবান আসিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

ব্রাহ্মণ আমার তনু বিদিত জগতে।
কোন্ শাস্ত্রে লেখিয়াছে ব্রাহ্মণে পোড়াতে॥
মুনিগণ বলে প্রভু শোন গোবিন্দাই।
ব্রাহ্মণ পোড়াতে কোন শাস্ত্রে লেখে নাই॥
তব দরশনে প্রভু সর্ব্ব পাপ হরে।
দিয়াছি এমন বিধি তোমা দেখিবারে॥

যাহাই হউক, নারায়ণ দর্শনে নহুষ ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় "নরমেধযজ্ঞ" নামক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দৈবকীনন্দনের কর্ণপর্ব্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮০৭ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের এক অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। ভণিতা এইরূপ—

রাধাকান্ত চরণ ভাবি নিরন্তর।
কর্ণপর্ব্ব বিরচিল দৈবকী কোঙর॥

(ঐ, ১৮ পৃঃ)

অন্যত্র—কর্ণপর্ব্ব গাইল গীত দৈবকীনন্দন।

(ঐ, ৬৬ পৃঃ)

ভণিতায় রাধাকান্তের উল্লেখ হইতে কবিকে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হয়। পদকর্ত্তা দৈবকীনন্দনের "বৈষ্ণববন্দনা" বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইঁহার নাম ছিল "চাপাল গোপাল"। শ্রীবাসের গৃহদ্বারে ভবানী-পূজার দ্রব্য নিক্ষেপ করাতে ইনি কুষ্ঠব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া-

ছিলেন, পরে সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি ব্যাধিমুক্ত হন (পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, ১২৩-৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কর্ণপর্ব্বের কবিকেও ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া জানা যাইতেছে, কিন্তু ইঁহারা অভিন্ন কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

কবি বৈশম্পায়নের মুখেই জন্মেজয়কে মহাভারত শুনাইয়াছেন। অতএব ব্যাস-ভারতই তিনি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে কর্ণ ত্যাগে ও বীরত্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। কুন্তীদেবীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকাতে তিনি নকুলকে পরাজিত করিয়াও বধ-সাধনে বিরত হইয়াছিলেন। দৈবকীনন্দন ইহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

কর্ণ বলে নকুল তুমারে কহি সার।
তোমাকে মারিতে মোর নাহিক বিচার॥
মনে মনে চিন্তে কর্ণ পূর্ব্ব বিবরণ।
কহিয়াছি কুন্তী মাকে অভয় বচন॥
এ সত্য কেমনে আমি করিব লঙ্ঘন।
বিসেসে মাএর বাক্য মহাগুরুজন॥ ইত্যাদি (ঐ, ১৭ পত্র)

নখে বুক বিদীর্ণ করিয়া ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিলেন—

এত বলি বজ্রনখে করেন তাড়ন॥
রক্ত পান করে ভীম বুক বিদারিআ।
কৃষ্ণার মানস হেতু অঞ্জলি করিআ। (ঐ, ৪৬ পৃঃ)

কিন্তু সংস্কৃত মহাভারত অনুসরণ করিয়া কাশীদাস খড়্গের উল্লেখ করিয়াছিলেন—

খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
বেগে রক্ত উঠে প্রস্রবণের সমান।
মহানন্দে ভীমসেন তাহা করে পান॥

দ্বিজ অভিরামের অশ্বমেধপর্ব্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩০৪ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, কবি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কারণ গ্রন্থের প্রারম্ভেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভৃতির বন্দনা রহিয়াছে, যথা—

জয় গোরাচান্দ বন্দো শচীর তনয়।
জাহা হৈতে হৈল প্রেমভক্তির উদয়॥ ইত্যাদি

কবি রামানন্দকেও বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—

হরিদাস শ্রীনিবাস রায় রামানন্দ।
গুপ্ত মুরারি বন্দো শ্রীধর মুকুন্দ॥

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপদের পূর্ব্বে কবি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। অতএব অভিরাম শ্রীকরনন্দীর পরবর্ত্তী কালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।১

জৈমিনি ভারতের আদর্শে কবি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। কবির রচনা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই হিসাবে তিনি অনুবাদে শ্রীকর নন্দী অপেক্ষা কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যজ্ঞাশ্বের বর্ণনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

ইন্দু কুন্দ জিনি বর্ণ পীত পুচ্ছ শ্যাম কর্ণ
পবন জিনিঞা মন্দগতি॥

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে অভিরামকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (ঐ, ৬২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চৈতন্য ও রামানন্দের মিলন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে হইয়াছিল, তৎপর রামানন্দ বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কবিকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে স্থাপন করা যায় না।

রাতা চারি খুর শোভা তাম্র অধর আভা
নীল রুচি নয়ন চঞ্চল।
সুরাসুর বিদ্যাধরে তুরঙ্গ রাখিতে নারে
বেগ-বায় কাঁপে ভূমণ্ডল ॥ ইত্যাদি
(ঐ, পৃঃ ৪)।

তুলনীয়—

ইন্দুকুন্দ সোমবর্ণ যজ্ঞ-অশ্ববর।
পীতপুচ্ছ দীর্ঘকর্ণ পরম সুন্দর ॥
অথবা শ্যামল বর্ণ হৃষ্টপুষ্ট অতি।
যজ্ঞের ঘোড়ার এহি কহিলু সংগতি ॥
(শ্রীকরনন্দীর গ্রন্থ, পৃঃ ৭)।

রঘুনাথের অশ্বমেধপর্ব্ব

এই গ্রন্থের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে (ব-সা-প-পত্রিকা ১৩০৫ সাল, ১৩৮-১৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবির বাড়ী কোথায় ছিল তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু তিনি উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সভায় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানগণ কর্ত্তৃক মুকুন্দদেব রাজ্যচ্যুত হন। এই গ্রন্থে সেই ঘটনারও উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব জানিতে পারা যাইতেছে যে, ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রন্থের আরম্ভ, এবং ইহার পরে পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। কবি লিখিয়াছেন—

অশ্বমেধ পুণ্য-কথা অমৃত লহরী।
পিবও ভকতজন কর্ণঘট ভরি ॥
শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব নৃপ-শিরোমণি।
পরম বৈষ্ণব, দানে বলি-কর্ণ জিনি ॥

চিরদিন রাজ্য করি হৈল অকল্যাণ।
অশ্বমেধ-পর্ব্ব-কথা শ্রীরঘুনাথ ভাণ॥

(ঐ, ১৩৯ পৃঃ)

অন্যত্র—

শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি।
আইল তোমার দেশে গুণ শুনি অতি॥
চিরকাল রাজ্য কর উৎকল মাঝে।
পঞ্চালী রচিয়া আইলু তোমার সমাজে॥
অশ্বমেধ পাঞ্চালী সে করিঞা কৌতুকে।
আজ্ঞা দেহ আহ্মি পড়ি তুমার সভাতে॥
শুনিঞা বিপ্রের বোল রাজা হরষিতে।
আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পড়িতে॥

কাশীরাম দাস বিরাট-পর্ব্ব ১৬০৩।৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন (ব-সা-প-পত্রিকা, ১৩০৭ সাল দ্রষ্টব্য)। অতএব রঘুনাথ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। এই গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে. কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব্বের সহিত এই গ্রন্থের রচনা-সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহা হইলে রঘুনাথের রচনাই যে কাশীদাসের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। কিন্তু এই সাদৃশ্য সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না। কাশীদাস জৈমিনি-ভারতের অন্তর্গত শ্রীরামের অশ্বমেধ পর্ব্বের বিবরণ মাত্র দুই পঙক্তিতে শেষ করিয়াছেন, যথা—

লবকুশ-রামে যেন হইল সংগ্রাম।
তেমনি হইবে শুন রাজা গুণবান্॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১৪০০ পৃঃ)

কিন্তু রঘুনাথ জৈমিনি ভারত অনুসরণ করিয়া ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সীতা পঞ্চমাস গর্ভবতী, এমন সময় রাম

পঞ্চমাসে শ্রীরাম যে এ স্বপ্ন দেখিল।
গঙ্গাতীরে সীতা লৈঞা লক্ষ্মণ এড়িল॥
বশিষ্ঠকে স্বপ্ন রাম কহিল সকল।

ইহা শুনিয়া মুনি তাঁহাকে পুংসবন কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন

মুনির বচন শুনি রাম নরপতি।
লক্ষ্মণকে ডাক দিয়া বোলে শীঘ্রগতি॥
পঞ্চদিবসে আমি করি পুংসবন।
জনক রাজাকে আন করিঞা যতন॥
গুরু মোর বিশ্বামিত্র আনহ সত্বর।

তৎপর কার্য্য সমাপনান্তে—

জনক রাজার আর নাহিক তনয়।
দুহিতা জানকী, রাম জামাতা মহাশয়॥
এই কারণে নিজরাজ্য শ্রীরামকে দিল।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে রাজা তপোবনে চলিল॥
তপোবনে প্রবেশিল জনক নৃপতি॥
পাইল শ্বশুর দেশ রাম মহামতি॥

ইহার পরে এক চরের মুখে সীতার নিন্দা শুনিয়া রাম তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। এক রজকের স্ত্রী পিতৃগৃহে গমন করিয়া চারিদিন বাস করিয়াছিল। সে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রজক বলিয়াছিল—

নারী হৈঞা পর ঘরে থাকে এক রাতি।
পুরুষে কি করিতে পারে তাহার শকতি॥

তুমাক বর্জ্জিল আমি যাহ বাপ স্থানে।
রাম রাজা হেন আমি না চিন্তিহ মনে॥

ইহাই সীতার বনবাসের কারণ। তৎপর তপোবনে লবকুশের জন্ম ও যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত উল্লেখগুলিতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে, জৈমিনি-ভারতের ২৬শ অধ্যায়ে তাহা অবিকল সেইভাবেই বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি উক্ত গ্রন্থ যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ইহার নির্দ্দেশও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অশ্বমেধ পুণ্যকথা বিচিত্র শ্রবণ গাথা
মন দিয়া শুনে পুণ্যবান।
নাশ পায় পাপচয় পুণ্য হয় অতিশয়
জৈমিনি-সংহিতা-বচন॥

রামচন্দ্র খাঁর অশ্বমেধ পর্ব্ব

এই গ্রন্থের বিবরণ "প্রদীপ" পত্রিকায় (ঐ, ১৩০৯ সাল, ৩৮৪-৮৭ পৃঃ), এবং ইহার পূর্ব্বে সংক্ষেপে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (ঐ, ১৩০৬ সাল, ৬৫ পৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বঙ্গসাহিত্য পরিচয়েও ইহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৭৩৫-৭৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের পরিচয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

রাঢ়া দেশে বসতি আছয়ে পুণ্য স্থানে।
দণ্ডসিমলিয়া ডাঙ্গা সর্ব্বলোকে জানে॥
কায়েত কুলেতে জন্ম দণ্ডত পদ্ধতি।
কাশীনাথ জনক, জননী পুণ্যবতী॥

(প্রদীপ, ৩৮৪ পৃঃ)

ইহা হইতে জানা যায় যে, কবির বাস ছিল রাঢ়দেশের অন্তর্গত দণ্ড--সিমলিয়াতে। তিনি কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পদবী ছিল "দণ্ড" (সম্ভবতঃ দণ্ডী)। কবি নিজেকে কাশীনাথের পুত্ররূপে পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু মাতার নামের উল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে কেবল পুণ্যবতী বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে সাধ্য মৌলিকগণের মধ্যে দণ্ডী পদবীযুক্ত কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ৬০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবির খাঁ উপাধি দেখিয়া মনে হয় তিনি প্রতিপত্তি--শালী ছিলেন। তাঁহার বংশপদবী হইতেই বোধ হয় তাঁহার বাসগ্রাম দণ্ডসিমুলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

কবি বোধ হয় সংসারের অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, পরে গুরুর কৃপাতে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হয়। এই জন্য তিনি ভক্তির সহিত গুরুর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

যাহার কৃপাতে খণ্ডে ভব-অন্ধকার ॥
কঙ্কপাণি নামে আছে মধ্যরাঢ় দেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্ব্বকাল বৈসে ॥
গুরুর প্রসাদে মোর ধর্ম্মে হৈল মন।
অশ্বমেধ কথা কহ দমন শমন ॥
এই কথা শুনিতে ভাই পরমপদ পাই।
সংসারের যাতনা দুঃখ হেলাতে এড়াই।

(পত্রিকা, ৬৫ পৃঃ)।

অন্যত্র—

কঙ্কগ্রাম স্থান আছে মধ্যরাঢ়া দেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্ব্বকাল বৈসে ॥
সেহি গুরুর প্রসাদে ধর্ম্মেতে হয় মন।
অশ্বমেধ-কথা কহোঁ শমন-দমন ॥

(প্রদীপ, ২৮৫ পৃঃ)

এই দুই উল্লেখে কিছু পাঠ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। "কঙ্কপাণি নামে" স্থলে অপর পুথিতে "কঙ্কুগ্রাম স্থান" পাওয়া যাইতেছে। অথচ অন্যত্র কবি লিখিয়াছেন—

স্বদেশে বসতি ভাগীরথী স্থানে পুণ্যে।
জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে॥
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুসূদন জনক, জননী পুণ্যবতী॥
[গুরুর প্রসাদে মোর ধর্ম্মে] হৈল মন।
রামচন্দ্রখান কৈল কবিত্ব রচন॥

(পত্রিকা, ৬৫ পৃঃ)

এখানে কবির গুরু যে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী জঙ্গীপুর সহরে বাস করিতেন তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তাহা হইলে "কঙ্কুগ্রাম" সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অপর উল্লেখে "কঙ্কপাণি" রহিয়াছে। বোধ হয় জঙ্গিপুর সহরের নিকটে কঙ্কু গ্রাম অবস্থিত ছিল। যাহাই হউক, কবির গুরু ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহার লস্কর পদবী ছিল। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন, মাতার নাম অজ্ঞাত। কবি তাঁহাকে পুণ্যবতী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ধৃত উল্লেখগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে গোলক-ধাঁধায় পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ একই ব্যক্তি একবার নিজেকে কায়স্থ ও দ্বিতীয় বার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ একই ব্যক্তি নিজের পিতার নাম একবার কাশীনাথ, এবং পুনরায় মধুসূদন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখানে দুই ব্যক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কবি ছিলেন কায়স্থ, আর তাঁহার গুরু ব্রাহ্মণ। এইজন্য দুই স্থানে পিতার নাম দুই প্রকার বলা হইয়াছে। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী কবি কাহারও মাতার নামের উল্লেখ করেন নাই।

অশ্বমেধপর্ব্ব ব্যতীত জৈমিনি ভারতের অন্যান্য অংশ এখন অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের অনুলিপিতে ইহার কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কবি লিখিয়াছেন—

সপ্তদশপর্ব্ব-কথা সংস্কৃত-বন্ধ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জৈমিনি-ভারতের সপ্তদশপর্ব্বে অশ্বমেধের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। ব্যাস-মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে সম্পূর্ণ। ইহার পঞ্চদশ পর্ব্বে অশ্বমেধের বর্ণনা রহিয়াছে। তৎপর আশ্রমিক, মূষল, ও স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। এই গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ব্যাস ও জৈমিনি-ভারতে পর্ব্ব-সংস্থান-পর্য্যায়ে কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়—

ইতি জৈমিনিভারতকথা সপ্তদশ।
শাকেন্দু বেদামুনিষে যুগান্তে পুরাণ॥

অন্যত্র—

জৈমিনি-ভাগবতাঙ্গ সপ্তদশ।
শাকেন্দু বেদদানে নিধে যঃ॥

দ্বিতীয় পঙক্তির শেষাংশের পাঠ ঠিকমত উদ্ধৃত হয় নাই। তথাপি শাকের প্রথমে "ইন্দু" ও "বেদ" শব্দদ্বয় থাকাতে ১৪ শত কোন শকে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। ইহার পরে "নিধি" ও "যুগান্তে" থাকাতে ১৪৯৪ শক বা ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। ইষু বা মুনি ধরিলে হয় ১৪৫৪, এবং ১৪৭৪ শক। তাহা হইলে এই গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অতএব কবি কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। এখানে অঙ্কের বামাগতির নিয়মে শকের উল্লেখ করা হয় নাই। কাশী-দাসের বিরাটপর্ব্বের একখানি পুথিতেও এই নিয়মে শকের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যথা—

চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥

বোধ হয় দক্ষিণাগতির নিয়মেও কখনও কখনও শকের উল্লেখ করা হইত।

জৈমিনি-ভারত আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে গমন করিতে অর্জ্জুন নিষেধ করিলে বৃষকেতু বলিতেছেন—

সংগ্রামের স্থলে যদি বীরের প্রাণ যায়।
অক্ষয় অবশ্য মুক্তি সেই জন পায়॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হব খুড়া না ভাবিহ দুঃখ।
রথে চড়ি বৃষকেতু যায় রণমুখ॥
সংগ্রাম স্থলেতে দুই ভাই দেখা হৈল।
সমান সামর্থ্য বুদ্ধি বিধি নিয়োজিল॥

(পত্রিকা, ৬৫ পৃঃ)

চণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

উদ্দালক কহেন চণ্ডীর বরাবর।
আসিব শাণ্ডিল্য মুনি কালি মোর ঘর॥
আসন ভক্ষণ তাক কিছুত না দিহ।
আদর গৌরব তাক কিছু না করিহ॥
শ্রাদ্ধ করিব কালি আমার পিতার।
সমাবেশ নাহি শ্রাদ্ধ নারি করিবার॥
চণ্ডী-বোলে ব্রাহ্মণ তুমি থাক চুপ হৈঞা॥
করাব শ্বশুরের শ্রাদ্ধ সুন্দর করিঞা॥
শাণ্ডীল্য মুনির তরে যতনে রাখিব।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আভরণে মুনিকে পূজিব॥

(প্রদীপ, ৩৮৬-৭ পৃঃ)

কাশীরামের রচনার সহিত ইহার অনুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তিসূচক ঘটনার বর্ণনা বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

দ্বিজ হরিদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব বা কৃষ্ণচরিত্র

পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় কয়েকজন হরিদাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য সম্বন্ধে গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে লিখিত হইয়াছে—"ইনি মহাপ্রভুর শাখা। নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের টেঞা বৈদ্যপুরের নিকট কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে তাঁহার বিরহে দ্বিজ হরিদাস দেহত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং বৃন্দাবনে যাইয়া সাধন-ভজন করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন।"

ভক্তিরত্নাকরের ষষ্ঠ তরঙ্গ হইতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে।

অন্য এক হরিদাস সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের আদির অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, "ইনি বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। এই অনন্ত আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহার নিকট হইতে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সতীশবাবু এই হরিদাসকেই পদকর্ত্তা-রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু জগদ্বন্ধুবাবু দ্বিজ হরিদাসকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবুর সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্য-ভক্ত হরিদাসই "দ্বিজ হরিদাস" রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, যথা—

দ্বিজ হরিদাস প্রভু-পার্ষদ প্রধান।

(নরোত্তমবিলাস, ৭৪ পৃঃ)

এবং— দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য প্রভু অদর্শনে
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ॥

(ভক্তিরত্নাকর, ৪৭৫ পৃঃ)

আর চৈতন্যচরিতামৃতে গোবিন্দজীর সেবাইত হরিদাসকে "পণ্ডিত" বলা হইয়াছে।

এইভাবে উভয়ের পার্থক্য সূচিত হইয়াছিল। গদাধরের প্রশিষ্য হরিদাস দ্বিজ হরিদাসের পরবর্ত্তী, কারণ ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গমন করেন তখন—

গত মাঘ মাসে শ্রীআচার্য্য হরিদাস।
হৈলা সঙ্গোপন পথে শুনে শ্রীনিবাস ॥

(ঐ, ৬১৩ পৃঃ)

ইহা খেতরীর উৎসবের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। অতএব অধুনা স্বীকৃত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত রচনার আদেশদানকারী হরিদাসকে পরবর্ত্তী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। যাহাই হউক, হরিদাস ভণিতায় নিম্ন-লিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—

১। মুকুন্দমঙ্গল
২। জৈমিনিভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ
৩। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
৪। কয়েকটি বৈষ্ণব পদ

এখন এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা কে, তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। মুকুন্দমঙ্গলে কবি শ্রীনিবাসের উল্লেখ করিয়া ভণিতা দিয়াছেন, যথা—

মুকুন্দমঙ্গল বলি লেখে হরিদাস।
প্রাকৃত ভাষায় সায় কর শ্রীনিবাস ॥

অশ্বমেধ পর্ব্বেও শ্রীনিবাসের উল্লেখ করা ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

অভিমত সিদ্ধ মোর কর শ্রীনিবাস।
তোমার চরণে কহে দ্বিজ হরিদাস॥

(*D. C.* III, *p.* 791)

(এই উভয় গ্রন্থ যে একই কবির রচিত তাহার নির্দ্দেশ পরে দ্রষ্টব্য)

আর অষ্টোত্তর শতনামের ভণিতায় রহিয়াছে—

দ্বিজ হরি কহে এই নাম সঙ্কীর্ত্তন।

বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী, ৩৮৩ পৃঃ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই তিনখানি গ্রন্থ শ্রীনিবাস-ভক্ত দ্বিজ হরিদাস কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। ভণিতায় এইভাবে শ্রীনিবাসের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া কবিকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বলিয়া ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ কবি শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে "শ্রীনিবাস" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—মুকুন্দমঙ্গলে—

দেখিয়া দেবতার ত্রাস হাসিয়া যে শ্রীনিবাস
মনে চিন্তি জীবজন প্রাণ।
পাপিষ্ঠ অসুরে মারি শিশু-বৎস্য সঙ্গে করি
বাহির হইলা ভগবান॥

(কঃ বিঃ ১০০৫ সং পুথি, ৪১।২ পত্র)

আবার মুকুন্দমঙ্গলের প্রারম্ভেই রহিয়াছে—

আপনে রচিয়া শ্যাম করাহ লিখন।
তুমি মোর ধন-প্রাণ তুমি যে কারণ॥

তৎপর—

মুকুন্দমঙ্গল বলি লেখে হরিদাস।
প্রকৃত ভাষায় সায় কর শ্রীনিবাস॥

অতএব শ্রীনিবাসের উল্লেখে দ্বিজ হরিদাসকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, এবং মহাপ্রভুরই শিষ্য। হরিদাসের পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস শ্রীনিবাসের নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই হিসাবে দ্বিজ হরিদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পাওয়া যাইতেছে। ভণিতা দৃষ্টে ইঁহাকেই কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

পদকল্পতরুতে ও ব্রজবুলিতে রচিত চারিটি পদে দ্বিজ হরিদাসের ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু দুইটি পদে হরিদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩০১৪ সংখ্যক পদটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে পরমানন্দের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই সন্দিগ্ধ পদটি বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত একটি মাত্র বন্দনার পদে দ্বিজ হীন হরিদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা অন্য কোন হরিদাসও হইতে পারেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫৯২ সংখ্যক পুথিতে অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। পুথির পত্র সংখ্যা ১৬৪। এই গ্রন্থই কবি "কৃষ্ণচরিত্র" আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণের চরিত্র এই পাঁচালীর নাম।
জেই মত কহি শুন হৈয়া সাবধান॥

(ঐ, ২ পৃঃ)

এবং ইহার পূর্ব্বে যে তিনি "দশমের গীত" অর্থাৎ দশম স্কন্ধ অবলম্বনে মুকুন্দমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে—

দশমের কথা গীতে কহসি অনেক।
হেলা করি আমি কিছু কহিল সংক্ষেপ॥
তেঞি পুরাণত নহে সে সুধা প্রকাশ।
তেঞি ত আমার চিত্তে হইয়াছে অভিলাস॥

(ঐ, পৃঃ ৪)

এবং ইহারই ফলে এই কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইয়াছে। মুকুন্দমঙ্গলের যে বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কবি কেবলমাত্র দশমের আখ্যায়িকাই ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধে এবং মহাভারতেও কৃষ্ণচরিত্র বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ঐ সকল আখ্যায়িকা মুকুন্দমঙ্গলে স্থান লাভ করে নাই বলিয়া কবি যে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে আর একখানি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উদ্ধৃত উল্লেখে তাহারই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কবি অন্যত্রও বলিয়াছেন—

প্রথমে কৃষ্ণের জন্ম কব অনুপাম কর্ম্ম
ভাগবত দশম কথন।
যাহা ত শুনিলে লোক হরে সর্ব্ব দুঃখ শোক
সকল দুঃখের বিমোচন॥
তবে অশ্বমেধ পর্ব্ব জথি অপরূপ সর্ব্ব
জন্মেজয় জৈমুনি সংবাদ।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসেতু জ্ঞাতিবধ পাপ হেতু
মনে মনে চিন্তে পরমাদ॥

ঐ, ২ পৃঃ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুকুন্দমঙ্গলের পরে অশ্বমেধপর্ব্ব রচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

সংস্কৃত নাহি বুঝে সাধারণ জনে।
ভাষা কথা কহি আমি তথির কারণে॥
ভাষা কথা কহি বীর না করিও হেলা।
হাথ দিলে আগুনে না পোড়ে কোন্ বেলা॥

ঐ, ২ পৃঃ

যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধের পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত জৈমিনিভারত-বর্ণিত যাবতীয় আখ্যায়িকা এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে।

ঘনশ্যামদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব

ঘনশ্যামদাস জৈমিনিভারত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথমখণ্ডের ৬৩৩-৪০ পৃষ্ঠায় ইহার আংশিক বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। যে পুথি হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার লিপিকাল ১০৪০ সাল বা ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। জৈমিনিভারতে রামের অযোধ্যায় আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার বনবাস, এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে লবকুশের যুদ্ধ বিচরণও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঘনশ্যাম কৃত এই অংশের অনুবাদ স্বতন্ত্রভাবে ১০৩৫ সালের অনুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের ৫৪১-৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূল গ্রন্থের অংশ বিশেষ মাত্র, স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। এইজন্য ভণিতা, এবং আদর্শ গ্রন্থের নির্দ্দেশ উভয় পুথিতেই একই প্রকারে পাওয়া যাইতেছে, যথা—

মহাভারতের পুথিতে—

কৃপা কর নারায়ণ ভকত জনায়।
জৈমিনি-ভারত পোথা এতদূরে সায়॥

(ঐ, ৬৩৩ পৃঃ)।

এবং—

ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব-মকরন্দ পানে।
ঘনশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণের চরণে॥

(ঐ, ৬৩৭ পৃঃ)

আর রামায়ণের পুথিতে—

কৃষ্ণ-পদারবিন্দ মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গ
শুনি ভেল ঘনশ্যাম দাস।
নতুন মঙ্গল গাঁথা জৈমিনি ভারত পুতা (পোথা)
ভকত জনার অভিলাষ॥

(ঐ, ৫৪৯ পৃঃ)

এবং—

ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্দ্ব চিত্ত অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বলে ঘনশ্যাম দাস॥

(ঐ, ৫৪৭ পৃঃ)

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কবি জৈমিনিভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লবকুশের যুদ্ধ সংক্রান্ত অংশটি রামায়ণের অনুবাদ রূপে চলিয়া যাইতেছে। উক্ত উভয় পুথিতে মল্লাব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তথাপি কোন কোন লেখক যদি কোন বিশেষ সালের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে তাহার সন্ধানও দিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথমখণ্ডের ভূমিকার শেষভাগে আলোচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের খেয়াল বশে কোন অব্দের কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং ঘনশ্যাম দাস যে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় এই সময়েই গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাসকে পাওয়া যায় (পদকল্পতরুর ভূমিকা, ৮০ পৃঃ)। কিন্তু তিনি যে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রসিদ্ধি নাই। তথাপি ইঁহাদের অভিন্নতা-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয়। অশ্বমেধপর্ব্বের শেষে কবি নিজের আত্মীয়গণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কৃপা কর নারায়ণ ভকত জনায়।
জৈমিনি ভারত পোথা এতদূরে সায়॥
হরিদাস সেনে কৃপা কর নারায়ণ।
গোবিন্দ সেনের সুতে কর কৃপায়ণ॥
রাখিব অচল ভক্তি বুদ্ধিমন্ত খানে!
কৃপা কর নারায়ণ দুর্ব্বাসা সেনে॥
সহ পরিবারে কৃপা কর শ্রীনিবাস।
তোমার চরণে কহে ঘনশ্যাম দাস॥

(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৬৩৩ পৃঃ)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, কবির আত্মীয়গণ সেন-বংশীয় ছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজও চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, অতএব বংশোপাধি একই প্রকারের পাওয়া যাইতেছে। তারপর এখানে শ্রীনিবাসের কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই "শ্রীনিবাস" অর্থে "নারায়ণ" বুঝা যায় না, কারণ "সহ পরিবারে" শ্রীনিবাসকে কৃপা করিতে বলা হইয়াছে। অতএব এখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। ঘনশ্যাম স্বরচিত গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই স্বীয় গুরু গোবিন্দগতির বন্দনা করিয়াছেন। অতএব বংশ, সময় এবং গুরু-পর্য্যায় বিচার করিলে অশ্বমেধ পর্ব্বের রচয়িতা ঘনশ্যামকে গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র বিখ্যাত পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

পদরচনায় ঘনশ্যাম তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অশ্বমেধপর্ব্বেও তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সীতার রূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

বিম্বফল জিনি তোমার অধর সুরঙ্গ।
দেখিয়া বদন শশী লাজে দিল ভঙ্গ॥

মৃণাল বিহিত বাহু ভুরু রামধনু।
পদ কর সরসিজ হরি-মধ্য জনু॥
অলকা অমৃত কত অলিকুল ঘটা।
দশন মুকুতা হাস্য বিদ্যুতের ছটা॥ ইত্যাদি।

(ঐ, ৫৪৯ পৃঃ)।

নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র গৌড়ীমঙ্গল কাব্যে লিখিয়াছেন—

অষ্টাদশ পর্ব্বভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥

অতএব কাশীদাসের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি যে পূর্ব্বকালে ছিল ইহা জানা যাইতেছে। নিত্যানন্দের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তিনি সমগ্র মহাভারতই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহার ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পর্ব্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে (D. C. III, পৃঃ ৭৬০—৭৭৫ দ্রষ্টব্য)। কবি স্বীয় গ্রন্থকে "বিজয় পাণ্ডব কথা" রূপে প্রচারিত করিয়াছেন, যথা—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়ে এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারত-কথন॥

(D.C. III. পৃঃ ৭৬৮)

অন্যত্র—

নিত্যানন্দ দাসে কহে ভারত-কথন ॥ (ঐ, পৃঃ ৭৬৯)

গ্রন্থ-রচনায় কবি কোন পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি লিখিয়াছেন—

যে কথা শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
পয়ার করিয়া তাহা রচিলা কৌতুকে ॥
(কঃ বিঃ ১৭০৮ সং পুথি, ১২৩ পত্র)।

কবি রচনা-নৈপুণ্যে কাশীদাসের ন্যায় কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়ের রচনায় যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় তাহা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উভয় কবির রচনা উদ্ধৃত করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" প্রদর্শন করিয়াছেন (ঐ, ৬ষ্ঠ সং, ৪৬৪—৪৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত হইল—

কৃষ্ণের প্রবোধ-বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র-বীর্য্যের বধূ রাজার বণিতা ॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥ ইত্যাদি
(নিত্যানন্দের স্ত্রী-পর্ব্ব)

প্রায় এই ভাবেই ইহা কাশীরামের মহাভারতে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

কৃষ্ণের প্রবোধ-বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্র-বীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥ ইত্যাদি
(উদ্ভটসাগর সং, ১১৯৬ পৃঃ)

নিত্যানন্দের স্ত্রীপর্ব্বের কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৬৫৯-৬৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার সহিতও কাশীদাসের রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দুর্য্যোধনের শব দর্শন করিয়া গান্ধারী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

দেখ কৃষ্ণ মরিয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজন।
কোথা ভীষ্ম মহাশয়, গান্ধার-নন্দন॥

* * * *

একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লুটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
ধূলায় ধূসর তনু হয়্যাছে এখন॥

(ঐ, ৬৬৩ পৃঃ)

আর কাশীদাসের মহাভারতে আছে—

দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনিরে সঙ্গে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু-কুমার॥

* * * *

একাদশ অক্ষৌহিনী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যেই করিত শয়ন।
তার তনু ধূলি' পরে কেন নারায়ণ॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১১৯৫ পৃঃ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, এই সাদৃশ্য পরবর্ত্তী সংগ্রহকারকগণের অপকীর্ত্তি। কাশীদাসের মহাভারতের মধ্যে নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র ভণিতাটিতেই কাশীদাসের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, এখানে কাশীদাসের রচনার সন্ধান মিলে না। এই ভাবেই কৃত্তিবাসের গ্রন্থে অপরের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আবার একই পুথিতে উভয়ের রচনা ভণিতাসহ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায় (D. C. III., ৭৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইলেও নিত্যানন্দের খাঁটি রচনার সন্ধান অনেক প্রাচীন পুথিতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০৮ সংখ্যক (শান্তিপর্ব্বের) পুথি অবলম্বনে এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কাশীদাসের মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের প্রারম্ভে এই ভাবে ঘটনা-বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়—কৌরবগণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, তৎপর তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য ব্যাসদেব কর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয়, লোমশ, ধ্রুব, জড়ভরত ও মহীরাবণ প্রভৃতির উপাখ্যানের বর্ণনা। কিন্তু নিত্যানন্দের শান্তিপর্ব্বের প্রথমেই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অর্জ্জুনকে দ্বারকায় পাঠাইতেছেন—

ত্বরায় আনহ গিয়া দৈবকী-নন্দন ॥
আমারে পেলায়্যা গেলা পাপের সাগরে।
আসি বলে তিহোঁ গেলা দ্বারকা নগরে ॥

(কঃ বিঃ ১৭০৮ সং পুথি, ২ পত্র)

অর্জ্জুন দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইলে—

আলিঙ্গন শ্রীকৃষ্ণ করিলা তার সনে ॥
একাসনে বসিলা অর্জ্জুন সংহতি।
হের দেখ সখ্যভাব বড়ই সংপ্রীতি ॥

(ঐ, ২ পত্র)

তৎপর কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিতেছেন—

শান্তনু-নন্দন তাহা দেখিল নয়নে।
সম্মুখে দেখিল কৃষ্ণ দেব নারায়ণে॥
মানসে করিয়া দিল কৃষ্ণের আসন।
মানসেতে পাদ্য অর্ঘ্য কৈল সমর্পণ॥
মানসেতে পুজা কৈল অভয় চরণ। ইত্যাদি

(ঐ, ৪ পত্র)।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে এখানে কবি ভক্তির উৎস প্রবাহিত করিয়াছেন। যাহাই হউক, কাশীদাসের মহাভারতে উল্লিখিত উপাখ্যানগুলি বর্ণনার পরে যুধিষ্ঠির যাইয়া ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা হইতে উভয় গ্রন্থের বিভিন্নতা সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে ভণিতা পরিবর্ত্তনের সহিত একের রচনা অপরের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা স্ত্রীপর্ব্বের উক্তপ্রকার রচনা-সাদৃশ্যের কোনই কারণ নাই।

নিত্যানন্দের অশ্বমেধপর্ব্ব জৈমিনি-ভারতের আদর্শে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সুরথ, তাম্রধ্বজ প্রভৃতি রাজগণের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা রহিয়াছে। কাশীদাসও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া অশ্বমেধপর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীরামদাসের মহাভারত

বংশাবলী:—কাশীদাসের আদিপর্ব্বের একখানি পুথিতে লিখিত আছে-

ইন্দ্রাণি নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তির্থেতে যথা দেবি ভাগিরথি॥

কাএস্ত কুলেতে জন্ম প্রিয়ঙ্কর নামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নামে॥
তস্য পুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

(D. C. III., ৬৪৪, ৫৪৬ পৃঃ)।

কিন্তু কবির বিস্তৃত বংশ-পরিচয় তাঁহার ভ্রাতা গদাধর জগন্নাথমঙ্গলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (বঙ্গবাসী সং, ৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। (১) ইহা হইতে

১। ভাগীরথী তটে বাঁটী ইন্দ্রাইনি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি শিঙ্গিগ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্রে দেব দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
তাহার নন্দন হৈল মীনকেতন॥
তাহার তনয় হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহা হৈতে হৈল এই তিনটি তনয়॥
বসুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
বসুপতির পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্টিত মতি॥
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হল্যো এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব॥
সুধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস॥

দেব কমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড়ে কৈল বাস ॥
কমলাকান্তের হৈল্যো এ তিন কোঙর।
প্রথমে সে কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ ॥
তৃতীয়ে কণিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎমঙ্গল-কথা করিল প্রকাশ ॥

জানা যায় যে, কাশীরামের পিতামহের নাম সুধাকর, এবং পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গদাধর। ইঁহারা সকলেই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। "গোপাল দাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর নিকটে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণদাস "শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্কর" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিলাস নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।" কাশীদাস বিখ্যাত মহাভারতের রচয়িতা, গদাধর জগন্নাথ-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। শুধু এক পুরুষেই ইঁহাদের কবিত্ব-শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। কাশীদাসের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস মহাভারতের কয়েকটি পর্ব্বের, এবং গদাধরের পুত্র (মতান্তরে কাশীর পুত্র) নন্দরামও কর্ণ-দ্রোণ-পর্ব্বাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কাশীরামের কুলোপাধি ছিল "দেব"। অতএব তাঁহার পূর্ণ নাম কাশীরাম দেব। এদেশে নামের সহিত দাস শব্দ ব্যবহারের প্রথা অত্যধিক প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে মহান্তগণও দাস আখ্যা গ্রহণ করিতে গৌরব বোধ করিতেন। কাশীরামের পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিজেও বিষ্ণুভক্ত। এজন্য নামের সহিত তিনি বিনয়সূচক দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন। ইহারই ফলে তিনি কাশীদাস নামে পরিচিত হইয়াছেন।

উদ্ধৃত জগন্নাথ-মঙ্গলের উল্লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, কাশীদাসের পিতা কমলাকান্ত দেব স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র কৃষ্ণদাস সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। গদাধর উড়িষ্যার অন্তর্গত মাখনপুরে থাকিয়া জগন্নাথ-মঙ্গল রচনা করেন। প্রবাদ এই যে, কাশীরাম আত্রাস-গড়ের রাজার বাড়ীতে শিক্ষকতা করিতেন (বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক, ৮৪ পৃঃ)। অতএব সিঙ্গি-গ্রামের সহিত সেই সময়ে তাঁহাদের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাহা বোধ হয় না। সম্ভবতঃ প্রবাসেই কাশীরাম মহাভারত রচনা করেন।

মহাভারত রচনায় কবি অভিরাম মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়—

হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্ব গুণ ধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম ॥
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে ॥

অভিরাম কাশীদাসের গুরুস্থানীয়ও হইতে পারেন। কাশীরাম দাস তিনপর্ব্ব মতান্তরে চারিপর্ব্ব মহাভারত রচনা করিয়া স্বর্গগত হইয়াছিলেন, এইরূপ বিবৃতি কোন কোন প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায়, যথা—

ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিনপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ ॥
আদি সভা (বনের) যে রচিল পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥
পূর্ব্বে তিঁহ আরম্ভিয়া ছিলা এই পুথি।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো হইল স্বর্গগতি ॥

(D.C. III, পৃঃ ৭১০)

এইরূপ উক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৩৪ সংখ্যক পুথিতেও পাওয়া যায় (D. C. III, পৃঃ ৫৬১ দ্রষ্টব্য)। অন্যত্র—

ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব্ব ভারতের করিলা প্রকাশ॥
আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালা।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥

উদ্ভটসাগর সং, ভূমিকা, ১৯ পৃঃ

এখন বিচার্য্য এই যে, কাশীদাস যদি মহাভারতের কয়েকটি পর্ব্বমাত্র রচনা করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন কোন পুথিতে তিনপর্ব্ব এবং কোন কোন পুথিতে চারিপর্ব্ব রচনার উল্লেখ রহিয়াছে কেন? ইহার সমন্বয় সাধনের জন্য এইরূপ উক্তিও লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
রচিয়া শ্রীকাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

অর্থাৎ তিনি আদি সভা ও বনপর্ব্ব সম্পূর্ণই রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরাটপর্ব্বের কিয়দংশ মাত্র রচনা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, উদ্ধৃত উল্লেখগুলিতে আমরা কবির উক্তি পাইতেছি না। কাশীদাসের মৃত্যুর পরে অন্য কোন লোক ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবার বন ও বিরাটপর্ব্বের সকল পুথিতেও ইহা পাওয়া যায় না, কোন কোন পুথিতে পাওয়া যায় মাত্র। অধিকন্তু "পূর্ব্বে তিঁহ আরম্ভিয়া ছিলা এই পুথি" ইহা পাঠ করিলে ইহাও মনে হইতে পারে যে,কাশীদাস স্বরচিত মহাভারতের পুথি স্বহস্তে লিখিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে অন্য কেহ তাহা লিখিয়া উক্ত প্রকার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহা দ্বারা কাশীদাস কর্ত্তৃক আংশিক মহাভারত রচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

অপর পক্ষে কবি যে সম্পূর্ণ মহাভারতই রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ উক্তিও পাওয়া যাইতেছে। যথা—

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥

(গৌরীমঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে)

আবার গদাধরের জগৎমঙ্গলের—

দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ॥

এই উক্তি হইাত মনে হয়, তিনি সমগ্র মহাভারতের রচয়িতারূপেই কাশীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। বিরাটপর্ব্বের কিয়দংশ রচনা করিয়াই যদি কাশীদাস স্বর্গগত হইয়া থাকেন, তাহা হইতে বিরাটপর্ব্বের সমাপ্তিসূচক সন তারিখের উল্লেখ করা কবির নিম্নোদ্ধৃত ভণিতার মর্ম্ম গ্রহণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে—

চন্দ্রবাণ পক্ষঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥

(সা-প-পত্রিকা, ১৩০৭, ১২৩ পৃঃ)

শুধু ইহাই নহে, অন্যান্য পর্ব্বেও কাশীদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস ও পারিবারিক সম্বন্ধের উল্লেখ করা ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা—

হৃদয়ে চিন্তিয়া চন্দ্রচূড়পদাম্বুজ।
কাশীদাস কহে গদাধরদাসাগ্রজ॥

(শান্তিপর্ব্বে, D. C. III, ৭৪৩ পৃঃ)

কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস।

(কর্ণপর্ব্বে, D. C. III, ৭৪৫ পৃঃ)

অন্য কবির নামের পরিবর্ত্তে কাশীরামের নাম বসাইয়া এই জাতীয় ভণিতার সৃষ্টি হইতে পারে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদ্যোগপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্বাদি মহাভারতের অবশিষ্ট অংশে উক্তপ্রকার ভণিতাসহ অন্য কবির রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয় (নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম ও দ্বৈপায়ন দাস প্রভৃতির গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে)। ইহার কারণ কি? কাশীদাস পিতার সহিত উড়িষ্যায় গমন করিয়া মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছিলেন যে বিরাটপর্ব্বের কিয়দংশ রচনার পরে তিনি কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন! যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ঐ সকল স্থানে অবস্থান কালে তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা এদেশে প্রচারিত হইতে অবশ্যই কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকিবে। তখন হয়ত কাশীদাসের খাঁটি রচনা অপ্রাপ্তি হেতু কেহ কেহ অন্যের রচনা যোগ করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন, এবং পরে তাহারই অনুলিপি প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইরূপ সঙ্কলনের জন্য দায়ী কে? নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম কি দ্বৈপায়ন দাস প্রভৃতি কবিগণ নিশ্চয়ই নহেন। তাঁহাদের আবির্ভাবের পরে অন্যের দ্বারা ইহা সংঘটিত হইয়াছে, এবং এইরূপ সঙ্কলনের প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংশোধিত মহাভারত শ্রীরামপুর হইতে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। তিনি ইহার বহু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে "সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংশোধিত" মহাভারত প্রকাশিত হয়। ইহার পরে বটতলার মধুসূদন শীল ১৩ জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত মহাভারত প্রকাশিত করেন। ইহার এক বৎসর পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ পুনরায় নানাভাবে সংস্কৃত করিয়া মহাভারত সম্পাদিত করেন। এই গ্রন্থ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "শেষখণ্ড অর্থাৎ উদ্যোগপর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত" প্রথম

প্রকাশিত হয়। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমরা আদি পর্ব্বাবধি বিরাটপর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাভারতের প্রাচীন পুথি প্রথমে সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" তখন কি এই অংশটি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল? যাহাই হউক, ইঁহারা কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, উদ্যোগপর্ব্ব হইতেই মুদ্রিত মহাভারতে অন্য কবির রচনা-সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, অবিচারিতভাবে ইঁহারা অন্যের রচনা কাশীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। নতুবা নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দরাম এবং দ্বৈপায়ন দাস প্রভৃতির ভণিতাসহ যে রচনা প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাই কাশীদাসের ভণিতায় মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় কেন? নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব তাঁহারই রচনা কাশীদাসের মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আর কাশীর পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যে কাশীর কীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহাও ধারণার অতীত। অতএব পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারিগণ অর্থ ও প্রতিষ্ঠার লোভে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া কাশীদাসের মহাভারত নানাভাবেই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে এখন কবির খাঁটি রচনা চিহ্নিত করা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় পূর্ব্বেও ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, নতুবা অন্যের রচনা দ্বারা কাশীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার আবশ্যকতাই উপলব্ধি হইত না।

অনেক সময় পুথি-লেখকগণ আদর্শ গ্রন্থ অপ্রাপ্তি হেতু অন্যের রচনা দ্বারা যে পুথি সম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১২১৪ সংখ্যক পুথিতে অভিরামের গোবিন্দবিজয়ের প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ইহা ৩৫৮ পত্রে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ২২৪ পত্রে অভিরামের রচনার পরে ভণিতা সহ গুণরাজ খানের রচনা দ্বারা গ্রন্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। পুথির শেষে লিপিকার মহাশয় লিখিয়াছেন

—"ইতি শ্রীঅভিরাম কৃত কথক পুস্তক ছিল, তাহা সমাপ্ত পাইলাম না। অতএব গুণরাজ খানের কৃত পুস্তক লইঞা শেষে সাঙ্গ করিলাম। ইহাতে কেহ দোষ লইবেন না।" লিপিকার অনুগ্রহ করিয়া এখানে এই নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই, নতুবা দুই কবির রচনায় এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হইতে পারে না। কাশীদাসের মহাভারতে আমরা দেখিতেছি যে, ভণিতাও পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথিতে যাহা অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই রচনা বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হয় যে, মহাভারতের অনেক স্থলেই আমরা কাশীর খাঁটি রচনার সন্ধান পাইতেছি না। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী জয়গোপালগণ কর্ত্তৃক এই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন কিনা :—অনেকে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কাহারও কাহারও মতে কবি কথকদিগের মুখে শুনিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দুই পঙ্‌ক্তির অপব্যাখ্যা দ্বারা এই মত সমর্থিত হইয়া থাকে—

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ইহার অর্থ এই নয় যে, "আমি শুনিয়াই মহাভারত রচনা করিয়াছি", কিন্তু এই ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—"আমি এমন কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন যে, যাহা শুনি তাহা অনায়াসে পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশ করিতে পারি।" যাহাই হউক কবির সংস্কৃত জ্ঞানের নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকে এই সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রদর্শিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে সঙ্কলিত হইল।

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধি স্বয়ং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসপ্তাশ্বসম্বোধিতম্।

লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানাসবং
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজম্ কপিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥
(উদ্ভট শ্লোক)

পরাশর-সুতমুখে হইল সম্ভব।
অমল কোমল দিব্য ত্রৈলোক্য-বল্লভ ॥
গীতা-অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশর রচিত তাহে বিবিধ আখ্যান ॥
পুণ্যময় হরি-কথা প্রচণ্ড তপনে।
ভারতপঙ্কজ প্রস্ফুটিত নিশিদিনে ॥
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ভ্রমর।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরন্তর ॥
(উদ্ভটসাগর সং, ৪ পৃঃ)

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥
শোকস্থান সহস্র, শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় সে অতি অজ্ঞান ॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ ॥
(উদ্ভটসাগর সং, ৫২৯ পৃঃ)

অর্থানামর্জ্জনে দুঃখং বর্দ্ধনে রক্ষণে তথা।
তেষাং হি বৈরিণো জ্ঞাতিবহ্নিতস্করপার্থিবাঃ ॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ, ক্ষয়েতে দ্বিগুণে।

অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা-অগ্নি-চোর-বন্ধুজন॥
(উদ্ভটসাগর সং, ৪২৯ পৃঃ)

বনপর্ব্বে কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি :—

মনসা স্নেহপূর্ণেন যন্নঃ স্মরসি কেশব।
কূর্ম্মাণামিব শাবানাং তেন জীবামহে বয়ম্॥
(মহাভারত, বনপর্ব্ব)

অনুবাদ :—সর্ব্বদাই কর আমাদিগকে স্মরণ।
তাই মোরা আছি সবে জীবিত এখন॥
কূর্ম্মের জননী থাকি জলের ভিতর।
জীয়ে রাখে যথা তার শাবক-নিকর॥
(উদ্ভটসাগর সং, ৪৩৮ পৃঃ)

বনপর্ব্বে বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের নিকটে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সরল অনুবাদ কাশীদাসী মহাভারতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। বকের প্রশ্ন—

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি
কস্য স্বিদ্ হৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্ বেগেন বর্দ্ধতে॥

অনুবাদ—

নিদ্রা গেলে কে না করে নয়ন মুদ্রিত।
ভূমিষ্ঠ হইয়া কেবা না হয় স্পন্দিত॥
কাহার হৃদয় নাই বলহ আমায়।
পাইলে প্রবল বেগ কেবা বৃদ্ধি পায়॥

যুধিষ্ঠিরের উত্তর—

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনোঃ হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ—

নয়ন খুলিয়া নিদ্রা যায় মৎস্যগণ।
জন্মিলেও অণ্ডগুলি না করে স্পন্দন ॥
প্রস্তর-মূর্ত্তির কভু না আছে হৃদয় ॥
দ্রুতবেগ পাইলেই নদী বৃদ্ধি হয় ॥

(উদ্ভটসাগর সং, ৬৬০ পৃঃ)

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কেবল মহাভারতের নহে হিতোপদেশের এবং কতিপয় উদ্ভটশ্লোকেরও কবি অনুবাদ করিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কালিদাসের গ্রন্থের সহিতও তিনি অপরিচিত ছিলেন না। উক্ত কবির—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্" শ্লোকাংশের অনুবাদ নিম্নলিখিত দুই পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়—

আপন অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয় ॥

(উদ্ভটসাগর সং, ২৬৭ পৃঃ)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উল্লেখ বিশেষ গর্ব্বের সহিত করিয়াছেন, কিন্তু কাশীদাস বিনয়বশতঃ নিজেকে বিদ্যাবাগীশ বলিয়া পরিচিত করেন নাই। ইহার প্রয়োজনও নাই। কারণ তাঁহার গ্রন্থই তাঁহার বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কাশীরামের আদর্শ :—কাশীরাম ব্যাস-ভারত এবং জৈমিনি-ভারত এই উভয় গ্রন্থ আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াই মহাভারত রচনা করিয়াছেন। কাশীদাসের গ্রন্থের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, অথবা উক্ত গ্রন্থ-বর্ণিত যাবতীয় ঘটনাও তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহাতে অনেক আখ্যায়িকা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং অনেক নূতনত্বের সমাবেশ রহিয়াছে। সংস্কৃত মহাভারত পৌষ্যপর্ব্ব বা

উতঙ্গের উপখ্যান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কাশীদাসের গ্রন্থে ভৃগুবংশের বিবরণ প্রথমে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যাস-ভারতের পৌলোম-পর্ব্বের অন্তর্গত, এবং উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ইহার প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কাশীদাস সমগ্র পৌষ্যপর্ব্ব বাদ দিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উতঙ্গের আখ্যায়িকাটি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের পূর্ব্বে কবি ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন সর্ব্বপ্রথম জন্মেজয়কে মহাভারত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ইহাই ব্যাস-ভারতের আখ্যায়িকা। কিন্তু কাশীদাসের মহাভারতে দেখা যায়, সর্পযজ্ঞের পরে জন্মেজয় এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই সময়ে অশ্বের কর্ত্তিত মস্তক যজ্ঞস্থলে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ-বালক হাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া জন্মেজয় তাঁহাকে হত্যা করেন। এই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাসদেবের আদেশে জন্মেজয় বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়াছেন। ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর॥
মহাভারতের কথা করিলে কীর্ত্তন।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে বরণ॥

(উদ্ভটসাগর সং ৬৩ পৃঃ)

ইহাতে জৈমিনি ভারতের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মশাপের ফলে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য জৈমিনির নিকটে জন্মেজয় মহাভারত শুনিয়াছিলেন। মহাভারত শ্রবণে তাহার শরীর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল (সঞ্জয় ও পরাগলী মহাভারত সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কোন কোন ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া শরীরে

তিনটি চাপ রহিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপের শুক্লবর্ণ ধারণের পরিকল্পনা ইহারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তারপর সমগ্র অশ্বমেধপর্ব্বটি কাশীদাস জৈমিনি-ভারত অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে কাশীদাসের ভারতে জৈমিনি-ভারতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাস-ভারত-বহির্ভূত অনেক আখ্যায়িকাও কাশীদাস মহাভারতে স্থান লাভ করিয়াছে। বনপর্ব্বে বর্ণিত শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান এবং দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে অকাল আম্রের বিবরণ তিনি যে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা এপর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা বোধ হয় জৈমিনি-ভারতের আদর্শে রচিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ সরস উপাখ্যান রচনায় জৈমিনির কৃতিত্ব রহিয়াছে। শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত মহীরাবণের বৃত্তান্ত ব্যাস-ভারতে নাই। রামায়ণ-সংশ্লিষ্ট এই ঘটনাটির বর্ণনা কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রচারিত একখানি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব এক বিরাট অধ্যায়। কাশীদাসী ভারতে ইহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়া কাশীদাস কয়েকটি মাত্র আখ্যায়িকার সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। আবার ঘটনা-বর্ণনাতেও তিনি সর্ব্বত্র ব্যাস-ভারত অনুসরণ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। ভীষ্ম ও দ্রোণকে দিয়া কাশীদাস লক্ষ্য ভেদ করিবার উদ্যম করাইয়াছিলেন। শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখিয়া ভীষ্ম বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শর সুদর্শন চক্রে প্রতিহত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার উল্লেখ ব্যাস-ভারতে নাই। তারপর কর্ণ-নিক্ষিপ্ত বাণও সুদর্শনে ঠেকিয়া তিলবৎ ভূতলে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাস-ভারতে দেখা যায়, কর্ণ লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"নাহং বরয়ামি সূতম্" অর্থাৎ আমি সূতকে বরণ করিব না। ইহা শুনিয়া কর্ণ ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে দুর্য্যোধনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইবে,

এইরূপ উক্তিও সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। ইহা সম্পূর্ণই কাশীরামের কল্পনা-প্রসূত। লোক-মনোরঞ্জনের জন্য কাশীদাস এইভাবে ঘটনা-বিন্যাস করিয়াছেন। "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি" প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত রচনার মূলে ব্যাস-ভারতে রহিয়াছে—"এই ব্যক্তি যুবা, সুশ্রী, ঐরাবতের শুঁড়ের মত হস্ত দীর্ঘ, এবং ধৈর্য্যে হিমালয়ের তুল্য, উহার স্কন্ধযুগল ও উরুযুগল স্থূল, সিংহের ন্যায় সলীল গতি, বলিষ্ঠ দেহ এবং মত্ত হস্তীর ন্যায় বিক্রম রহিয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে।" এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া কাশীদাস সুললিত ছন্দে যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কারণেই কাশীদাসের গ্রন্থ এত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কাশীদাস ভগবদ্ভক্ত কবি। তাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বত্রই ভক্তির নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তি তাঁহার বংশগত বিশেষত্ব! তারপর চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবও তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নহে, মহাভারতের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সারথি। কৃষ্ণের পরামর্শেই তাঁহারা চালিত হইয়াছেন, এবং বিবিধ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণের অন্তর্ধানে অর্জ্জুন দস্যুদিগের হস্ত হইতে যাদব-কুলনারীগণকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ভাগবতের ন্যায় মহাভারতও কৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থমাত্র। এই কারণে কাশীদাসী মহাভারতের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকে যন্ত্রীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, আর কবি নানাভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। ব্যাস-ভারতে দেখা যায়, সহদেব দূত পাঠাইয়া বিভীষণকে রাজসূয় যজ্ঞের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন (সভাপর্ব্ব, ত্রিংশত্তম অধ্যায়)। কিন্তু কাশীদাস অর্জ্জুন দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব বিভীষণের হৃদয়ে ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার মুখে কৃষ্ণের স্তুতির পরিসীমা নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদা রক্ষা

করিতে হইবে। এই জন্য কৃষ্ণ বিভীষণকে চতুর্দ্দারে ঘুরাইয়া সভাস্থলে যাইয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই সকল ঘটনা সংস্কৃত মহাভারতে নাই, কিন্তু কাশীদাসের ভারতে এমন সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের চরণে দেবযক্ষরাক্ষসাদির সহিত স্বতঃই ভক্তিতে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। মাইকেল সত্যই লিখিয়াছেন,

—"হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান্।"

তিনি কৃত্তিবাসের নামেও একটি সনেট উৎসর্গ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের গ্রন্থ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা কাশীদাসী মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্য বেশী। কবির রচনা সর্ব্বত্রই সরস এবং চিত্তাকর্ষক। কৃত্তিবাসের ন্যায় তিনি কেবলমাত্র গল্পাংশের ভাবানুবাদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার রচনা প্রায় সর্ব্বত্রই মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিত্বের হিসাবে কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাশীদাস শ্রেষ্ঠ।

কাশীদাস সাধারণের সহজবোধ্য উপমাদির প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল ঘটনার সহিত আমরা বিশেষরূপে পরিচিত আছি, তিনি তাহা হইতেই উপমার মালা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের আস্বাদনীয়তা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হইল—

পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি॥

অন্যত্র— প্রলয় সমুদ্র কিসে রাখিবেক কূলে।
বালি-বান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে॥

এবং— আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হতে খসে যেন সর্পজীর্ণ ত্বচ॥

আবার— অন্ধকার করি ধায় গগন মণ্ডলে।
শরদের কালে যেন হংসপুংক্তি চলে॥
এবং— বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে॥

ইত্যাদি।

কাশীরাম নিজে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ না করিয়া পাত্র পাত্রীর বাচনিকেই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। কীচকের প্রেমনিবেদন শুনিয়া দ্রৌপদী বলিতেছেন—

এ সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবে কল্যাণে॥
পরদারে লোভ কৈলে নাহিক মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবী মণ্ডল॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে মাত্র হয় আয়ু ক্ষয়॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা-প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে॥

রূপ-বর্ণনাতেও কবি অনুপম দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি" ইত্যাদি বর্ণনা বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। অন্যত্র দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণার রূপ বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল-প্রিয়-বন্ধু॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অঙ্গন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥

খঞ্জন-গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রঞ্জিত।
শুকচঞ্চু নাসা, শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত॥
নির্ধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল বিদ্যুতে।
বালসূর্য্য-উদয় হইল পূর্ব্ব ভীতে॥ ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ গান করা হইত বলিয়া গায়কগণ কর্ত্তৃক যুগে যুগে ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কাশীদাসের মহাভারত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা মুদ্রিত হইবার কালে। শ্রীরামপুর হইতে ইহা প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই সময় হইতে ইহার ভাষা ও ছন্দ পরিমার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে প্রায় দুই শত বৎসর ইহা লোক-মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিল বলিয়াই ইহার প্রতি রসজ্ঞগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে বোধহয় সঞ্জয় কবীন্দ্রাদির গ্রন্থ প্রাচীনত্ব হেতু লোক-প্রীতি সাধন করিতে পারে নাই। কাশীদাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া এই সুযোগে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সঞ্জয়াদির আদর্শ গ্রন্থ জৈমিনি-ভারত ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়াতে ব্যাস-ভারতের আদর্শে মহাভারত রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে নিত্যানন্দ ঘোষ প্রভৃতি গ্রন্থ-রচনা করিলেও কাশীরাম কবিত্ব-সম্পদে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। পরে মুদ্রিত হইয়া তাঁহার গ্রন্থই বিশেষ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই সুযোগে ইহা অন্যের রচনাও আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

কাশীরাম দাস কথকের মুখে মহাভারত শুনিয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি প্রধানতঃ মহাভারতের মূল আখ্যায়িকা নিজের ভাষায় রচিত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি স্থানে স্থানে মূল আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া

যায়, যদিও ইহাতে কবির কল্পনাপ্রসূত নূতন সংযোজনার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আমরা বিরাটপর্ব্বের কতকাংশ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কুরুসৈন্যগণ আসিয়া বিরাটের গাভী লইয়া গিয়াছে। দূত আসিয়া সংবাদ দিলে উত্তর বলিলেন—

একটিও সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে, নাহিক পদাতি॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি॥
মত্ত গজগণে যথা একাকী কেশরী।
দৈত্যগণে দলে যথা একা বজ্রধারী॥
সেই মত দলি আমি কুরুসৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন॥
জনৈক সারথি যদি মম যোগ্য হয়।
এক রথে করিব যে কুরু-পরাজয়॥
ধনঞ্জয় বীর যথা দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব-দাহন॥
তদ্রূপ মহৎ কর্ম্ম আজি সে করিব।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমিষে মারিব॥

আর মূল মহাভারতে রহিয়াছে—

যদি অশ্বচালনে বিচক্ষণ কোন লোক আমার সারথি হইত, তবে আমি এখনই দৃঢ় ধনু ধারণ করিয়া গোষ্ঠে যাইতাম।

তার পর হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ সেই বিপক্ষ সৈন্য আলোড়ন পূর্ব্বক বলবিহীন কৌরবগণকে সন্তপ্ত ও বিজিত করিয়া পশুগুলিকে আনয়ন করি।

দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থমার সহিত দ্রোণ, এই সকল সমরাগত ধনুর্দ্ধরকে বিনাশ করিয়া দানববিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় আমি এই মুহূর্ত্তেই পুনরায় পশুগুলিকে ফিরাইয়া আনিব।

আদর্শের সহিত মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কাশীদাস মূলের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় উত্তরের সারথির প্রয়োজনীয়তা, কুরুগণকে জয় করিয়া গোধন ফিরাইয়া আনয়নের গর্ব্ব, ইন্দ্র কর্ত্তৃক দানববিজয়ের উল্লেখ প্রভৃতি রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মূল-অনুসারী অনুবাদ নহে। তারপর মূল মহাভারতে রহিয়াছে যে, উত্তরের কথা শুনিয়া দ্রৌপদী নিজে উত্তরকে অর্জ্জুনের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীদাস উত্তরার দ্বারা বলাইয়াছেন, যথা—

এত শুনি হৃষ্টমনে গেলা যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইলা উত্তরা ভগিনী॥
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাট-নন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরন্ধ্রী সুবদনী॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
সে কারণে আমাকেই পাঠায় ত্বরিত॥
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা সারথি আছিল সেই কালে॥
সৈরন্ধ্রী পাণ্ডব-গৃহে আছিল যখন।
বৃহন্নলা পরাক্রম দেখেছে তখন॥

দ্রৌপদীর উক্তি এখানে উত্তরার মুখে স্থাপন করা হইয়াছে। মূল আদর্শে দ্রৌপদী বলিতেছেন—

যখন অগ্নিদেব বিশাল খাণ্ডববন দগ্ধ করেন তখন ইনিই অর্জ্জুনের অশ্বগণকে ধারণ করিয়াছিলেন। আমি পাণ্ডবভবনে থাকিবার সময়ে ঐ বীরকে দেখিয়াছি। ইত্যাদি।

এইরূপ উলট-পালট থাকিলেও মধ্যে মধ্যে মূল আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। উত্তরা অর্জ্জুনের নিকট আবদার করিয়া বলিতেছেন—

না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন।

আর মূলে রহিয়াছে—

অথৈতদ্বচনং মেঽদ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষামি জীবিতম্॥

অর্থাৎ যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তবে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব।

উত্তর অর্জ্জুনকে সারথির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলে, অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

কা শক্তির্মম সারথ্যং কর্ত্তুং সংগ্রামমূর্দ্ধনি॥
গীতং বা যদি বা নৃত্যং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্।
তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কুতো ময়ি॥

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কাশীদাসের অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

অর্জ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্য-গীত জানি আর তাল-বাদ্য-ধ্বনি॥
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।

তারপর অর্জ্জুন যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে

হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল॥
বৃহন্নলা প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
পুতুল খেলাব মোরা যত কন্যাগণ॥

এই বাক্য তুমি মোর করিও স্মরণ।
যোদ্ধাদের শরীরের বিচিত্র বসন ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ আদি করি জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবে বসন ॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর ॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।

মূলে আছে—

তখন উত্তরা ও তাঁহার সখীগণ বৃহন্নলাকে বলিল—বৃহন্নলা, তুমি যুদ্ধাগত ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে জয় করিয়া আমাদের পুতুলের জন্য নানাবিধ সূক্ষ্ম, মৃদু ও মনোহর বস্ত্র সকল আনয়ন করিও।

মধ্যে মধ্যে এইরূপ সামঞ্জস্য থাকিলেও নূতন সংযোজনার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। অর্জ্জুনের ধনঞ্জয় নামের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশার্থে কাশীদাস গান্ধারী ও কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিবাদের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা মহাভারতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে মাত্র একটি শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—"আমি সকল দেশ জয় করিয়া, বলপূর্ব্বক তত্রত্য ধন আনয়ন করিয়া, সেই ধনের মধ্যেই থাকি, সেই জন্যই লোকে আমাকে ধনঞ্জয় বলে।" (৪। ৪০। ১৩)। এইভাবে আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়া কবি লোক-মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন।

চন্দনদাসের মহাভারত

এই কবি-রচিত মহাভারতের কিয়দংশ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৬৯৪-৬৯৯ পৃঃ)। নিজের পরিচয়ে কবি লিখিয়াছেন—

আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি।
পিতামহ নারায়ণ দত্ত কহিয়ে গোচরি ॥

পিতা পুরুষোত্তম দত্ত করি নিবেদন।
আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সর্ব্বজন॥
দত্ত পদ্ধতি মোদের কেহো নাই জানে।
মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সর্ব্বজনে॥

যে পুথি হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার লিপিকাল ১৫৪৩ শক বা ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব কবিকে কাশীদাসের প্রায় সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। রচনার নমুনা—

পার্থেরে দেখিয়া রাণী হাসিছেন নিতম্বিনী
এই স্বামী শিব দিল মোরে।
এত মনে ভাবি রাণী বন্দিল চরণখানি
তবে রণ করে দুই বীরে॥
বাণে বাণ হানাহানি করিছে প্রমীলা রাণী
পার্থ-বাণ করয়ে সংহার।
নিবারিয়া পার্থ-বাণ বলে রাণী হান হান
নাচে রাণী রথের উপর॥ (ঐ, ৬৯৭ পৃঃ)

প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবিবরণে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থ জৈমিনি ভারতের আদর্শে রচিত হইয়াছিল। ব্যাস-ভারতে অর্জ্জুনের সহিত যে রমণীর যুদ্ধ হইয়াছিল তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা নহে। অতএব ইহাও জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ মাত্র।

বিশারদের মহাভারত

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে এই কবি-রচিত বিরাটপর্ব্বের কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৬৯৯—৭০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১৩১৮ সালের সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত "উত্তর বঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার" প্রবন্ধে লিখিত আছে—

"ইনি ১৫৫৪ শকে মহাভারতের রচনা করেন। ইঁহার বিরাটপর্ব্ব ও বনপর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে।" (ঐ, ৯১৪ পৃঃ)। কিন্তু বিরাটপর্ব্বের রচনা কাল—

বেদবহ্নি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে।
চৈত্র গুরু দিনে পদ বিশারদে ভণে॥

অর্থাৎ ১৫৩৪ শক বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসের বৃহস্পতি বার এই পর্ব্বের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে ইহার পরেও প্রায় বিশ বৎসর (১৫৫৪—১৫৩৪=২০) অতিবাহিত হইয়াছিল। কাশীদাস ১৫২৬ শকে বিরাট পর্ব্বের রচনা শেষ করেন। অতএব ইহার আট বৎসর পরে বিশারদের বিরাটপর্ব্ব রচিত হয়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"মহাভারত খানি সংস্কৃতানুযায়ী ঠিক অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত পাঠ করা গেল তাহাতে নিজ কল্পিত কিছু দেখা গেল না (ব-সা-প, ৬৯৯ পৃঃ)। বস্তুতঃ দীনেশ বাবুর এই উক্তি সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থের কিয়দংশ লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। বিশারদ লিখিয়াছেন—

উত্তর বদতি শুনিয়ক মহাশএ।
মুঞি তহ সারথি হইল নিশ্চএ॥
যাক যুঝিবাক তুমি কর মনোরথ।
তাহার উপরে আমি চালাইব রথ॥
অর্জুন বদতি প্রীত হইলো তোমার।
এখনে দেখিবে তুমি প্রতাপ আমার॥
ভৈরব বিমর্দ (?) আমি করিবো সমরে।
শক্র-শূন্য-সমুদ্র মথিব দিব্য শরে॥

(ঐ, ৭০০ পৃঃ)

তুলনীয়—

উত্তর উবাচ—আস্থায় বিপুলং বীর রথং সারথিনা ময়া।
কতমদ্‌যাস্যসেঽনীকমুক্তো যাস্যাম্যহং ত্বয়া॥

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রীতোঽস্মি পুরুষব্যাঘ্র ন ভয়ং বিদ্যতে তব।
সর্ব্বান্‌ নুদামি তে শত্রূন্‌ রণে রণবিশারদ॥
স্বস্থো ভব মহাবাহো পশ্য মাং শত্রুভিঃ সহ।
যুধ্যমানং বিমর্দ্দেঽস্মিন্‌ কুর্বাণং ভৈরবং মহৎ॥

(সংস্কৃত মহাভারত, ৪।৪৫।১-৩)।

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে উদ্ধৃত "বিমঙ্গ" স্থলে "বিমর্দ্দ" হইবে।

কাশীদাসের মহাভারত এই পদ্ধতিতে রচিত হয় নাই বলিয়া ইহার অনুরূপ রচনা উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কোচবিহারের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, "রাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে বিশারদ কবি কর্ত্তৃক বিরাটপর্ব্ব ও কর্ণপর্ব্ব অনুবাদিত হইয়াছিল।" (ঐ, ১৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

দ্বৈপায়ন দাসের আশ্চর্য্যপর্ব্বাদি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৬২ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে (D. C. III, ৭৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার ভণিতায় দেখা যায় যে, কবি নিজেকে কাশীদাসের তনয় রূপে প্রচার করিয়াছেন, যথা—

কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

(পুথি, ৯ পৃঃ)

অন্যত্র—

আশ্চর্য্য পর্ব্বের কথা যোগমার্গ সার।
যেবা পড়ে যেবা কয় সে করে বিচার॥
তাহারে কলির বাধা নহে কোন কালে।
কাশীদেব-সুতে বলে শুন অবহেলে॥

(ঐ, ১৫ পৃঃ)

কিন্তু কবির নাম যে দ্বৈপায়ন দাস তাহারও নির্দ্দেশ পুথিতে পাওয়া যায়, যথা—

সর্ব্ব দুঃখে তরে সেহ নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে দ্বৈপায়ন দাস কয়॥

(ঐ, ৩০ পৃঃ)

অন্যত্র—

মস্তকে বন্দিয়া দ্বিজগণ পদদ্বন্দ্ব।
কহে দ্বৈপায়ন দাস ভাবিয়া গোবিন্দ॥

এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে কাশীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া (৫,২২,৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ইহাকে উক্ত কবির রচনা বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। দ্বৈপায়ন দাস কয়েকটি আখ্যায়িকা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য কাশীদাসের গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন গ্রন্থ-শেষে উদ্ধৃত নিজের ভণিতার পরেই তিনি লিখিয়াছেন—

শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
ভাষা করি কহিলেন কাশীরাম দাস॥

(ঐ, ৩০ পৃঃ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি নিজের পিতার গ্রন্থই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-বর্ণিত আখ্যায়িকাগুলি পাঠ করিলেই এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। আশ্চর্য্যপর্ব্বের প্রারম্ভ এইরূপ :—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠির রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পাতালের নাগগণ তাঁহাকে দ্রৌপদীসহ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অর্জ্জুন স্বর্গমর্ত্ত্যে অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদের সন্ধান না পাইয়া মনে করিলেন যে, গঙ্গাদেবী ইঁহাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তখন শোষক বাণে গঙ্গাকে শুষ্ক করিতে উদ্যত হইলে তিনি অর্জ্জুনের নিকট আবির্ভূত হইয়া নাগগণ কর্ত্তৃক অপহরণের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সৈন্যসামন্ত সহ অর্জ্জুন পাতালে প্রবেশ করিয়া অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসেন। এই ঘটনা মহাভারতে নাই, কাশীদাসের গ্রন্থেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মহীরাবণের আখ্যায়িকার অনুকরণে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ঘটনার বর্ণনা আছে বলিয়া এই গ্রন্থের নাম আশ্চর্য্যপর্ব্ব রাখা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ইহার পরে যুধিষ্ঠির আসিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। একদিন কৃপাচার্য্য আসিয়া তাঁহাকে মহাপ্রস্থানের পরামর্শ প্রদান করিবার কালে বিবিধ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। অষ্টাবক্র মুনি দণ্ডকারণ্যে যাইয়া এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ রমণী মদন ঋষির ঔরসে তিলোত্তমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা সময়ে ইনি গর্ভধারণ করিলেন, কিন্তু দশমাস অতীত হইয়া গেলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। তখন অষ্টাবক্র গর্ভস্থ শিশুকে আহ্বান করিয়া মাতৃবধ-পাতক হইতে বিরত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন। শুনিয়া গর্ভস্থ শিশু উত্তর করিলেন—

না বুঝিয়া বাক্য তুমি বলহ অজ্ঞানে।
কেবা কার পিতাপুত্র কে কার সন্তানে॥

মায়াতে মোহিত হয়্যা আপনা না জানে।
মোর মাতা মোর পিতা বলয়ে অজ্ঞানে॥

ইত্যাদি

ইহা শুনিয়া অষ্টাবক্র প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, এই শিশু পূর্ব্বজন্মে মনু নামে মুনি ছিলেন, শিবের শাপে অষ্টাবক্রের পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন। পৃথিবী হইতে ক্ষণকালের জন্য মায়া অন্তর্হিত না হইলে তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না। যাহাই হউক অষ্টাবক্রের প্রার্থনায় নারায়ণ মায়াকে প্রত্যাহৃত করিলে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। শুকদেবের জন্মের আখ্যায়িকার আদর্শে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরে ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন ও যজ্ঞাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ৭১৭ সংখ্যক পুথিতে কাশীরাম দাসের ভণিতা-যুক্ত আশ্চর্য্য পর্ব্বের এক অনুলিপি পাওয়া যায়। তাহার প্রারম্ভ এইরূপ—

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
অতঃপর কি করিলা পিতামহগণ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্চর্য্য পর্ব্বের কথা করহ শ্রবণ॥

ইহার পরে এই গ্রন্থে বিদুর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনগমন, তাঁহাদের নিকট ব্যাস-মার্কণ্ড-নারদ প্রভৃতির আগমন ও উপদেশ, ব্যাস-প্রদত্ত দিব্য চক্ষুতে ধৃতরাষ্ট্রের মৃত বান্ধবগণকে অবলোকন, যজ্ঞাগ্নিতে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির প্রাণ-ত্যাগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা আশ্রমিক পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন মাত্র। ঘটনার সমাবেশ দৃষ্টে দ্বৈপায়ন দাসের গ্রন্থ হইতে ইহার বিভিন্নতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। অতএব দ্বৈপায়নকে পৃথক্ কবি রূপেই সিদ্ধান্ত

করিতে হয়। এই কবির বনপর্ব্ব, গদাপর্ব্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব্বের পুথিও পুথিও পাওয়া যাইতেছে (সা-প-পু ২৬১২, ২৩১৮, ১২৪৬ সং দ্রষ্টব্য)।

তন্মধ্যে স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষভাগে কবি এইরূপ ভণিতা প্রদান করিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
দ্বৈপায়ন দাস বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গ আরোহণ॥

(সা-প-পুথি, সং ১২৪৬)।

এখানে কবি যখন নিজেকে কাশীদাসের পুত্ররূপে পরিচিত করিয়াছেন, তখন যাবতীয় উদ্ভট কল্পনার আর অবকাশ নাই। নন্দরাম কোন ভণিতাতেই নিজেকে কাশীর তনয় বলিয়া প্রচার করেন নাই। কিন্তু এখানে নিঃসন্দেহে দ্বৈপায়নকে কাশীর পুত্ররূপে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বৈপায়নের আশ্চর্য্যপর্ব্বের সহিত কাশীদাসের রচনার মিল না থাকিলেও অন্যত্র রচনাসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গদাপর্ব্বে দ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বকথা মনে করি ধর্ম্ম পরিহরি।
দুর্য্যোধন-বধ হেতু করে গদা ধরি॥
বিপরীত পরাক্রম করিয়া ধাইল।
দেখি দুর্য্যোধন রণে পুনঃ সাজি আইল॥

* * * *

সমরে নিয়ম আছে গদার যুদ্ধেতে।
যতেক প্রহার করি নাভির উর্দ্ধেতে॥ ইত্যাদি

সা-প-পুথি, ২৬১৮, ৮ পৃঃ)

ইহার সহিত তুলনীয় কাশীদাসের রচনা—

কৃষ্ণবাক্য মনে করি ধর্ম্ম পরিহরি।
দুর্য্যোধন-বধ হেতু হাতে গাদা ধরি॥
বিপরীত অপমান পাইয়া ধাইল।
দেখি দুর্য্যোধন পুনঃ রণে প্রবেশিল॥

* * * *

সমরে নিয়ম আছে গদার যুদ্ধেতে।
যতেক প্রহার করি নাভির উর্দ্ধেতে॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১১৪৭ পৃঃ)

স্বর্গারোহণ পর্ব্বেও এইরূপ রচনা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অতএব একের রচনা অন্যের নামে চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ব্বাদি

বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন —"সম্প্রতি আমরা কাশীরাম-সুত-রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের একখানি ১১৮২ সনে লিখিত পুথি পাইয়াছি, তাহাতে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

দ্বিজপদরজ লয়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন॥

উক্ত ভণিতা হইতে বোধ হয় সে, কাশীরাম আপন পুত্র নন্দরামকে মহাভারত সম্পূর্ণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।" (ঐ, ২৵০ পৃঃ)। কিন্তু যে

পর্ব্বের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা নন্দরামের রচিত নহে। কাশীদাসের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস ইহার রচয়িতা কারণ গ্রন্থশেষের ভণিতায় রহিয়াছে—

দ্বৈপায়ন দাস বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গ আরোহণ॥

(সা-প-পুথি, সং ১২৪৬)

নন্দরাম যে কাশীদাসের পুত্র ইহা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃকও প্রচারিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"কাশীরামদাসের পুত্র স্বীয় পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৩য় সং, ১৩১ পৃঃ)। তৎপর পাদটীকায় উক্ত * চিহ্নিত "পুত্র" শব্দের পরিচয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"পুত্রের নাম এক্ষণে জানা গিয়াছে, তাঁহার নাম নন্দরাম দাস।" দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, অথচ তাহাতে দাতার নামের উল্লেখ নাই, ইহা সন্দেহের বিষয়। বিশেষতঃ কি প্রমাণ বলে তিনি কাশীর তনয়কে অবশেষে নন্দরাম বলিয়া স্থিরীকৃত করিলেন, তাহারও উল্লেখ করিয়া যান নাই, এবং এই দানপত্র তিনি প্রকাশিতও করেন নাই। নন্দরাম যে কাশীদাসের ভ্রাতা গদাধরের পুত্র তাহার নির্দ্দেশ কবি নিজেই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নন্দরামের রচিত উদ্যোগপর্ব্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে (সা-প-পুথি, সং ১২৪২ দ্রষ্টব্য)। ইহাতে কবি লিখিয়াছেন—

নন্দরাম দাসে বলে শুন শ্যামরায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ জম-দায়॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক-কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥

তাঁর আশীর্ব্বাদে আর ব্রাহ্মণ-কৃপাতে।
দিনে দিনে আশয় হৈল্য ভারত রচিতে ॥

(ঐ, ৩ পৃঃ)

অতএব যাবতীয় উদ্ভট পরিকল্পনার এখানেই পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। নন্দরাম কোন ভণিতাতেই নিজেকে কাশীর তনয়রূপে প্রচারিত করেন নাই।

নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সনের একখানি দামোদরের পদাবলীর উপর লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন নন্দরামদাসের মৃত্যু ঘটে" (বিজয়-পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা, ২৶৹ পৃঃ)। তাহা হইলে তিনি ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্রের এপর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব নহে।

নন্দরামের উদ্যোগপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব ও কর্ণপর্ব্বের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে (ব-সা-পরিচয়, ৭১১—৭১৬ পৃঃ; বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা, ২—২৷৹ পৃঃ; D. C. III, ৭৮১—৭৮৩ পৃঃ; সা-প-পুথি, সং ১২৪২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উক্ত তিন পর্ব্বের রচনার সহিতই কাশীদাসের মহাভারতের রচনার আশ্চর্য্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। অর্জ্জুনের যুদ্ধে কুরুসৈন্য নষ্ট হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে বলিতেছেন—

দেখ গুরু সৈন্য মোর হইল নিধন ॥
সেনাপতি কৈনু তোমা বড় প্রতিআশে।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে করিলে আশ্বাসে ॥
আজিকার যুদ্ধে কার নাহিক নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় কৈল সকলি সংহার ॥

সেনাপতি আগে যদি করিথু কর্ণেরে।
এতদিনে কর্ণবীর দিথ যুধিষ্ঠিরে ॥
(নন্দরামের দ্রোণপর্ব্ব, কঃ বিঃ ২১৯২ সংপুথি)

আর কাশীরামের মহাভারতে আছে—

দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন ॥
তোমায় সেনানী করিলাম করি আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে করিলে আশ্বাস ॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম-ধনঞ্জয়ে করে সকলে সংহার ॥
সেনাপতি করিতাম যদি কর্ণবীরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে ॥
(উদ্ভটসাগর সং, ৯৮০ পৃঃ)

চক্রব্যূহে প্রবেশ করিতে যুধিষ্ঠির আদেশ করিলে অভিমন্যু বলিতেছেন—

অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
প্রবেশ জানিএ আমি না জানি নির্গম ॥
জেই কালে ছিনু মুঞি জননী-জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি সুন নৃপবরে ॥
(বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি)

ইহার সহিত তুলনীয়—

অভিমন্যু বলে রাজা করি নিবেদন।
প্রবেশ জানি যে আমি না জানি নির্গম ॥
যেইকালে ছিনু আমি জননী-জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে ॥
(উদ্ভটসাগর সং, ৯৮৫ পৃঃ)

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—কাশীদাসের দ্রোণপর্ব্ব এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ব্ব—একই গ্রন্থ" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, ৪৭০ পৃঃ)। কর্ণপর্ব্বেও এই প্রকার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কর্ণের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নকুল বলিতেছেন—

যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তোমা হইতে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম্ম অবতার॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ তুই অল্পবুদ্ধি।
কিছু না জানিস তুই বিক্রমের শুদ্ধি॥ ইত্যাদি

(বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা, ২ পৃঃ)।

আর কাশীদাসের মহাভারতে রহিয়াছে—

যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তোমা হৈতে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম্ম অবতার॥ ইত্যাদি

(উদ্ভটসাগর সং, ১০৬৩ পৃঃ)

শুধু তাহাই নহে বিজয় পণ্ডিতের রচনার সহিত যে ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও নগেন্দ্রবাবু প্রদর্শন করিয়াছেন (বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা, ২/০ পৃঃ)। এইভাবে একের রচনা অন্যের নামে চলিয়া যাইতেছে।

নন্দরামের কর্ণ ও দ্রোণ পর্ব্বের সহিত কাশীদাসের রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও উদ্যোগ-পর্ব্বে নন্দরামের খাঁটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে—

সর্ব্ব আগে যুধিষ্ঠির আপনি সত্বরে।
পূজিলেন পাদপদ্ম পরম সাদরে॥
মৃগমদ কস্তুরি সুগন্ধী মলয়জ।
বসন ভূষণে পূজা করিলা মাধব।
অক্ষত অম্লান মাল্য মাণিক অঙ্গুরী।
সিংহাসনে বসাইলা বহু পূজা করি॥

(সা-প-পুথি, সং ১২৪২, ১৯ পৃঃ)

কিন্তু কাশীরামের মহাভারতে অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে—

কৃষ্ণেরে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রীত॥
যদিও গোবিন্দ বদ্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন সিংহাসনে॥

(উদ্ভটসাগর সং, ৮১৮ পৃঃ)

নন্দরাম যুধিষ্ঠিরকে দিয়া কৃষ্ণের পূজা করাইয়াছেন, কিন্তু কাশীরামের ভারতে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবার আসিয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিয়াছেন।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—

অন্ধরে গর্জ্জিয়া বলে গান্ধার তনয়।
আসি উপস্থিত হৈল আপদ-সময়॥
শুন বাপু ধৃতরাষ্ট্র তোরে আমি বলি।
দুর্য্যোধন পুত্র তোর মজাব সকলি॥

না শুনিল কার কথা করি অহঙ্কার।
সমূহ সবংশ সব হইব সংহার॥

(পুথি ৫৫ পৃঃ)

এই রচনার সাদৃশ্য কাশীরামের মহাভারতে পাওয়া যায় না। কাশীরাম কর্ণ-কুন্তী সংবাদে উদ্যোগ-পর্ব্ব শেষ করিয়া লিখিয়াছেন—

ভারতে শ্রীকৃষ্ণলীলা করিলে শ্রবণ।
পাতক শ্রোতার দেহে না রহে কখন॥
উদ্যোগ পর্ব্বের মত পর্ব্ব নাহি আর।
বিদুর-সনৎসুজাত প্রমাণ ইহার॥
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্।
উদ্যোগ-পর্ব্বের কথা হৈল সমাধান॥

(উদ্ভটসাগর সং, ৮৮২ পৃঃ)

কিন্তু নন্দরামের পরিসমাপ্তি এইরূপ—

মায়াজালে বদ্ধ ভাই বৃথা গেল কাল।
সকল ছাড়িয়া ভজ নন্দের গোপাল॥
গৃহ দারা পরিবার সকলি অনিত্য।
বাজিয়ার বাজি যেন জানিহ নিশ্চিত॥
কোথা কে যাইতে যেন করিলে মনন।
ঘর হৈতে ত্বরান্বিত করএ গমন॥
পথের মধ্যেতে নদী বহে খরতরে।
নৌকার বিহনে যেন বস্যা থাকে তীরে।
নৌকা পেয়ে পার হয়্যা যেন যায় সুখে।
ভবসিন্ধু পার হবে কৃষ্ণ বলে মুখে॥

(ঐ পুথি, ১০১ পৃঃ)

অতএব অন্ততঃ উদ্যোগপর্ব্বে আমরা নন্দরামের রচনার সন্ধান পাইতেছি। কাশীরামের আদেশে নন্দরাম স্বাধীনভাবেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণের অপকীর্ত্তিতে নন্দরামের রচনা কাশীদাসী মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিজ শ্রীনাথের মহাভারত

এই গ্রন্থের আদি পর্ব্বের ভণিতা এবং মুসল-পর্ব্বের কতকাংশ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৭০৪-৭ পৃঃ)। ইহা হইতে মনে হয়, কবি বোধ হয় সমগ্র মহাভারতই অনুবাদিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কবির বিরাট, ভীষ্ম ও দ্রোণপর্ব্বের পুথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্রোণপর্ব্বের ভণিতায় কবির কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

মল্ল মহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর।
শুক্লধ্বজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর॥
তাহার পদক মহামান্য ভবানন্দ।
কামরূপদ্বিজকুলকুমুদিনীচন্দ্র॥
নামত পণ্ডিত রায় তাহার তনয়।
রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয়॥
তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর শুদ্ধমতি।
শ্রীনাথ হৈলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি॥
পয়ার করিতে প্রাণ ভূপে আজ্ঞা দিল।
দ্রোণপর্ব্ব ভারতের পদ বিরচিল॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অন্যত্রও প্রাণনারায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে—

রত্নপৃষ্ঠে মহারাজা প্রাণনারায়ণ।
জঙ্গম জল্লীশ যাক বোলে সর্ব্বজন॥

প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

কবির রচনার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

পুত্র-শোক ভীম মোর দহিল হৃদয়।
পুড়িব শরীর আমি শুন মহাশয়॥
কি কারণে প্রাণ ধরে বীর ধনঞ্জয়।
কি কারণে প্রাণ ধরে ধর্ম্মের তনয়॥
অশ্বথামা বীর মোর হৈল কালানল।
পুত্র-শোকে সুভদ্রা বড়ই বিকল॥
অশ্বথামার শিরোমণি হাতে পাও যবে।
মোর হৃদয়ের তাপ পলাইবে তবে॥

(ব-সা-প, ৭০৬ পৃঃ)।

কিন্তু কাশীদাসের মহাভারতে আছে—

অতঃপর কৃষ্ণা কন অতি শোকবশে।
অশ্বথামা-মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি॥

তবে শোক নিবারণ হইবে আমার।
নহে ভ্রাতৃ-পুত্র-শোকে না বাঁচিব আর॥

ঐষিক পর্ব্ব

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি স্বাধীনভাবেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাশীদাসের মহাভারত বোধ হয় সেই সময়ে সুদূর কোচবিহার রাজ্যে প্রচারিত হয় নাই, কারণ উভয়ের আবির্ভাবের ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। কোচবিহারের ইতিহাসে লিখিত আছে—"শ্রীনাথের লিখিত আদি-পর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর পুথি কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে।" (ঐ, ১৬৩ পৃঃ)। ইহা ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় "বিশ্বসিংহচরিতম্" কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন (ঐ)। এই গ্রন্থের ১৭শ পত্রে নাকি "ভূদেব রামেশ্বরের পুত্র নবীন কবি শ্রীনাথ বিরচিত এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়। শ্রীনাথ রামেশ্বরের পুত্র, এবং ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন।" (ঐ, ঐতিহাসিক উপাদানাবলী, ১ পৃঃ)। কোচবিহারের ইতিহাসে ইহাও লিখিত আছে যে, রাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে কবির পিতা "দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ, এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণমিশ্র প্রহ্লাদচরিত্র রচনা করিয়াছিলেন" (ঐ,১৬১ পৃঃ)। অতএব এই কৃষ্ণমিশ্র শ্রীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইবেন বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে শ্রীনাথের পিতা, শ্রীনাথ, এবং তাঁহার ভাই সকলেই কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপ বংশগত কবিপ্রসিদ্ধি কাশীদাসের পরিবারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। রামেশ্বরের মহাভারতের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

কৃষ্ণানন্দ বসুর শান্তিপর্ব্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৯৭ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। ইহার কতকাংশ অন্যত্রও মুদ্রিত হইয়াছে (D, C, III,

৭৮৭-৮ পৃঃ, এবং ব-সা-পরিচয়, ৭২৬-৭২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ :—

বৈশম্পায়ন বলে স্থন জন্মেজয়।
ভীষ্ম পিতামহ-শোকে ধর্ম্মের তনয়॥
জলহীন সরোবর নহে স্থশোভন।
বৃহস্পতি বিনে যেন সহস্রলোচন॥
সূর্য্যের বিহনে যেন কমলের দল।
ভীষ্ম-দ্রোণাচার্য্য বিনে নৃপতি বিকল॥

(D, C, III, ৭৮৭ পৃঃ)

এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া ধর্ম্মরাজের মনে আত্মনিধনের সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। অন্তর্য্যামী ব্যাসদেব ইহা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তোমার আবার পাপ কোথায়—

তুলারাশিসম পাপ শুনহ রাজন।
ধর্ম্মের কারণে ভস্ম হয় ততক্ষণ॥

(পুথি, ২ পৃঃ

বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবান তোমার সহায়,—

তবে কেন পাপ ভয় করহ রাজন।

আর আত্মবধের পরিণাম শ্রবণ কর—

ব্রহ্মবধ গোবধ আদি যত পাপগণ।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে বেদের বচন॥
আত্মঘাতী পাপের নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম পুরাণে কহে বেদের ভারতি॥

ইহাতেও যদি তুমি সুস্থ না হও তাহা হইলে ভীষ্মের নিকটে গমন কর। ব্যাসের উপদেশ অনুযায়ী যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্মদেব বিবিধ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে শান্তিদানে যত্নবান হইলেন। এইজন্য এই পর্ব্বের নাম শান্তিপর্ব্ব।

ইহা হইতে কৃষ্ণানন্দের শান্তিপর্ব্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। সংস্কৃত মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অধ্যায়। ব্যাস প্রভৃতির বহু উপদেশের পরে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়াছেন। এখানে কেবল সূত্ররূপে তাহার কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শান্তিপর্ব্বের এই পুথি-খানি মাত্র ৫৫ পত্রে শেষ হইয়াছে। অতএব ইহাতে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই।

যুধিষ্ঠির মৃত্যুর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম বলিলেন যে, ভগবতীর ললাট-নির্গত ঘাম হইতে মৃত্যুর জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু কাশী-দাসের মহাভারতে মৃত্যুরূপা নারী ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্যাস-ভারতেও ব্রহ্মাই মৃত্যুরূপা নারীর সৃষ্টিকর্ত্তা (শান্তিপর্ব্ব, ২৫৭ অধ্যায়)। যাহাই হউক, যমপুরীর বর্ণনার পরে এই গ্রন্থে হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে কাশীদাসের রচনার সহিত আশ্চর্য্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। নারদ বিষ্ণুকে স্তবে পরিতুষ্ট করিলে তিনি বর প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন নারদ বলিতেছেন—

এত শুনি হাসিয়া বলেন তপোধন।
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্করে।
তে কারণে গোবিন্দ মানি যে পরিহারে॥
বর যদি দিবে তবে দেহ নারায়ণ।
তব গুণ-গান গাইয়া যেন ভ্রমি অনুক্ষণ॥

(ব-সা-পরিচয়, ৭২৭ পৃঃ)

আর কাশীদাসের মহাভারতে আছে—

ইহা শুনি নারদ কহেন যোড়হাত।
নিবেদন করি কিছু শুন জগন্নাথ॥
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্করে।
সে কারণে শ্রীগোবিন্দ মাগি পরিহারে।
যদি বর দিবে এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গাহি যেন ভ্রমি অনুক্ষণ॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১২৫০ পৃঃ)

তারপর পাপীদের দুঃখ দেখিয়া—

হরিনাম মাধব গোবিন্দ দামোদর।
এত বলি কর্ণে হাত দিল মুনিবর॥
এই শব্দ যত যত পাতকী শুনিল।
শ্রুত মাত্র হৈতে নাম পাপমুক্ত হৈল॥
প্রেত-মূর্ত্তি ত্যজি সবে হৈল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গপুরে যায়॥

(ব-সা-পরিচয়, ৭২৯ পৃঃ)

তুলনীয় কাশীদাসী মহাভারতে—

গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর।
ইহা বলি কর্ণে কর দেন মুনিবর॥
সেই শব্দ যত সব পাতকী শুনিল।
শ্রুতিমাত্র সবাকার পাপ দূর হৈল॥
প্রেত-মূর্ত্তি ত্যজি সবে হৈল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গপুরে যায়॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১২৫১ পৃঃ)।

দ্বিজ কৃষ্ণরামের অশ্বমেধ-পর্ব্ব

কবি জৈমিনি-ভারত অবলম্বনে ইহা রচনা করিয়াছেন, যথা—

অদ্ভুত ভারত-কথা জয়মুনি কহে তথা
জন্মেজয় শুনে সাবধানে।

(কঃ বিঃ ২৮৬৯ সং পুথি, ৭৯ পৃঃ)

কবি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—

রচে দ্বিজ কৃষ্ণরাম ভজ মন ঘনশ্যাম
অন্তকালে পাইবে গোপাল।

(ঐ, ৪৭ পৃঃ)

এবং তিনি "পণ্ডিত" আখ্যায়ও নিজেকে প্রচারিত করিয়াছেন, যথা—

পদবন্ধে রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণরাম।

(ঐ, ১৪২ পৃঃ)

অন্যত্র—

পদবন্ধে কৃষ্ণরাম পণ্ডিতে যে ভণে।

(ঐ, ১১৫ পৃঃ)

এই গ্রন্থে প্রবীর-নীলধ্বজের যুদ্ধ, সুরথের উপাখ্যান প্রভৃতি জৈমিনি ভারতের আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রথমভাগের কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৭৩৯—৭৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার সহিত কাশীদাসের রচনাগত কোন সাদৃশ্য নাই। যুধিষ্ঠিরের স্মরণে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দ্বারীকে বলিতেছেন—

কৃষ্ণ বলে দ্বারী শুন আমার বচন।
রাজাকে জানাহ তত্ত্ব মোর আগমন॥
হাত-যোড়ে বলে দ্বারী ধরি দুই পাএ।
অভ্যন্তরে চল প্রভু আপন ইচ্ছাএ॥

পুনরপি গোবিন্দ বলিল তার তরে।
আজ্ঞা বিনু না যুয়ায় যাইতে অভ্যন্তরে।

(ব-সা-পরিচয়, ৭৩৯ পৃঃ)

কিন্তু কাশীদাস এক কথায় ইহা সারিয়া দিয়াছেন—

যুধিষ্ঠিরের স্মরণেতে আইলা সে হরি॥
দ্বারী গিয়া জানাইল ধর্ম্মের গোচরে।
শুন রাজা হৃষিকেশ আসিলেন দ্বারে॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১৩৪০ পৃঃ)

জৈমিনি-ভারতে আছে যে, পার্ব্বতী এক সরোবরের তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময় এক দৈত্য আসিয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলে তিনি শাপে তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন, এবং বলিলেন যে, কোন পুরুষ এই সরোবরে প্রবেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে। আবার অকৃতব্রণ নামধেয় কোন মুনি আর একটি সরোবরে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক কুম্ভীর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তিনি এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, এই সরোবরের জল যে স্পর্শ করিবে সেই ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইবে (জৈমিনি-ভারত, ২১শ অধ্যায়)। অর্জ্জুনের অশ্ব উক্ত উভয় সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া প্রথমে ঘোটকী এবং পরে ব্যাঘ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনায় কৃষ্ণরামের গ্রন্থে পার্ব্বতী বলিতেছেন—

এখানে পুরুষ আইলে আমি পাব লাজ॥
পুরুষ হইয়া যদি এথা কেহো আইসে।
তখনে হইবে নারী এ জল-পরসে॥

(কঃ বিঃ ২৮৬৯ সং পুথি, ৬৬ পৃঃ)

কিন্তু কাশীদাস শাপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

পুরুষ হইয়া যেই আসে সরোবরে।
নারী-রূপ হবে সেই শাপিলাম তারে॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১৩৯৩ পৃঃ)

তারপর উক্ত মুনির নাম কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন কৃতবর্ণ। ইহা অকৃতব্রণ শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। কিন্তু কাশীদাস মুনির নামকরণ করিয়াছেন—

মিত্রসেন-নামে মুনি ছিল এই বনে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কৃষ্ণরাম কাশীরামকে অনুকরণ করেন নাই।

এইকৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণরাম শর্মা যে সমগ্র মহাভারতই রচনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ হইতে পাওয়া যায় (ঐ ১৩০৫, পৃঃ ২৮৩-২৮৭)। গ্রন্থখানি "বিজয় পাণ্ডব-কথা" রূপে প্রচারিত হইয়াছিল, যথা—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোক করে উপকার॥

অন্যত্র—

বিজয় পাণ্ডব নাম অমৃত সমান।
মুনিবর কহে রাজা জনমেজয় স্থান॥ ইত্যাদি

গ্রন্থকার যে জৈমিনি-ভারত আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই—

জয়মুনি বলে জনমেজয় স্থানে।
সৌপ্তিক পর্বের কথা এহি সমাধানে॥

অন্যত্র—

জয়মুনি কহেন কথা জনমেজয় স্থানে।
আশ্রম পর্বের কথা এহি সমাধানে॥ ইত্যাদি

তথাপি পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় ইহাকে ব্যাসভারতের আদর্শে প্রচারিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কারণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ উক্তিও পাওয়া যায়, যথা—

বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থানে।
আদি পর্বের কথা এহি সমাধানে।

অন্যত্র—

কহে বৈশম্পায়ন জনমেজয় স্থান।
স্ত্রী-পর্বের কথা এহি সমাধান॥

একটি ভণিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে—

পুণ্যকথা অনুপাম অমৃতরসময়।
বাগীশ্বরী প্রণমিয়া কৃষ্ণদাসে কয়॥

এই বাগীশ্বরী হইতেই বাসলী শব্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের কবি বড়ু চণ্ডীদাস এই বাসলীকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নান্নুরের বাসলীও সরস্বতী মূর্ত্তি, অথচ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা বাসলীর সহিত ইহাকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার জের এখনও চলিয়া যাইতেছে।

অনন্তমিশ্রের অশ্বমেধপর্ব্ব

কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

বাপ কৃষ্ণানন্দ বসু সংজ্ঞা জননী।

ইহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ, এবং মাতার সংজ্ঞা ছিল "বসু"। তাঁহার নাম বোধ হয় বসুমতী বা বসুধা ছিল, এইজন্য তাঁহাকে সংক্ষেপে "বসু" নামে অভিহিত করা হইত। নরোত্তমবিলাসের

অনেক স্থলেও বসুধাকে কেবল "বসু" রূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন লেখক "বসু" শব্দটি কৃষ্ণানন্দের পদবীরূপে গ্রহণ করিয়া বসু উপাধিযুক্ত কায়স্থের মিশ্র উপাধিযুক্ত পুত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"অনন্ত মিশ্রের পিতার নাম কৃষ্ণরাম মিশ্র" (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ৭৩১ পৃঃ)।

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে এই গ্রন্থের কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৭৩১-৭৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহাতে ময়ূরধ্বজ রাজার আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে। জৈমিনি ভারতের ৪৬ম অধ্যায় হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। রাণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, কবি আদর্শ গ্রন্থ যত্নের সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। ময়ূরধ্বজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র করাত দ্বারা তাঁহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিবেন, এবং তাহাতে তাঁহার এক বিন্দুও চক্ষের জল পতিত হইবে না। এইভাবে বিভক্ত তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ এক ব্যাঘ্রের ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণকে প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু—

নাসার উপরে মাত্র আসিতে করাত।
বামচক্ষে নৃপতির হয় অশ্রুপাত ॥
অশ্রুপাত দেখি বিপ্র বলেন বচন।
আর কার্য্য নাহি দেহ চির কি কারণ ॥
পূর্ব্বে ব্যাঘ্র বলিল আমার গোচরে।
দেহদান-কালে রাজা হয়ত কাতরে ॥
তবে ত দক্ষিণ-অঙ্গে নাহি মোর কাজ।
শরীর-দানকালে ক্রন্দন মহারাজ ॥
শুনিয়া হাসিল রাজা বিপ্রের বচন।
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন ॥

দ্বিজ কার্য্যে সব্যভাগ কৃষ্ণার্পণ হয়।
বাম ভাগ ব্যর্থ হয় ব্রাহ্মণে না লয়॥
তেই বাম চক্ষুর জল পড়েত আমার।

(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৭৩৪ পৃঃ)

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে পুথি হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার লিপিকাল ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব কবি অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, কাশীদাসের মহাভারতের সহিত ইহার রচনা-গত সাদৃশ্য নাই। উদ্ধৃত আখ্যায়িকা কাশীদাস এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

মাতাপুত্রে আনন্দিত রাজার বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
নৃপতির পুরেতে উঠিল হাহাকার।
বামচক্ষে রাজার পড়িল জলধার॥
অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকত-বৎসল॥
আর অর্দ্ধ অঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রদ্ধার দান আমি না করি গ্রহণ॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১৪২৩ পৃঃ)।

অতএব কাশীরামের প্রভাব অনন্তমিশ্রের উপরে পতিত হয় নাই। কবি আদর্শ গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া স্বাধীন ভাবেই কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজ গোবর্দ্ধনের গদাপর্ব্ব

কবির কিছু পরিচয় তাঁহার গ্রন্থশেষে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যথা—

শকাব্দা পক্ষের রাম সুগণন।
রসে পূর্ণ হৈতে শশী পুথি সমাপন॥

কলিতে পুস্তক সাঙ্গ শুক্লনবমীতে।
গুরুর চরণ দ্বিজ ভাবি হৃদয়েতে ॥
নিবাস শাণ্ডিলপুর জগজনে খ্যাত।
শ্রীকবিশেখর তাহে লোকে অবগত ॥
তাহার তনয় নাম দ্বিজ গোবর্দ্ধন।
গদাপর্ব্ব রচিলেক আনন্দিত মন ॥

(সা-প-পুথি, সং ২৫৭২)

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কবির বাড়ী ছিল শাণ্ডিলপুর, এবং তাঁহার পিতার নাম কবিশেখর। দ্বিজ উপাধি ব্যবহারে জানিতে পারা যায় যে, কবি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে একাধিক কবিশেখরের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে গোপাল বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা কবিশেখরের নাম ছিল দৈবকীনন্দন সিংহ। অতএব তিনি দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধনের পিতা হইতে পারেন না। পদাবলীর রায়শেখর বা কবিশেখর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সতীশ রায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি খেতরীর উৎসবের পূর্ব্বে অপ্রকট হইয়াছিলেন। (তরুর ভূমিকা, ২১৮ পৃঃ)। অতএব নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য এই কবিশেখর যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা তাহাও জানা যায় না। আর তাহা হইলেও তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন যে ইহার শতাধিক বৎসর পরে এই গদাপর্ব্ব রচনা করিয়াছেন ইহাও সম্ভবপর নহে। অপরপক্ষে কালিকামঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা বলরাম চক্রবর্ত্তীর উপাধি ছিল কবিশেখর। গোবর্দ্ধন যে কোন বিখ্যাত কবিশেখরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখানে বলরামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানা যাইতেছে। হয়ত এই কবিশেখরকেই কবি নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন।

উপরে "পুথি সমাপনের" যে শকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ-সমাপনের তারিখ, কারণ ইহার পরেই লিপিকারের নাম ও পুথি সমাপনের তারিখ লিখিত আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ১৬৩২ শকে (পক্ষ=২ ; রাম=৩ ; রস=৬ ; শশী=১) অর্থাৎ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই হিসাবে কবি কাশীদাসের প্রায় শতাধিক বৎসর পরবর্ত্তী। পরবর্ত্তী হইলেও এই গ্রন্থে কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না। কবি বোধ হয় স্বাধীনভাবেই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ—

সমরে পড়িল শল্য নৃপতিশেখর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল ফাফর॥
একাদশ চর্ম্মপতি ছিল দুর্য্যোধন।
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থমা বাঁচে তিনজন॥
সপ্ত অক্ষৌহিনী-পতি যুধিষ্ঠির ছিল।
জনকত বাঁচে আর সকল পড়িল॥
পঞ্চ সহোদর আর কৃষ্ণ মহাশয়।
সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদ-তনয়॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র উত্তমৌজা আর॥
এহা ভিন্ন সর্ব্বসৈন্য হইল সংহার॥

(ঐ, ১ পৃঃ)

এইভাবে গ্রন্থারম্ভ করিয়া কবি ঐষীক পর্ব্বের ঘটনাও এই গদাপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্য্যোধনের মৃত্যু সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

পুত্রগণ নাহি করে দিবসে শয়ন।
দধি-অন্ন নাহি করে নিশিতে ভোজন॥

বয়োধিকা নারী নাহি করয়ে বেভার।
রজস্বলা স্পর্শ নাহি কৈল কদাচার॥
তবে কেন অল্পদিনে হইল নিধন।

(ঐ, ৫৩ পৃঃ)

ইহারই প্রতিধ্বনি এইভাবে কাশীদাসের স্ত্রীপর্ব্বে মিলিতেছে—

নিদ্রা নাহি যেত দিনে যত মোর পুত্রগণে
রাত্রিকালে দধি না খাইত।
গর্ভিণীর সহবাস না তারা করিত আশ
রজস্বলা স্পর্শ না করিত॥

(উদ্ভটসাগর সং, ১১৭৮ পৃঃ)

ভারতসাবিত্রীর একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া যে ইহা রচিত হইয়াছে তাহা উদ্ভটসাগর মহাশয় পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐষীক পর্ব্বে অশ্বত্থমা ব্রহ্মশির অস্ত্র ত্যাগ করিয়া উত্তরার গর্ভনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন লিখিয়াছেন যে, অশ্বত্থমা অস্ত্র নিক্ষেপ না করিয়া কেবল শাপের প্রভাবেই ইহা সংঘটিত করিয়াছিলেন, যথা—

হাতে জল লৈয়া শাপ দিল ক্রোধ মনে।
বংশে নাহি থাকে কেহ পাণ্ডবনন্দনে॥ ইত্যাদি

অবশেষে—

এতদূরে গদাপর্ব্ব হৈল সমাপণ।
ব্যাসের বচন বিনে অন্য নাহি মন॥

রামলোচনের নারীপর্ব্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭০ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের এক অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, কবি বর্দ্ধমানের রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কবির নিবাস ছিল কৃষ্ণনগরে, এবং তাঁহার পিতামহের নাম সীতারাম, পিতার নাম রামনারায়ণ। কবি আর একটি সংবাদও আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন যে, দর্পনারায়ণ বসুর পুত্র জগন্নাথের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতির বন্ধন ছিল। কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুসরণ করিয়া তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও কবি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিনয়বশতঃ তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণবংশের "অশ্রুত তনয়" (মূর্খ পুত্র) রূপে প্রচার করিয়াছেন।[১]

১। সম ইন্দ্র তেজে চন্দ্র নামে মহারাজ।
হৃষ্ট মনে বর্দ্ধমানে করয়ে বিরাজ ॥
শিশুকালে প্রজাপালি জগতে বিদিত।
বঙ্কিমুখে সকৌতুকে তাহার আশ্রিত ॥
গোপীনাথ লোকে খ্যাত এ কৃষ্ণনগরে।
নারায়ণ নাম জান তথি ঘর করে ॥
তার সুত এ ভারত করিল রচন।
শ্রুতকর নাম তার শ্রীরামলোচন ॥
(ঐ, ২৩ পত্র)।

অন্যত্র—

অশ্রুত সন্তানআমি জাতিএ ব্রাহ্মণ।
কাশী অনুসারে কহি করিএ ভঞ্জন ॥
জনক রাজার সুতা শেষে রাম নাম।
তস্য সুত রামনারারণ গুণধাম ॥
তার পুত্র ভণে নাম শ্রীরামলোচন।
জগন্নাথে জান জার সমান জীবন ॥
(ঐ, ১১ পৃঃ)

অবশেষে-

জগন্নাথ সঙ্গে মোর পৃত অতিশয়।
গৌতম কুলেতে দর্পনারায়ণ তনয় ॥
বিখ্যাত কুলেতে বসু কুলে জন্ম লৈল।
রজনীতে গ্রন্থ-লিপি সমার্পণ হৈল ॥
(ঐ, পৃঃ ৪০)।

কাশীরাম দাসকে অনুসরণ করিয়া কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিলেও সর্ব্বত্র তিনি উক্ত আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈশম্পায়ন সর্ব্বপ্রথম অভিমন্যুর বীরত্ব কাহিনী, এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভ রক্ষার বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনার জন্য বিদুর কর্ত্তৃক সগরবংশ ধ্বংসের আখ্যায়িকা ও ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। "আমার পুত্রগণের কি গতি হইবে?" ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বিদুর বলিলেন যে, নারায়ণকে দর্শন করিয়া যাহারা প্রাণত্যাগ করে তাহাদের সর্গে গতি হয়,

কারণ—

খঞ্জনের নড়ি প্রভু অন্ধের নয়ন।
বধিরের শ্রুতি তিহো দেব নারায়ণ॥
আপনি আছেন প্রভু সভার অন্তরে।
পাবক মলিন জেন ভস্মের ভিতরে॥
কর্ম্ম অনুসারে লোক করএ প্রকাশ।
দৃষ্টি কৈলে জায় শীঘ্র বৈকুণ্ঠ নিবাস॥

(ঐ, ৭ পৃঃ)

তৎপর দেবীভাগবত হইতে (ঐ, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ২৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) নারদ কর্ত্তৃক সঞ্জয় রাজার কন্যাকে বিবাহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরে কংসের বধের জন্য কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকায় গমন পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত রহিয়াছে। তৎপর পুরঞ্জন রাজার উপাখ্যান, ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহভীম চূর্ণের বিবরণ এবং কৌরব বীরগণের প্রেতকৃত্য সম্পাদন প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে। গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—

জদ্যপি থাকএ মোর তোমাতে ভকতি।
অভিশাপ দিলু আমি শুন জদুপতি॥

কপটে করিলে নষ্ট আমার নন্দন।
এইরূপে জদুবংশ হইবে নিধন।

(ঐ, ৩৩ পৃঃ)

কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের উদ্দেশে জল প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বলিবার কালে কুন্তী বলিলেন—

কুন্তী বলে শুন বাপু আমার বচন।
কুরঙ্গী উদরে সিংহ একথা কেমন॥
শৃগালী উদরে কোথা জন্মে গজপতি।
বায়সী হইতে নহে খগেন্দ্র উৎপত্তি॥

অবশেষে যুধিষ্ঠির অভিশাপ প্রদান করিলেন—

আজি আমি শপিলাম শুন ভোজসুতা।
নারীর উদরে আর না রহিবে কথা॥
ভালমন্দ কথা জদি করএ শ্রবণ।
বহু নারী নিকটে সে কহিবে কথন॥

(ঐ, ৩৮ পত্র)।

কুন্তীদেবী যদি এই কথা পূর্ব্বে প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে হয়তঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই হইতনা, কারণ ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণের সহিত বিরোধ করিতেন না। কর্ণই ছিলেন দুর্য্যোধনের প্রধান সহায়, অতএব তাঁহার মধ্যস্থতায় হয়তঃ যুদ্ধনিবারিত হইত। কিন্তু কুন্তী ইহা গোপন করাতেই এই অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যুধিষ্ঠির শাপ দিলেন যে, ভবিষ্যতে স্ত্রীলোকেরা কোন কথা গোপন রাখিতে পারিবে না।

অবশেষে সেই স্থানে ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—

নারায়ণে দেখি সত্যবতীর নন্দন।
চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি করে দ্বৈপায়ন ॥

ইহার নমুনা—

নম নরসিংহ-মূর্ত্তি নম নরহরি।
নম জলধর অঙ্গ নম চক্রধারী ॥
পদ ধৌত-জলে গঙ্গা পতিত-পাবনী।
পরমাত্মা রূপে সব দেহেতে আপুনি ॥
ফণীতে শয়ন করি থাক সিন্ধুনীরে।
ফিরিয়া বেড়াহ প্রভু ভক্তের অন্তরে ॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৩৯ পত্র)

রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব

ব্যাস-ভারতে দণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণিত হয় নাই। প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা জৈমিনি-ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইহা অবলম্বনে এক নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বহুপূর্ব্বে রাজারাম দত্ত নামক এক অজ্ঞাত-পরিচয় কবি এই আখ্যায়িকা লইয়া এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা বহু বৎসর উগ্র তপস্যা করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেবরাজের সভায় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। সেই সময়ে উর্ব্বশী নৃত্য করিতে আসিয়া দুর্ব্বাসার মূর্ত্তি দেখিয়া আন্তরিক ঘৃণা বোধ করেন। যোগবলে ইহা জানিতে পারিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে ঘোটকী হইবার অভিশাপ প্রদান করেন।

যৌবনের ভরে তোর গর্ব্ব অতিশয়।
ইহার উচিত ফল পাইবে নিশ্চয় ॥
সমস্ত দিন থাকিবে তুমি হইলে রজনী ॥

উর্ব্বশীর অনুনয়ে অবশেষে মুনি বলিলেন—

মুনি বলে তুরঙ্গিনী অব্যর্থ হইবে।
অষ্টবজ্র দেখি পুন স্বর্গেতে আসিবে॥

উর্ব্বশী এই আশ্বাস পাইয়া মহাবনে তুরঙ্গিনী হইয়া প্রবেশ করিলেন। মৃগয়ায় আসিয়া রাজা দণ্ডী সেই তুরঙ্গিনী লাভ করেন। রজনীতে ইহা সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে রাজা প্রশ্ন করিয়া উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত অবগত হন। তখন রাজধানীতে আনিয়া তিনি যত্নের সহিত ইহাকে নির্জ্জনে রক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে উর্ব্বশীর মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন—

আর এক নিবেদন শুন নারায়ণ।
বড়ই আশ্চর্য্য হৈল লয় মোর মন॥
অবন্তী দেশের রাজা দণ্ডী নাম ধরে।
এক তুরঙ্গিনী পাইল বনের ভিতরে॥
পৃথিবীর মধ্যে অশ্ব যতেক আছয়।
দ্বিতীয় তাহার তুল্য নাহিক নিশ্চয়॥
কোন্ শক্তি ধরে দণ্ডী মনুষ্য হইয়া।
হেন অশ্ব রাখিয়াছে তোমারে না দিয়া॥
তার যোগ্য নহে কৃষ্ণ সেই তুরঙ্গিনী।
আনিতে উচিত অশ্ব শুন চক্রপাণি॥

(কঃ বিঃ ১৫৭৩ সং পুথি, ৬ পৃঃ)

অতএব শ্রীকৃষ্ণ সেই অশ্বিনী দাবী করিয়া দণ্ডীর নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি অশ্বিনী প্রদানে স্বীকৃত হইলেন না। নিজের পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দণ্ডী অশ্বারোহণে নিজের রক্ষাহেতু সমুদ্রের নিকটে যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সমুদ্র আশ্রয় প্রদানে অস্বীকৃত

হইলে তিনি বিভীষণ, সুমেরু, বাসুকি, দুর্য্যোধন প্রভৃতির নিকট গমন করেন। কিন্তু কেহই আশ্রয় দানে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে হতাশ হৃদয়ে যখন তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সুভদ্রাদেবী আশ্রয়-প্রদানে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন।

সুভদ্রার অনুরোধে ভীম দণ্ডীকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সংবাদ অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির, কুন্তী প্রভৃতি সকলেই ভীমকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভীম কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রেরণ করিলেন, তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। অবশেষে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে দেবগণ মর্ত্ত্যে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে দুর্য্যোধনও পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলেন। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে যখন দেবগণ পরাজিত হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলে একযোগে তাঁহাদের মহাস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই অবসরে উর্ব্বশী—

অষ্টবজ্র এক স্থানে দেখিল তখন ॥
বিষ্ণু-চক্র ইন্দ্র-বজ্র শিবের ত্রিশূল।
কুবেরের পাশ আর ব্রহ্মার কমণ্ডুল ॥
কার্ত্তিকের শক্তি আর শমনের দণ্ড।
ভবানীর হাতের খড়্গ বড়ই প্রচণ্ড ॥
অষ্টবজ্র এক স্থানে হইলেক আসি।
শাপমুক্তা হৈয়া তবে বলেন উর্ব্বসী ॥

রাজারাম দত্ত এইভাবে এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৭৩ এবং ১৮৪৪ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যায়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (D. C. III., ৭৭৯—৮০

পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে দেখা যায় যে, আদর্শ হিসাবে কবি জৈমিনি-ভারতের পরিবর্ত্তে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

একাদশ স্কন্ধের কথা পুরাণ ভাগবতে।
মূলেতে পয়ার কৈল জীব বুঝাইতে॥
সুকদেব-মুখে রাজা পরীক্ষিত শুনি।
সুকদেব-স্থানে জিজ্ঞাসিল মহামুনি॥

অথচ ভাগবতে এই আখ্যায়িকা নাই। জৈমিনি-ভারত যে ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়।

মহীন্দ্র ও উমাকান্তের দণ্ডীপর্ব্ব

দণ্ডীর আখ্যায়িকা লইয়া অপর দুইজন কবিও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজনের নাম মহীন্দ্র, এবং অপরের নাম উমাকান্ত, কিন্তু উভয়েরই পরিচয় অজ্ঞাত। রাজারামের দণ্ডীপর্ব্বের সহিত এই দুই কবির গ্রন্থের রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মহীন্দ্র লিখিয়াছেন—

একাদশ স্কন্ধ এই ভাগবত তত্ত্ব।
শ্লোক প্রবন্ধে মুনি ব্যাসের কবিত্ব॥
সেই শ্লোক ভাঙ্গি আমি রচিনু পয়ার।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহি লোক বুঝাবার॥
সুক মুনি কহে কথা পরীক্ষিত-স্থানে।
শুনেন মহীন্দ্র কবি এই সমাধানে॥

(সা-প-পুথি, সং ৮২২, পৃঃ ৩৭)

রাজরামের ন্যায় মহীন্দ্রও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দণ্ডীর আখ্যায়িকা আরোপ করিয়াছেন।

দুর্ব্বাসা কঠোর তপস্যা করিতেছেন। সেই সময়ে

বাছিয়া দুর্ব্বার পত্র করএ আহার।
সেই হেতু দুর্ব্বাসা নাম হইল তাহার॥
মহাকষ্টে ইন্দ্রিয়গণ ভাবিত হইয়া।
মুনিকে কহেন তবে বিনয় করিয়া॥
শুন মুনি তব অতি নিষ্ঠুর হৃদয়।
আমা সকলের কষ্ট আর নাহি সয়॥

(ঐ, ১—২ পৃঃ)

ইহার পরে সিদ্ধিলাভ করিয়া ইন্দ্রের সভায় যাইয়া তিনি উর্ব্বশীকে অভিশাপ প্রদান করেন।

নারদ যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিতেছেন

অবন্তী দেশের রাজা দণ্ডীনাম ধরে।
পাইল অশ্বিনী এক বিপিন মাঝারে॥
পৃথিবী ভিতরে অশ্ব যতেক আছয়।
দ্বিতীয় তাহার সম নাহিক নিশ্চয়॥
কোন্ শক্তি ধরে দণ্ডী ধরে কোন্ বল।
তুরঙ্গী রাখিল সেই করি গুপ্তস্থল॥
তার যোগ্য নহে কৃষ্ণ সেই তুরঙ্গিণী।
আনিতে উচিত প্রভু সেইত অশ্বিনী॥

(ঐ, ৫ পৃঃ)

রাজারাম দত্তের রচনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। এবং পরেও—

অষ্টবজ্র একত্র হইল ততক্ষণ॥
বিষ্ণুচক্র ইন্দ্র-বজ্র শিবের ত্রিশূল।
কুবেরের গদা আর ব্রহ্মার কমণ্ডুল॥

কার্ত্তিকের শক্তি জমরাজার জমদণ্ড।
ভবানীর হাতে খড়্গা বড়ই প্রচণ্ড॥
অষ্টবজ্র একত্র হইল জবে আসি।
শাপমুক্ত ইয়্যা স্বর্গে চলিল উর্ব্বসী॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একের গ্রন্থের আদর্শে অপরে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উমাকান্তের গ্রন্থও এই পর্য্যাভুক্ত। তিনি প্রথমেই মৃগয়া করিতে যাইয়া মুনির গলে সর্প প্রদান হেতু পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের এক বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ইহা রাজারাম দত্ত বা মহীন্দ্রের গ্রন্থে নাই। তৎপর তিনি শুকদেবের মুখে পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনাইবার কালে দণ্ডীর আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। পরীক্ষিত প্রশ্ন করিলেন—

কৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডবের গতি নাই আন॥
পাণ্ডব কৃষ্ণের হয় অতি প্রিয়তর।
তবে কেন উভয়েতে হইল সমর॥

(সা-প-পুথি সং ৮২৪, ৩ পত্র)

ইহারই উত্তরে দণ্ডীর আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। দুর্ব্বাসার তপস্যা সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছে—

কেবল দুর্ব্বার পত্র করিয়া আহার।
এই হেতু দুর্ব্বাসা নাম হইল তাহার॥
কষ্টেতে ইন্দ্রিয়গণ তাপিত হইয়া।
মুনির নিকটে কহে বিনয় করিয়া।

(ঐ, পৃঃ ৩)

ইহা মহীন্দ্রের রচনার প্রতিধ্বনি মাত্র। পুথিখানি খণ্ডিত, মাত্র ১—৪ পত্র পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতেই কবির পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজীব সেনের উদ্যোগপর্ব্ব

কবির পরিচয় পাওয়া যায় না, সময়ও অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৭৯৩ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের এক অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে, ইহার লিপিকাল ১২৫০ সাল। অতএব পুথিখানি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, ইহাই মাত্র জানা যাইতেছে। কাশীদাসের মহাভারতের সহিত এই গ্রন্থের রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, অতএব বুঝা যায় যে, কবি স্বাধীনভাবেই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। হস্তিনানগর হইতে দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিলে—

শুনি যুধিষ্ঠির রাজা উদ্যোগ করিল।
চারিদিকে চারি ভাই পাঠাইয়া দিল॥
পূর্ব্বে সহদেব গেল, নকুল পশ্চিমে।
দক্ষিণে অর্জ্জুন গেল, উত্তরেত ভীমে॥

কাশীদাসী ভারতে যুধিষ্ঠির পত্র লিখিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভ্রাতৃগণকে পাঠান নাই। বিদুরের ভক্তিতে প্রীত হইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—

কৃষ্ণ বোলে বিদুর সে কর অবধান।
ভক্তি ভাবে ধন দিলে পর্ব্বত সমান॥
কপটে সংসার দিলে মনেহ না লয়।
সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মবুদ্ধি তোমি মহাশয়॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা মধুরস বাণি।
সেন রাজীবে কহে কৃষ্ণের কাহিনী॥

কৃষ্ণকর্ণ-সংবাদে কর্ণ বলিতেছেন—

অকুমারী কালে মাত্র উদরে ধরিল।
লোক-অপযশ হেতু জলে ভাসাইল॥
সূর্য্যে প্রাণ রক্ষা কৈল কৃপা করি মনে॥
রাধাএ পালিল মোরে অসীম যতনে॥
সেহি সে আমার মাতা বিদিত সংসার।
সর্ব্বজন জানে আমি রাধার কুমার॥
আজি যদি নারায়ণ করি হেন রীত।
সকলে ঘোসিবে মোর অপযশ গীত॥

কাশীদাসের রচনা-সাদৃশ্য ইহাতে লক্ষিত হয় না।

কুমুদ দত্তের সর্গারোহণ পর্ব্ব

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৯ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের এক অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। এই কবিও কাশীদাসকে অনুসরণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। সহদেবের পতনের পরে—

পড়িলেক সহদেব দেখে যুধিষ্ঠির।
চলিল উত্তর পথে ধর্ম্ম করি স্থির॥
কতদূরে গিয়া ভীমে জিজ্ঞাসে রাজারে।
কুন অপরাধে মৈল সহদেব বীরে॥
রাজা বলে সহদেব আছিল মহাবীর।
অভিমান মনে ছিল সুন্দর শরীর॥

(ঐ, ৩৩ পৃঃ)

কাশীদাস লিখিয়াছেন যে, সহদেব ভূত-ভাবী বর্ত্তমান জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের হার হইবে জানিয়াও তিনি তাঁহাকে নিবারণ করেন

নাই। এইজন্য তাঁহার পতন হইয়াছিল। ব্যাস-ভারতে আছে যে, সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিতেন বলিয়া পতিত হইয়াছিলেন। কুমুদ দত্তের গ্রন্থে ইহারই প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে।

জয়ন্তিদেবের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬২৪ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের এক অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। নকলের তারিখ ১২০৫ সন বা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। কবির ভণিতা এইরূপ—

গোবিন্দের পদতলে জয়ন্তিদেব বোলে
অর্জ্জুনের গুণের কাহিনী।
স্বর্গবাস পুণ্যকথা খণ্ডে দুঃখ শোক ব্যথা
শুনহ সুবাক্য ব্যাস-বাণি॥

(ঐ, ১৭ পৃঃ)

যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-গণকে গোপী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

অপার মহিমা কৃষ্ণের কে বুঝিবে লীলা।
রাখাল সহিতে গোপীগণ হইল শিলা॥

(ঐ, ৩ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও পত্নীসহ স্বর্গারোহণে যাত্রা করিয়াছেন। পথে দ্রৌপদী দেহত্যাগ করিলেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন—

মায়ের বচনে হৈলাম স্বামী পঞ্চজন।
সভেক সমানভাব না ভাবিত মন॥

পিতৃভাবে আমাকে করিত পালন।
স্বামীভাবে অর্জ্জুনেক করিল সেবন ॥
বড় দুর্জ্জন তুমি সেহি ভাব মনে।
তোমাক ভজিত ভয় সঙ্কোচ কারণে ॥
নকুলেক করিত তার ভ্রাতার সমান।
সহদেবকে সামান্যভাব নহে বস্তু জ্ঞান ॥

কাশীদাস লিখিয়াছেন—

দ্রৌপদীর পাপ শুন, কহি যে তোমারে।
সবা হৈতে অনুরাগ ছিল পার্থবীরে ॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।

ব্যাস-ভারতেও এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তৎপর সহদেব পতিত হইলেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে ভীম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

পঞ্চ আত্মার এক আত্মা সহদেব ভাই।
এক আত্মা হারাইয়া চারি আত্মা যাই ॥

সহদেবের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির বলিলেন—

বেদশাস্ত্রে সহদেব পরম পণ্ডিত ॥
ভালমন্দ জত কথা জানিয়া শুনিয়া।
না কহিল গুপ্ত করি রাখিল ঢাকিয়া ॥
দুর্য্যোধন যত দুঃখ দিল মো সভারে।
জানিয়া সে সব কথা না কহিল মোরে ॥

ইত্যাদি

কাশীদাসের মহাভারতেও প্রায় এইরূপ যুক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

যুধিষ্ঠির বলেন যে শুন সাবধান।
সহদেব জ্ঞাত ভূত ভাবী বর্ত্তমান ॥

পাশাতে আমারে আহ্বানিল দুর্য্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন॥
হারিব জিনিব কিবা, ভাই তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে॥
ইত্যাদি

কিন্তু ব্যাস—ভারতে আছে যে, "সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ মনে করিতেন বলিয়া অহঙ্কারে তাঁহার পতন হইয়াছিল।" নকুলের পতন সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, নকুল কপট যুদ্ধ করিতেন ও ভয়ে রণে ভঙ্গ দিতেন। কিন্তু কাশীদাসের মহাভারতে আছে—

কর্ণের সমর হৈল আমার সহিতে।
সেই কালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মোর বল টুটে।
সহায় না হইল সে বিষম সঙ্কটে॥

ব্যাসদেব লিখিয়াছেন যে, নকুল নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্ বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্যই তাহার পতন হইয়াছিল।

অর্জ্জুনের পতন সম্বন্ধে কবি তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) কৃষ্ণের বর্ণ-সাদৃশ্য, (২) অহঙ্কার, (৩) একদিনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ না করা, যথা—

অর্জ্জুন দ্বিতীয় কৃষ্ণ কৃষ্ণের সোসর॥
শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ আপনি শ্রীহরি।
এক অপরাধ তার কৃষ্ণরূপ ধরি॥
আর এক পাপ ছিল অহঙ্কার অতি।
ত্রিজগৎ নাথ কৃষ্ণ রথের সারথি।

* * * *

কটাক্ষে জিনিতে পারে সকল সংসার ॥
হেন বীর ধনঞ্জয় কুরুক্ষেত্র রণে।
অষ্টাদশ দিবা দ্বন্দ্ব কৈলা কি কারণে ॥
কপটে করিল যুদ্ধ প্রতিষ্ঠা কারণে।
একত্রে না মারিল যুঝে জনে জনে ॥

কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

আমা হৈতে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
সবে হেয় জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থ বীর পড়িল পর্ব্বতে ॥

ব্যাস-ভারতে আছে যে, অর্জ্জুন একদিনে কৌরব সৈন্য নাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বীরদর্পে তিনি অন্যান্য যোদ্ধাকে অবজ্ঞা করিতেন। এইজন্য তাঁহার পতন হইয়াছিল। উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কাশীদাসের রচনার সাদৃশ্য জয়ন্তি কবির গ্রন্থে লক্ষিত হয় না।

গীতার অনুবাদ

গীতার অনুবাদের দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে (সা-প-পুথি, সং ১৯৬০, এবং ৯৫৮ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে একখানির রচয়িতা বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী, কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থে কবির নাম পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয় গ্রন্থশেষে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ইতি মুখটী গৌড়দেশবাসী বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা-ভাষায়াং সারঙ্গরঙ্গদানাম্‌ন্যাং পরমার্থনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।" অতএব কবিকে বঙ্গদেশবাসী মুখোপাধ্যায় বংশোদ্ভব বলিয়া জানা যাইতেছে। গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কুরুপাণ্ডবগণ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কোন কর্ম্মকরে।
বিশেষ করিয়া সব কহিবে আমারে ॥

এইবাক্য শুনিয়া সঞ্জয় মতিমান।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে করিয়া বাখান॥
পাণ্ডবের সৈন্য দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
আচার্য্য নিকটে গিয়া কহিল বচন॥
পাণ্ডবের সৈন্য এই বড়ই বিস্তার।
মন দিয়া আপনি দেখুন একবার॥

গ্রন্থ-সমাপ্তিতে সঞ্জয় বলিতেছেন—

যার পক্ষে বিরাজিত কৃষ্ণ যোগেশ্বর।
যাহাতে গাণ্ডীব ধনু পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সেই পাণ্ডবের পক্ষে অবশ্য বিজয়।
রাজ্যলক্ষ্মী পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি সুনিশ্চয়॥
এখন পাণ্ডবে তুমি প্রসন্ন করিয়া।
রাজ্য-ধন তাহাকে সকল সমর্পিয়া॥
পুত্রপ্রাণ রক্ষা কর শুন মহারাজ।
অন্যথা নাহিক জয় ঘটিবে অকাজ॥
গুরু গোপীনাথ পদে কোটী নমস্কার।
রচিল গীতার ভাষা কৃপাতে যাঁহার॥

(১৯৬০ সংখ্যক পুথি)

নিজবশ করিবে ইন্দ্রিয় বুদ্ধিমন।
স্বর্গভোগ ছাড়ি হবে মোক্ষ-পরায়ন॥
ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন যে হয় নিতান্ত।
সে জনা সর্ব্বথা মুক্ত জানিবে সিদ্ধান্ত॥

অথচ ৯৫৮ সংখ্যক পুথিতে ভণিতা নাই। এই দুই গ্রন্থ দুই কবি রচনা করিলেও একের প্রভাব অন্যের উপর পতিত হইয়াছে, অথবা উভয় পুথিতেই একই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে।

ভারত-সাবিত্রী

মহাভারতের অনুক্রমণিকার অনুকরণে এই গ্রন্থে মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ সংক্ষিপ্ত সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ভারত অর্থাৎ মহাভারতের সাবিত্রী বা জননী বলা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সূত্রাকারে বিবৃত ঘটনা সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেই মহাভারত রচিত হইতে পারে। এই নামীয় সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে (ব-সা-প-পুথি, সং ৯৭৩ এবং ৮১৩)। সংস্কৃত গ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ—

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—

ব্রূহি সঞ্জয় যদ্বৃত্তং যুদ্ধে তেষাং মহাত্মনাম্।
পাণ্ডবানাং কুরূনাঞ্চ সম্প্রবৃত্তে মহাহবে॥
কে তত্র প্রমুখযোধাঃ কে চ তত্র মহারথাঃ।
মহাবলাশ্চ কে তত্র কথন্তে বিনিপাতিতাঃ॥
ভীষ্মদ্রোণৌ কথং ভগ্নৌ কর্ণশল্যৌ কথং হতৌ।
পুত্রশ্চ মম মন্দাত্মা কথং দুর্য্যোধনো হতঃ॥

(ঐ, ৯৭৩ সং পুথি)

ইহারই বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—

ধৃতরাষ্ট্রে বোলে সুন সঞ্জয় সুজন।
কথাতে চতুর বড় গুণের ভাজন॥
পাণ্ডবে কৌরবে জদি রণ আরম্ভিল।
সমবায় করি রণে প্রবর্ত্ত হইল॥
কেমতে হইল যুদ্ধ কহোরে সঞ্জয়।
কাহার হইল জয় কার পরাজয়॥
মহাসত্য ভীষ্ম বীর দ্রোণ জে ব্রাহ্মণ।
তানা সবে ভঙ্গ পাইল কিসের কারণ।

মহাযুদ্ধা কর্ণবীর শৈল্য ধনুর্দ্ধর।
কেমতে পড়িল সে জে রণের ভিতর॥

(ঐ, ৮১৩ সং পুথি)

সমাপ্তি-বাক্য—

ভারত সাবিত্রী এহি ভারতের সার।
পদে পদে শুনিলে বৈকুণ্ঠে গতি তার॥
বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরি।
সোনহ ভকত জন কর্ণঘট ভরি॥

এখানেও মহাভারতকে "বিজয় পাণ্ডবকথা" বলা হইয়াছে। কাশীদাসের মহাভারতেও স্থানে স্থানে এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়। উক্ত উভয় পুথিতেই রচয়িতার নামের উল্লেখ নাই।

রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলোপাখ্যান

মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৬৯ম-৭৪ম অধ্যায়ে শকুন্তলার উপাখ্যান বর্ণিত রহিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে ঐ আশ্রমেই শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। কিছু দিন পরে শকুন্তলা পুত্রসহ রাজ-সমীপে গমন করেন, কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে প্রথমতঃ দুষ্মন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। অবশেষে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি পত্নীপুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা মূলতঃ অবলম্বন করিয়া কালিদাস "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নামক নাটক রচনা করেন। ইহাতে তিনি অনেক নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া নাম্নী শকুন্তলার দুই সখীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে প্রণয়-চিহ্ন স্বরূপ শকুন্তলাকে এক অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামী-ধ্যানপরায়ণা শকুন্তলা দুর্ব্বাসাকে যথোচিত অভিবাদন

না করাতে ঐ মুনির শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অভিজ্ঞান দর্শনে দুষ্মন্তের পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইবে বলিয়া দুর্ব্বাসার নির্দ্দেশ ছিল। গর্ভাবস্থায় শকুন্তলা দুষ্মন্তের সমীপে গমন করিবার কালে অঙ্গুরীয়টি জলে নিপতিত হয়, অতএব তিনি স্বামীকে অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহা দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তিনি মাতা মেনকার সাহায্যে মারীচের আশ্রমে গমন করেন। সেখানে ভরতের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে মৎস্যের উদরে এক ধীবর অঙ্গুরীয়টি প্রাপ্ত হইলে ইহা দুষ্মন্তের নিকট আনীত হয়। ইহা দর্শনে তাঁহার মনে শকুন্তলার স্মৃতি জাগরিত হয়। ইহার পরে দেবগণের কার্য্য সমাপনান্তে মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মারীচের আশ্রমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পুনর্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা-উপাখ্যানের কতকাংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৬৪০-৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে দেখা যায় যে. কালিদাস-বর্ণিত আখ্যায়িকাই কবি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এই পালাটি রচনা করিয়াছিলেন, কারণ ইহাতে শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার, এবং দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতি-ভ্রংশ প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

হেন কালে শকুন্তলা প্রমোদিত চিত্ত।
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীর সহিত॥
কলসী-ভরিয়া জলে বসিছে তরুমূলে।
নন্দন-বনের সম বৃক্ষ ফলে ফুলে॥

(ঐ, ৬৪৩ পৃঃ)

শকুন্তলা রাজার সভায় উপস্থিত হইলে—

রাজাএ জানিল এহি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমান।
ব্রাহ্মণের শাপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান॥

(ঐ, ৬৫১ পৃঃ)

অন্যত্র—

ব্রাহ্মণের শাপ হেতু না ফিরিল মন।
নগরে যাইতে কন্যা করল ক্রন্দন ॥

(ঐ, ৬৫৩ পৃঃ)

তৎপর অঙ্গুরীয় দৃষ্টে—

হাসিতে হাসিতে রাজা অঙ্গুরী লইল হাতে
শকুন্তলার বৃত্তান্ত যত স্মরিল মনেতে।

(ঐ, ৬৫৫ পৃঃ)।

এইরূপ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কবি সর্ব্বত্রই কালিদাসকে অনুসরণ করেন নাই, কিন্তু নিজ কল্পনাবলেও মধ্যে মধ্যে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলনের পরে কোন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

সম্বন্ধে নাতিনী তুহ্মি জিজ্ঞাসি তোহ্মা ঠাঁই।
বনেতে পাইয়া কিবা বরিছ জামাই ॥

(ঐ, ৬৪৯ পৃঃ)

ইহার উত্তরে শকুন্তলা বলিলেন—

পূর্ব্ব কথা স্মরিয়া যে উড়ে দুঃখখানি।
আহ্মি বিহা কৈলে তুহ্মি হইবা সতিনী ॥

(ঐ, ৬৫১ পৃঃ)

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় কাশীরাম কালিদাসের নাটক আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই। তিনি মূল মহাভারত অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"সাধারণতঃ, সঞ্জয়-রচিত মহাভারতের পুথির মধ্যে রাজেন্দ্রদাসের এই আখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে।" (ঐ, ৬৪০ পৃঃ)। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাজেন্দ্রদাসের নামে যে

রচনা চলিয়া যাইতেছে, তাহাই সঞ্জয়ের ভণিতা সহ সঞ্জয়ের মহাভারতে পাওয়া যায়। দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শকুন্তলার আক্ষেপোক্তি রাজেন্দ্রদাসের গ্রন্থে এই ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

উপজিল বড় দুঃখ শুকাইল অধর মুখ
ধাএ জেন কাতর হরিণী।
কান্দে সুললিত রবে শুনিতে পাষাণ দ্রবে
সকরুণে বিদরে ধরণী॥ ইত্যাদি

(বসাপ, ৬৫৪ পৃঃ)

আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৫৫ সংখ্যক পুথিতে অনুরূপ রচনাই সঞ্জয়ের ভণিতা সহ উদ্ধৃত রহিয়াছে, যথা—

উপজিল বর দুক যুখাএ অধর-মুক
ধাএ জেন কাতর হরিণি।
কান্দি সুললিত রবে যুণিআ পাষান দ্রবে
সকরুনে বিদরে মেদিনি॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৯০ পত্র)

এই ত্রিপদীর শেষ অংশে রাজেন্দ্রদাসের—

অপমান লজ্জা ভয় কেহ্নে প্রাণে এত সএ
শরীর কেহ্নে না হএ নিপাত॥

স্থলে সঞ্জয়ের মহাভারতে আছে—

অপমান লজ্জা ভএ কার প্রাণে এথ সহে
কেনে বা সরির নহে পাত॥
হেন মতে কান্দে রাণি হইল আকুল প্রাণি
শোকে দুক্ষে সরির বিদরে।
ভারথের পুন্ন শ্লোক নিস্তারিতে সর্ব্বলোক
পদবন্দে কহিল সঞ্জএ॥ (পুথি, ৯১ পত্র)

এই ভাবে ভণিতাহীন অবস্থায় সঞ্জয়-ভারতের রচনা সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত রাজেন্দ্র দাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। দীনেশ বাবু সত্যই বলিয়াছেন যে, মন্ত্রবলে এই সকল কবির প্রেতাত্মাদিগকে উপস্থিত করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিলে এই জটিলতার সমাধান হইতে পারে।

গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

কবির পরিচয় তদ্রচিত উত্তরকাণ্ড-সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারত রচনায় তিনি ব্যাস-ভারতই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—

মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত।
এবং বৈশম্পায়ন মুনি কহে জন্মেজয় শুনে।

(কঃ বিঃ ২১৪৮ সং পুথি, ৪ পৃঃ)

কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তথাপি তিনি যে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, যথা—

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব্ব॥

সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের মহাভারতের পুথিতে গঙ্গাদাসের রচনা প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পুথিতে এক একটি উপাখ্যান গঙ্গাদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ অদ্ভুত রকমে এই সকল আখ্যায়িকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কবীন্দ্রের মহাভারতের ২১৪৮ সংখ্যক পুথি অবলম্বনে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাতে আছে—

এক লক্ষ শ্লোক জে মনুষ্যলোকে প্রতিষ্ঠিত।
বৈশম্পায়ন মুনি কহে নৃপতি বিদিত॥

তাহাকে শুনিয়া জন্মেজয় নৃপবর।
শরীরের রোগ সব খণ্ডিল সকল॥
তিনখান চাপ মাত্র রহিল শরীরে। ইত্যাদি

ইহার পরে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির শাপে জন্মেজয়ের কুষ্ঠব্যাধি হইবার বিবরণ রহিয়াছে। বৈশম্পায়নের মুখে জন্মেজয় মহাভারত শুনিয়াছিলেন, ইহা ব্যাস-ভারতের আখ্যায়িকা, আর ঋষ্যশৃঙ্গের শাপে জন্মেজয়ের কুষ্ঠব্যাধি হইবার বিবরণ জৈমিনি-ভারতের বিষয়ীভূত। অথচ এই উভয় আখ্যায়িকাই অদ্ভুতরকমে এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কবীন্দ্র যে জৈমিনি-ভারত অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ব্যাসভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কবীন্দ্রের রচনার সহিত গঙ্গাদাসের রচনা মিশ্রিত করিয়া এই খিচুড়ি প্রস্তুত হইয়াছে।

যাহাই হউক, এই সকল পুথিতে গঙ্গাদাসের রচনা সংরক্ষিত রহিয়াছে। কবি যে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহার একটা নির্ঘণ্ট উক্ত ২১৪৮ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায়, যথা—

ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয়ের কথন নিশ্চয়।
মোহিত অর্জ্জনে কৃষ্ণ গীতা জে বুঝায়॥
কর্ণপর্ব্বে কর্ণ কৈল শৈল্যেরে সারথি॥
ঘোড়া কাটি রথ গ্রাসি কর্ণ বিনাশন।
ভীম রক্তপান করি মারে দুঃশাসন॥
শৈল পর্ব্বে শৈল্য তবে করে মহারণ।
যুধিষ্ঠির সংহারিল শৈল যে রাজন্॥
ইত্যাদি

এইভাবে সমগ্র মহাভারতের একটি নির্ঘণ্ট প্রদান করা হইয়াছে। আদি পর্ব্বে কবি ব্যাস-ভারত অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে দুর্ব্বাসার শাপের উল্লেখ নাই। দৈববাণী শুনিয়া

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির রচিত যযাতি ও দেবযানীর উপাখ্যান বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের ৬৯১-৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। মহাভারত ব্যতীত কবির রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ অন্যত্র মুদ্রিত হইল। ষট্‌কবি-মনসার পুথিতেও গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি মনসামঙ্গল রচনাতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, গঙ্গাদাস ও তাঁহার পিতা ষষ্ঠিবর উভয়ে মিলিয়া মনসামঙ্গল রচনা করেন। বস্তুতঃ একই গ্রন্থে উভয় কবির ভণিতা পাওয়া যায়। এইভাবে মনসামঙ্গল রচনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে কবির মহাভারতেও মনসামঙ্গলের প্রভাব পতিত হইয়াছে। পরীক্ষিতকে বাঁচাইবার জন্য যে ব্রাহ্মণ আসিতেছিলেন তাঁহার নাম মহাভারতে কাশ্যপ। গঙ্গাদাস সেনের ভণিতাযুক্ত মহাভারতের এই অংশে তিনি ধন্বন্তরি নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার বাড়ী ছিল শঙ্খপুরি[১]। আমার মনে হয় মহাভারতের কাশ্যপের আদর্শে মনসামঙ্গলে ধন্বন্তরির, এবং সাবিত্রীর আদর্শে বেহুলার, আর বিপদে অবিচলিতচিত্ত নল-শ্রীবৎস প্রভৃতির আদর্শে চাঁদসদাগরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠীবরের যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

ষষ্ঠীবর সমগ্রমহাভারত রচয়িতা গঙ্গাদাস সেনের পিতা। ইঁহাদের বংশ-পরিচয় গঙ্গাদাসের মহাভারত সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীহট্টের দত্ত বংশীয় এক ষষ্ঠীবর রচিত পদ্মা-পুরাণের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ

১। ধনন্তরি ওঝা বাপু আনহ ডাকিয়া।
এইক্ষণে নৃপতিরে দিবে জিআইআ॥
এত শুণি জন্মেজএ পাঠাইলা চর।
শঙ্খপুরে চলি গেল ওঝার নগর॥
(কঃ বিঃ ৬১৫৫ সং পুথি, ১০ পত্র)

মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মেদিনীধর দত্ত মহাশয়ের বংশে ষষ্ঠীবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ঐ, ১১ পৃঃ)। রজনী চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত মনসামঙ্গল গ্রন্থেও ষষ্ঠীবরের এইরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা।
(ঐ, ২৪২ পৃঃ)

অতএব শ্রীহট্টের দত্ত বংশীয় ষষ্ঠীবর যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ রচয়িতা ষষ্ঠীবর হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ইনি সেন বংশে সুবর্ণবণিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীবর যে ব্যাসভারত অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, যথা—

ব্যাসদেব কহিলেন ভারতের কথা।
বদরিকাশ্রমে গেলা নারায়ণ জথা॥
(বা-প্রা-পু-বিবরণ, ১ম সং, ২৫৫ পৃঃ)

কবিচন্দ্রের মহাভারত

কবি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের আদেশে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কবির উক্তিতে রহিয়াছে—

শ্রীযুত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যাঁর কীর্ত্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ॥
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে।
বীর বৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে॥
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ॥

গোপাল সিংহের রাজত্ব ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল ধরিয়া লইলে (ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়রে বলা হইয়াছে যে, সরকারী কাগজপত্রে ১৭৩০ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোপাল সিংহের রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়) কবি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। উদ্ধৃত উল্লেখ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, গোপাল সিংহের নিকট হইতেই তিনি ভূমিদান পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারত কবির শেষ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে, কারণ কবিচন্দ্রের মহাভারতের শেষ পর্ব্বগুলিতে তাঁহার পুত্র কথকচন্দ্রের ভণিতা দৃষ্ট হয়। অতএব তিনি বোধ হয় মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কবির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তদ্রচিত গোবিন্দমঙ্গল প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হইতে কিয়ংদশ উদ্ধৃত হইল—

দ্রৌপদী এতেক শুনি ভাবে মনে মন।
না জানি কি করে আজি দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
ভীষ্মদেব আদি করি আছেন সেখানে।
এমন সভাতে আমি যাইব কেমনে॥
বড়ই কাতর হৈল দ্রুপদ-নন্দিনী।
ব্যাধের সমুখে যেন পড়িল হরিণী॥
দ্রৌপদীর অঙ্গ যেন খাইল তক্ষকে।
দাদুরি পড়িল যেন ভুজঙ্গের মুখে॥ ইত্যাদি

(কঃ বিঃ ৬৪৭ সং পুথি, ৬ পত্র)

দাতাকর্ণের পালা

এই পালাটি কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গলে মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার অনেকগুলি পুথি সংগৃহীত রহিয়াছে। তন্মধ্যে

৩২৯ সংখ্যক পুথির পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম যে, মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত এই পুথির রচনা মধ্যে মধ্যে মিলিয়া যাইতেছে। পুথিতে আছে—

বৈসম্পায়ন মুনি আদি পর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারত রাজা শুন মহাশয়॥
একদিন বাসুদেব ভাবিয়া অন্তরে।
কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে॥
জে জাহা মাগএ কর্ণ তাই দেন দান।
সভে বলে দাতা নাঞি কর্ণের সমান॥
একবার জাব আমি কর্ণের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে॥
এই কথা মনে মনে ভাবেন নারাঅন।
মাআ কর‍্যা হৈলা এক অবোধ ব্রাহ্মণ॥

আর মুদ্রিত গ্রন্থে আছে—

নারদ মুনি কৃষ্ণ গুণ গাইতে গাইতে।
উপনীত হৈল গিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিছেন কথন।
কোথা গিয়াছিলে মুনি কহ বিবরণ॥
যোড়হাতে নারদ মুনি লাগিল কহিতে।
গিয়াছিলাম ওহে কৃষ্ণ কর্ণের সাক্ষাতে॥
কর্ণ বড়ই দাতা শুন নারায়ণে।
কর্ণের সমান দাতা নাহি ত্রিভুবনে॥
যেই মাগে তাহা দেই নাই করে আন।
ত্রিভুবনে দাতা নাই কর্ণের সমান॥
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু গদাধরে।
কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে॥

একবার যাব আমি কর্ণের নিকটে।
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে॥
এই কথা মনে মনে ভাবি নারায়ণ।
মায়া করি হৈল এক বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ॥

শেষ চারি পঙ্‌ক্তি এবং পূর্ববর্ত্তী রচনায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু পুথিতে এই পালাটিকে মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, আর মুদ্রিত গ্রন্থে ইহাকে গোবিন্দমঙ্গলে স্থাপন করা হইয়াছে। পুথির পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ মহাভারতেই কর্ণের আখ্যায়িকা রহিয়াছে, এবং কৃষ্ণও সেখানে একজন প্রধান কর্মকর্ত্তা। আর আখ্যায়িকা পড়িয়া মনে হয়, এই পালার বর্ণনীয় ঘটনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব ইহা মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকাই স্বাভাবিক, যদিও মহাভারতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্বকোষে মহাভারতের নির্দেশ দিয়া লিখিত হইয়াছে—"কোন সময়ে দুর্য্যোধন বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই সময়ে কর্ণ তাঁহাকে বলেন—'অগ্ন হইতে যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। যতদিন না আমি অর্জুনের প্রাণবধ করিতে পারিব, ততদিন এই ব্রত পালন করিব।' ইতিপূর্বে বৃষকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ কেমন দাতা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কহিলেন—'তোমার পুত্র বৃষকেতুর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি।' কর্ণ তাহাই করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে দিলেন। কৃষ্ণ কর্ণের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে বৃষকেতুর পুনরায় প্রাণদান করিলেন। এই অলৌকিক দানের জন্য কর্ণ 'দাতাকর্ণ' নামে বিখ্যাত হয়।" (বিশ্বকোষ, ৩।২০৩ পৃঃ)। কর্ণের উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র আসিয়া কর্ণের কবচ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কবিচন্দ্রের পালাতে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

ধন্য ধন্য কর্ণবীর বলেন গোঁসাই।
তোমার সমান দাতা ত্রিভুবনে নাই॥
বৃষকেতু নামে তোমার যে পুত্র আছয়।
তাহারে কাটিয়া মাংস দেহ মহাশয়॥
স্ত্রীপুরুষে দুইজনে কাটিবে করাতে।
তাহার মাংস রান্ধি দেহ আমার সাক্ষাতে॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্র না হবে কাতর।
এ যশ থাকিবে তোমার সংসার ভিতর॥
কাতরে কাটিলে পুত্র মাংস না খাইব।
নরকস্থ হবে কর্ণ আমি ফিরে যাব॥

অন্যত্র—

শুন ওহে কর্ণ তুমি বলেন শ্রীহরি।
অম্বল ব্যঞ্জন বিনে অন্ন খাইতে নারি॥
অম্বল রান্ধিয়া মোরে দেহ মহাশয়।
ভোজনে আমার তবে বড় প্রীতি হয়॥
কর্ণ বলে কিসে আমি রান্ধিব অম্বল।
একখানি মাংস নাই রেন্ধেছে সকল॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কহি তব কাছে।
পুত্রমুণ্ড পদ্মাবতী লুকায়ে রেখেছে॥
সেই মুণ্ড দিয়া পুনঃ রান্ধহ অম্বল।
বিবরিয়া ওহে কর্ণ কহিনু সকল॥

অবশেষে পরীক্ষার পরে কৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কর্ণকে দর্শন-দানে পরিতৃপ্ত করেন।

অর্জ্জুন-সংবাদ

কবির নাম—মুকুন্দ দাস

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, পৃঃ ২৬২-৪ হইতে সঙ্কলিত।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এইভাবে গ্রন্থটি রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। অর্জুনের প্রশ্নে কৃষ্ণ ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন—

ভক্তজনের সম নহে জগতের রাজ।
সুরপতি সম নহে, অন্যের কি কাজ॥
ইন্দ্রের পাত হএ ভোগ অনন্তর।
ভক্তজনের পাত নাহি চারি যুগের ভিতর॥

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমাকে স্মরিঞা প্রাণ ছাড়ে যেইজন।
তার কিবা ফল হএ কহিবে কারণ॥
কেমন গতি পাএ সেহি কেমন স্থানে যায়।
এ সকল কথা আমি পুছিএ তোমায়॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

মৃত্যুকালে আমা যেবা করএ স্মরণ।
আমার শরীরে লিপ্ত হএ সেইজন॥
সত্য করি কহি আমি বুলিল তোমাকে।
ভুবন-দুর্লভ পদ দিএ আমি তাকে॥

অর্জুনের প্রশ্ন—

তোমাকে যে আগে অন্ন করায় নিবেদন।
অবশেষে অন্ন পাছে করেত ভোজন॥

কিবা পাপ পুণ্য ফল কহিবে আমারে।
নিষ্কপটে কহেন প্রভু ই সব বিচারে॥

কৃষ্ণের উত্তর—

আমার উচ্ছিষ্ট খায় আমাতে যার মন।
আমি তাকে খ্যাইতে থাকি শুনহে অর্জুন॥

অবশেষে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন, এবং অর্জুন দেখিলেন—

উদরের ভিতরে আছে ভুবন অনন্ত।
কিবা দিবা কিবা নিশি যতেক বসন্ত॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে শরীরের মাঝে।
কত কত ব্রহ্মাণ্ড আছে কত সুররাজে॥
কত কত সূর্য্য অঙ্গে করিছে উদয়।
কত কত গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর আছয়॥
কতেক পর্বত আছে কত নদ নদী।
কেবা বলিবাকে পারে ইহার অবধি॥
এক এক সংসারে আছে কত কত দেশ।
নানা বর্ণে আছে লোক ধরি নানা বেশ॥
কাহার জন্ম হএ কাহার হএত প্রলয়ে।
জলের বিম্ব যেন জলেত মিশাএ॥ ইত্যাদি

রামরত্নগীতা

কবির নাম—ভবানী দাস

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৩২৩-৭ হইতে সঙ্কলিত।

প্রারম্ভেই রহিয়াছে—

ভারত-সমর সাঙ্গ করি পার্থ বীর।
বসিলেন পুত্রশোকে ব্যাকুল শরীর॥

শয়নেতে নিদ্রা নাহি অসুখ ভোজনে।
রাজ্যের বৈভব-সুখ নাহি লয় মনে ॥
হাহা পুত্র অভিমন্যু বোলে অনুক্ষণ।
সংহরিয়া লহ মোরে আপন-সদন ॥
অন্তর্যামী নারায়ণ বুঝি পার্থ মন।
অর্জুনে বুঝান বলি শাস্ত্রের বচন ॥
কৃষ্ণ বোলে ধনঞ্জয় এ উচিত নয়।
অজ্ঞান জীবের ন্যায় শোক সমুদয় ॥
অর্জুন বলেন প্রভু করি নিবেদন।
যোগমার্গ বোলি মোর শান্ত কর মন ॥

অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—"রাবণ এত জীব-হত্যা করিয়াও তোমাকে পাইল কিরূপে?" কৃষ্ণ বলিলেন—"আমাকে পায় নাই, বিষ্ণুকে পাইয়াছে। প্রেম-ভক্তি না হইলে আমাকে পাওয়া যায় না।" তৎপর অর্জুনের এক প্রশ্নের উত্তরে যবনোৎপত্তির বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। অনন্তর চতুর্বেদের উৎপত্তি, শঙ্খাসুরের বেদহরণ, মীনরূপে ভগবানের বেদের উদ্ধার, শক্তিকে কৃষ্ণের বরদান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে বরদান, কৈলাস বর্ণন, শিবদুর্গার বিবাহ, শক্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে প্রসব, এবং বিংশতিবার দেহত্যাগের পর শিবকে বিবাহ, সৃষ্টি-প্রকরণ, ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার শাপ, লক্ষ্মীর উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শক্তিকে বর দিতে যাইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—

মোর ভক্ত হৈঞা নিন্দা যে করে তোমার।
প্রেমভক্তির পথ মাঝে সেই দুরাচার ॥
তব নামে অজা মেষ দিবে বলিদান।
অধঃপাতে জন্ম যাবে নরক নিদান ॥

পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে তোমা যে পূজিবে।
সপ্তবংশ সহ সেই মোর প্রিয় হবে॥

মৃত্যুর জন্ম-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

মহাভার হৈল ক্ষিতি সহিতে না পারে।
বাসুকি সকল কথা জানায় ব্রহ্মারে॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব প্রজাপতি।
বৈকুণ্ঠে আমার স্থানে গেলা শীঘ্রগতি॥
আদি-অন্ত সমাচার করিল জ্ঞাপন।
শুনি ভগবতী আমি করিনু স্মরণ॥
আমার নিকট দেবী আসি দাণ্ডাইল।
অকস্মাৎ মহামায়ার ললাট ঘামিল॥
সেই ঘাম আছাড়িয়া ফেলিল ভূমিতে।
মৃত্যুরূপা কন্যা জন্মে দেখিতে দেখিতে॥

গ্রন্থ-শেষে—

পার্থ বলে মহাপ্রভু তুমি আদি অন্ত।
তোমা হৈতে জানিলাম সকল বৃত্তান্ত॥
এত দূরে সাঙ্গ হৈল গীতার আখ্যান।
যে জন শুনয়ে তার জন্মে দিব্য জ্ঞান॥ ইত্যাদি

এক কবি ভবানীদাস রামের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোষ বংশোদ্ভব কায়স্থ। এই গ্রন্থেও কবি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, যথা—

কলিকালে শ্রেষ্ঠ জাতি হবে অহঙ্কারী।
অগতি লভিবে সবে শুন ধনুর্দ্ধারী॥
অতএব মোর ভক্ত প্রার্থনা করিল।
কলিকালে নীচ যোনি আসিয়া লইল॥

কলিকালে নীচ ঘরে হইয়া উৎপত্তি।
আনন্দে ভজন যেন করে নিতি নিতি ॥
যত দুষ্ট দৈত্যে এবে করিনু সংহার।
কলিতে ব্রাহ্মণ হৈয়া হবে অবতার ॥
ত্রেতাযুগে কত শত বধিনু রাক্ষস।
ক্ষত্রি হৈয়া দ্বাপরে জন্মিল সবিশেষ ॥
শ্রীমহাভারত যুদ্ধে যতেক মরিল।
কলিতে জন্মিবে সব তোমারে কহিল ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহে সব দুরাচার।
অসুর ব্যভার করি হবে অবতার ॥

কবি নিজে কায়স্থ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের প্রতি এইভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন ধরিয়া লইলে রামের স্বর্গারোহণ পালার রচয়িতা ভবানী-দাসকে এই কবির সহিত অভিন্ন কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের কোথাও তিনি নিজের বাসভূমি পাতগুার উল্লেখ করেন নাই, এবং যাদবানন্দ ও যশোদার পুত্র বলিয়াও নিজের পরিচয় দেন নাই। অতএব তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

শক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তির আখ্যায়িকা দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রেমভক্তি না জন্মিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ইহা স্পষ্টই চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণবতত্ত্ব অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যবনোৎপত্তির বিবরণ হইতেও বুঝা যায় যে, কবি মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যান্য আখ্যায়িকা রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভাগবত

প্রবেশিকা

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ব্যাসদেব লোক-পরম্পরায় যজ্ঞ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি নামে পৃথক্ করিয়াছিলেন, আর ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জৈমিনি কবি (বোধ হয় ইহা দ্বারা মহাভারতকার জৈমিনিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে) সামবেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন। স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম পতিত ব্রাহ্মণাদির বেদে অধিকার ছিল না, এইজন্য সকলের মঙ্গলার্থে ব্যাসদেব কৃপা করিয়া মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মন পরিতুষ্ট হইতে পারে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সকল গ্রন্থে ভাগবত ধর্ম্ম বাহুল্যরূপে বর্ণিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে। এমন সময়ে মহর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে ভগবানের যশঃ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে প্ররোচিত করেন। ইহারই ফলে শ্রীমদ্ভাগবত নামক সাত্বতসংহিতা রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-রচনা করিয়া ব্যাসদেব প্রথমতঃ ইহা তাঁহার পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা করান। তিনি পরীক্ষিতের নিকটে ইহা বিবৃত করিয়াছিলেন, এইভাবে ভাগবত প্রচারিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত বিবৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারতের পরে ভাগবত রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই মহাভারতের অনেক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া ভাগবতের প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছে। অশ্বত্থামা

কর্ত্তৃক নিদ্রিত বালকগণের বধ, অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের রক্ষা, যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা, পরীক্ষিতের জন্ম, বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে গমন, এবং তথায় যোগবলে প্রাণত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান-বার্ত্তা শ্রবণের পরে পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি ঘটনা মহাভারত অনুসরণ করিয়াই ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

পরীক্ষিত শমীক মুনির কণ্ঠে মৃত সর্প প্রদান করাতে ব্রহ্মশাপে তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া গঙ্গায় দেহত্যাগ করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিবার সময়ে শুকদেব আগমন করিয়া তাঁহাকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাভারত হইতেই এই সকল আখ্যায়িকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রথম স্কন্ধে আরও কিছু নূতনত্ব রহিয়াছে। ভগবানের দশ অবতারের সম্বন্ধেই সাধারণতঃ আমরা অবহিত আছি, কিন্তু ভাগবতে বাইশটি অবতারের বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, যথা—সনৎকুমার, বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, (১২ ও ১৩) ধন্বন্তরি, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্যাস, রাম, (১৯+২০) রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় ভাগবতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজলীলা, মথুরালীলা, এবং দ্বারকালীলা বর্ণনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। যদিও দুই একখানি ভাগবতে দেখা যায় যে, ভাগবতের প্রথমস্কন্ধ হইতেই রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় সকল গ্রন্থেই ভাগবত বহির্ভূত দানলীলাদির সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে রাধাকে চন্দ্রাবলী আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই বড়াই-ঘটিত দানলীলার বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবেরই সন্ধান দেয়। অতএব এই গ্রন্থ যে সুপ্রাচীন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় স্কন্ধে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব ভাগবত-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

দশমস্কন্ধের প্রথমেই দেখা যায় যে, দৈত্যপদভরে আক্রান্তা পৃথিবী ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তৎপর শঙ্করাদি দেবগণ সহ ব্রহ্মার ক্ষীরোদশায়ী হরির স্তুতি, এবং আকাশবাণীতে ভগবানের ভূতলে আগমনের আশ্বাস জ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কালনেমি নামক দৈত্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল। পরে সেই কালনেমিই কংস রূপে জন্মগ্রহণ করে (বিষ্ণুপু, ৫।১।২২)। উগ্রসেনের এক ভ্রাতার নাম ছিল দেবক। তাঁহারই কন্যার নাম দৈবকী। শূরবংশীয় বসুদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (ভা, ১০।১।২৯)। ভাগবতে বসুদেব ও দৈবকীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বসুদেব ছিলেন সুতপা নামে প্রজাপতি, এবং দৈবকী ছিলেন পৃশ্নি নামে তাঁহার পত্নী। তপস্যা করিয়া তাঁহারা নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। পরজন্মে তাঁহারা কশ্যপ ও অদিতিরূপে জন্মগ্রহণ করিলে নারায়ণ বামনরূপে তাঁহাদের পুত্র হইয়াছিলেন। পরে বরুণের যজ্ঞে দিতি ও সুরভি নামক দুইটি গাভীর অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া কশ্যপ তাহাদিগকে আত্মসাৎ করেন। এজন্য ব্রহ্মার শাপে কশ্যপ বসুদেব রূপে, এবং ঐ কামধেনুদ্বয় দৈবকী ও রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করেন (হরিবংশ, ১।৫৫।২১-২৮)। কংস দৈবকীর রথচালনা করিয়া যাইবার কালে আকাশবাণীতে জানিতে পারে যে, দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হস্তে তাহার নিধন হইবে। তখন সে দৈবকীকে কাটিতে উদ্যত হইলে বসুদেব নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নিবারিত করেন। তারপর দৈবকীর ছয় গর্ভের সন্তানদিগকে কংস একে একে বিনাশ করিয়াছিল। ইহাদিগকে "ষড়গর্ভ" বলা হয়। ঊর্ণার গর্ভে ব্রহ্মপুত্র মরীচির ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা কোন কারণে ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মার শাপে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে (ভা, ১০।৮৫।৩৮-৩৯)।

বিষ্ণুপুরাণেও ইহাদিগকে হিরণ্যকশিপুর পুত্রই বলা হইয়াছে (ঐ, ৫।১।৬৯)। ইহাদের নাম ছিল—স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্‌ ও ঘৃণি (ভা, ১০।৮৫।৪১)। কিন্তু হরিবংশে ইহাদিগকে হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমির পুত্র বলা হইয়াছে (ঐ, ২।২।১২)। তাহারা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়াছিল বলিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাদিগকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিল যে, তাহারা ক্রমান্বয়ে দৈবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের পিতা (অর্থাৎ কংসরূপে অবতীর্ণ) কালনেমি কর্ত্তৃক নিহত হইবে (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মায়া এই ষড়গর্ভগণকে দৈবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপু, ৫।১।৬৯; হরিবংশ, ২।২।২৮)। কূর্ম্মপুরাণের ২৪শ অধ্যায়ে দৈবকীর এই ছয় পুত্র সুষেণ, মদ্রসেন, বজ্রদন্ত, ভদ্রসেন, কীর্ত্তিমান, ও ঋজুদাস (?) নামে অভিহিত হইয়াছে। ভাগবতেও দৈবকীর প্রথম পুত্রকে কীর্ত্তিমান বলা হইয়াছে (ঐ, ১০।১।৫৭)। বসুদেব নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষাকল্পে কীর্ত্তিমানকে কংসের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কংস তাঁহাকে পুত্র প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু ষড়গর্ভগণকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নারদ আসিয়া কংসকে দেবগণের চক্রান্তের সংবাদ জ্ঞাপন করিলে কংস দৈবকীর এই ছয় পুত্রকেই একে একে নিহত করিয়াছিল। এইভাবে দশমস্কন্ধে ভাগবতের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

যে সকল কবির সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে ঃ—

১। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
২। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
৩। দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
৪-৫। যদুনন্দনের গোবিন্দবিলাস, এবং যদুনাথ দাসের গোবিন্দচরিত।
৬। কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

৭ কবিশেখরের গোপালবিজয়।
৮ কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস
৯ দ্বিজ হরিদাসের মুকুন্দমঙ্গল।
১০ দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল।
১১ অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয়।
১২ দুর্লভনন্দনের ভাগবত।
১৩ কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল।
১৪। ভবানন্দের হরিবংশ।
১৫। দ্বিজরামকান্তের রাসলীলা।
১৬। কৃষ্ণদাসের গোবিন্দবিজয়।
১৭। জীবন চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
১৮। দ্বিজ পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
২০। বাসুদেব ঘোষের শ্রীকৃষ্ণলীলা।
২১। নরহরিদাসের ভাগবত।
২২। অচ্যুতদাসের কৃষ্ণলীলা।
২৩। ভবানন্দসেনের ভাগবত।
২৪। ভক্তরামদাসের গোকুলমঙ্গল।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

কবির পরিচয় :—মালাধর কুলীন গ্রামের বসু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় বসুবংশের যে বংশলতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায়, দশরথ বসু হইতে মালাধর ১৩শ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন[১]। গ্রন্থমধ্যে নিজের পরিচয় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।

(ভক্তিবিনোদ সং, ২১৭ পৃঃ)

অন্যত্র তিনি মাতাপিতার নামও উল্লেখ করিয়াছেন—

বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুবতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥

ঐ, ২ পৃঃ

কবি চতুর্দ্দশ পুত্রের জনক, তন্মধ্যে সত্যরাজ খাঁন (লক্ষ্মীনাথ বসু) বোধ হয় পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, কারণ গ্রন্থমধ্যে এইভাবে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে—

সত্যরাজ খাঁন হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥

ঐ, ২১৭ পৃঃ

১। কবির বংশলতা :—১। দশরথ বসু, ২। কুশল বসু, ৩। শুভশঙ্কর, ৪। হংস বসু, ৫। মুক্তিরাম, ৬। দামোদর, ৭। অনন্তরাম, ৮। গুণীনায়ক, ৯। মাধব, ১০। শ্রীপতি, ১১। যজ্ঞেশ্বর, ১২। ভগীরথ, ১৩। মালাধর, ১৪। লক্ষ্মীনাথ (সত্যরাজ খাঁ), ১৫। রামানন্দ বসু।

(ভক্তিবিনোদ সং, ভূমিকা, ৶০ পৃঃ)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ১৫৬ পৃষ্ঠায় যে বংশলতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার মিল নাই।

গৌড়েশ্বরের (সামসুদ্দিন ইউসফ সাহ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৫৬ পৃঃ) নিকট হইতে তিনি "গুণরাজ খাঁন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খাঁন॥

ঐ, ২১৭ পৃঃ]

কবির পুত্র সত্যরাজ, এবং তাঁহার পুত্র রামানন্দ মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে—

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥ ইত্যাদি

ঐ, মধ্যের পঞ্চবিংশে।

অন্যত্র—

কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥

ঐ, মধ্যের চতুর্দ্দশে।

এইভাবে মহাপ্রভু রামানন্দকে প্রতি বৎসর পট্টডোরী প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থরচনার কারণ :—কবি স্বপ্নে ব্যাসদেবের আদেশ লাভ করিয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—

স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস ॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

ভক্তিবিনোদ সং, ২১৭ পৃঃ

অন্যত্র—

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে ॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া ॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীতছন্দে গাই ॥

ঐ, ১ পৃঃ

অর্থাৎ প্রথমতঃ কবি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, (ইহাতে গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে যে কথকতার প্রচলন ছিল তাহারই সন্ধান পাওয়া যায়)। পরে স্বপ্নে ব্যাসদেবের আদেশ লাভ করিয়া কবি ভাগবতের মর্ম্ম পাঁচালীতে লৌকিক ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তখন ভাগবত-শ্রবণ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইত, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ব্যয় করা সম্ভবপর ছিল না, এবং সকলে তাহা বুঝিতেও পারিত না। ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা পাঠ করা সকলের পক্ষেই সহজ হইবে বলিয়াও তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—

অনেক আছয় শাস্ত্র বেদ পুরাণ।
বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান ॥
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে।

কিন্তু এখন— শুনিতে শুনিতে হবে মন যে নির্ম্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সর্ব্বতীর্থ ফল॥

ঐ, ২১৬ পৃঃ।

গ্রন্থরচনার সময় :—কবি লিখিয়াছেন—

তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

ভক্তিবিনোদ সং, ২১৭ পৃঃ

অর্থাৎ ১৩৯৫ শকে বা ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৪০২ শকে বা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ করেন। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাহা হইলে চৈতন্য-দেবের জন্মের প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থরচনা শেষ হইয়াছিল। ভক্তিবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় দেখা যায় যে, তিনি দেবানন্দ বসু কর্ত্তৃক লিখিত ১৪০৫ শকের অনুলিপি দৃষ্টে ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব ইহাও মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পরিচয় :—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাঙ্গালাভাষায় ভাগবত অবলম্বনে রচিত আদি গ্রন্থ। ইহা ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে, এবং ভাগবতের সকল আখ্যায়িকাও ইহাতে স্থান লাভ করে নাই। কবি প্রধানতঃ দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও আবশ্যক মত উপাদান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের পুষ্টি সাধন করা হইয়াছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সুভদ্রা হরণ পর্য্যন্ত আখ্যায়িকাই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের দ্বাবিংশ অবতারের বর্ণনা রহিয়াছে। পৃথিবীতে কলির প্রবেশ অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ইহা

গ্রন্থের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যদুবংশ ধ্বংসের আখ্যায়িকা কবি একাদশ স্কন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অন্যান্য পুরাণ ইহতেও উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবার পরে বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে লইয়া যাইতেছেন। একটি শৃগাল বসুদেবের পুরোভাগে যমুনা পার হইয়া গিয়াছিল, এবং কৃষ্ণ বসুদেবের হাত হইতে যমুনার জলে পতিত হইয়াছিলেন, এই সকল আখ্যায়িকা বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যপুরাণোক্ত বশিষ্ট-দিলীপ-সংবাদে "কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতকথা" হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। যশোদার কন্যা শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়াছেন—

আমাকেও দুঃখ কেন দিলে দুষ্টজন।
তোমাকে মারিতে জন্মিলা পুরুষ রতন ॥
গোকুলে জন্মিল সেই আজিকার রাতি।
না করিহ হেলা তুমি কংস নরপতি ॥

ভক্তিবিনোদ সং, ১১ পৃঃ

এই গোকুলে জন্মিবার কথাও উক্ত ভবিষ্যপুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে রাসের বর্ণনা শেষ করিয়া কবি যে রাধাচন্দ্রাবলী ও গোপগোপী সমন্বিত গোকুলের বর্ণনা করিয়াছেন (৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তাহা ভাগবতে নাই। বোধ হয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

ইহা ব্যতীত পরবর্ত্তীকালে লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনেক পুথিতে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্তাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাগবতে দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি বর্ণিত হয় নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সংস্করণেও (যাহা—প্রায় কবির সমসাময়িক কালে লিখিত পুথি দৃষ্টে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে) এই সকল বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৬০ সংখ্যক পুথিতে দানলীলা ও নৌকালীলা,

এবং ৬৮ সংখ্যক পুথিতে দানলীলা, নৌকালীলা ও ভারখণ্ড সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, ১৴০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল। কবি সাধারণ লোকের বোধগম্য করিয়া ভাগবতের আখ্যায়িকা নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে নবজাত কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ভাগবতে আছে—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-ত্বিষাপরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥

১০।৩।৯-১০

ইহাই অবলম্বন করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
হীরা মণিমাণিক্য মুকুট শোভে শিরে।
হেম অঙ্গুরী শোভে বলয়া দুই করে॥
পাএতে নূপুর শোভে, শ্রীবৎস-দিপতি।
ডাহিনেত লক্ষ্মী শোভে বামে সরস্বতী॥
পরিষদগণে স্তব করেন বিস্তর।
বসুদেব দৈবকীর কাঁপিল অন্তর॥

ভক্তিবিনোদ সং, ৯ পৃঃ

এই রচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও সহজ, সরল ও মধুর হইয়াছে। রাসের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

নানাবর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন।
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন॥

শারদ পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বহে॥
কোকিলের কলরব ভ্রমর-ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশ দিক বসন্ত অবতার॥
কাম অবতার করি বংশীতে নাদ দিল।
শুনিয়া গোকুল-নারী মূর্চ্ছিত হইল॥
জানিল গোবিন্দ বংশী বায় বৃন্দাবনে।
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে॥
কেহ ত স্বামীর কোলে আছিল সুতিয়ে।
কেহ উপকথা কহে বন্ধুজন লয়ে॥
কেহ ত রন্ধন করে কেহ করয়ে ভোজন।
শিশু স্তন পিয়ে কেহ শয্যায় শয়ন॥
যেই জন যেমন ছিল চলিল সত্বরে।
বৃন্দাবনে বংশী বায় নন্দের কুমারে॥

(ঐ, ৪৩ পৃঃ)

তৎপর রাসমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে—

কৃষ্ণের বিরহে গোপী হইল আবেশ।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া রচে গোপী প্রকার বিশেষ॥
কেহ বা পূতনা হৈল কেহ হৈল কান।
গলা চাপি কেহ তার লইল পরাণ॥
কৃষ্ণ হয়ে কেহ তার গলা চাপি ধরে।
বুকেতে বসিয়া কেহ তার প্রাণ হরে॥ ইত্যাদি

তারপর কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী বলিতেছেন—

আমা লয়ে গোবিন্দাই এই বৃন্দাবনে।
করিলা যতেক ক্রীড়া যত ছিল মনে॥

তবে ত আশয় মনে মনে উপজিল।
চলিতে না পারি আমি তাহাকে বলিল॥
তবে ত আমাকে কৃষ্ণ বলিলা বচন।
আমার কান্ধেতে গোপী কর আরোহণ॥
তাহার বচনে আমি অনুমতি দিল।
চড়িতে কানাঞী অন্তর্ধান হৈল॥

এইভাবে কবি ভাগবতের ঘটনাগুলি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে কিছু নূতনত্ব রহিয়াছে।

শুন শুন ওহে নর শুন সাবধানে।
আর দিনে আর ক্রীড়া কৈল নারায়ণে॥
দ্বাদশ বৎসর হৈতে ক্রীড়ে গদাধর।
চৌদ্দ বৎসরের বেলা দেখিতে সুন্দর॥

ভাগবতে রাসের সময় কৃষ্ণের বয়স আট বৎসর মাত্র, অথচ এখানে বার বৎসরের কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বার বৎসর হইতেই কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হইয়াছে (ঐ, দানখণ্ড দ্রষ্টব্য)। অতএব এখানে ঐ গ্রন্থের প্রভাব লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এখান হইতে এই অধ্যায়ে বিবিধ নূতনত্বের সমাবেশ রহিয়াছে। কৃষ্ণ

কল্পতরু মূলে চিন্তা করি একেশ্বর।
যোগ-পীঠে বসি করে আসন সুন্দর॥
তাহার উপরে বসি আছে নন্দবালা!
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোলকলা॥
গোপীগণের সৃষ্টি ষোড়শ নায়িকা।
ষোড়শ নায়িকা সৃষ্টে একলা রাধিকা॥
বামপার্শ্বে রাধিকা দক্ষিণে চন্দ্রাবলী।
আসে পাশে যুথে যুথে রমণী মণ্ডলী॥

চিন্তামণি মন্দিরের চারিখান দ্বার।
পশ্চিম মুখেতে প্রভু রাধাকান্তের বার॥
চারি দ্বারে চারি দ্বারী সে চারি গোপাল।
কৃষ্ণের সমান বেশ দেখিতে রসাল॥
শ্রীদাম গোয়ালা দ্বারী পশ্চিম দুয়ারে ;
পূর্ব্বেতে সুদাম দ্বারী দাম উত্তরে॥ ইত্যাদি

এখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রভাব পতিত হইয়াছে। তারপর গোপিগণের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

বড় প্রিয়তমা কৃষ্ণের রাধা চন্দ্রাবলী
শশীরেখা চিত্তরেখা দুহে সমতুলী॥
প্রিয় বন প্রিয় রমা মদনমঞ্জরী।
ভুবন মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী॥
শ্রীমতী মধুমতী মাধবী কাদাম্বিনী।
নবরঙ্গা রতিলেখা কুন্তিনী শ্রীমন্তিনী॥
ষোড়শ নায়িকা মধ্যে দুজনে প্রধান।
রাধা চন্দ্রাবলী দু'হে একই সমান॥ ইতাাদি

(ঐ, ৫০ পৃঃ)

অন্যত্র—

রূপে গুণে অনুপমা ললিতা সুন্দরী।
স্তনপরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কৌস্তরী॥
শামলা ধবলা রতি তাঁহার সমান।
ভদ্রা পদ্মা হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৫১ পৃঃ)

আমরা জানি, কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার জন্য ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের নামকরণ চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছিল। কিন্তু এখানে

ইঁহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই জন্য মনে হয় ভাগবতাতিরিক্ত এই অধ্যায়টি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে সংযোজিত হইয়াছে। অতএব ভক্তিবিনোদ মহাশয় তাঁহার আদর্শ পুথি যত প্রাচীন বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন ইহা তত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই সময় হইতে যে ভাগবত-বহির্ভূত অনেক ঘটনা এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল পরবর্ত্তী পুথিগুলিতে দান-খণ্ডাদির সংস্থান হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নূতন সং-যোজনার জন্য কবি দায়ী নহেন।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

কবির পরিচয় :—গ্রন্থশেষে কবি নিজেকে "রঘুনাথ পণ্ডিত"রূপে প্রচারিত করিয়াছেন, যথা—

রঘুনাথ পণ্ডিত-রচিত গীতবন্ধ।
শুনিলে সকল লোকে বাড়িবে আনন্দ॥
সুখে ভাগবত লোক বুঝিবার তরে।
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল কথা ছলে॥

পরিষৎ সং, ৪১৯ পৃঃ

অতএব বুঝা যাইতেছে যে "ভাগবতাচার্য্য" কবির উপাধি ছিল। ইহা তিনি মহাপ্রভুর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, যথা—

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগবত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে।

* * *

প্রভু বলে ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য॥

চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যের পঞ্চমে।

ইহা হইতে কবি যে পণ্ডিত ছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বরাহনগরে তাঁহার বাড়ী ছিল।

গ্রন্থের প্রথমভাগে কবি গদাধর পণ্ডিতকে তাঁহার গুরু রূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্যমূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তত্ত্ব সহজ শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।

পসং, ২ পৃঃ

এই গদাধর পণ্ডিত চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, এমন কি তাঁহাকে মহাপ্রভুর "দ্বিতীয় কলেবর" বলা হইত। অতএব তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা ভগবতাচার্য্যের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্ত বল্লভঃ।

কবির ভণিতা :—

ভক্তি-রস গুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী ॥

পসাং, ১১৫ পৃঃ

অথবা—ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
সাবধানে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥

এইরূপ বিভিন্নপ্রকার ভণিতা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থ-পরিচয় :—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। সাহিত্য পরিষৎ হইতে ইহার যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ছোট অক্ষরে দুই কলমে মুদ্রিত ৪১৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থশেষ হইয়াছে। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন— "অনুবাদ প্রায় ২০,০০০ শ্লোকে পূর্ণ" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪৭২ পৃঃ)।

কবি ভাগবতের বারটি স্কন্ধই অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিত আছে—"ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়" ইত্যাদি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, কবি হয়ত ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদই করিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভাগবতের এক এক অধ্যায় হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া নিজের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও আবার সকল অধ্যায় হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার প্রথমস্কন্ধ পাঁচ অধ্যায়ে, দ্বিতীয়স্কন্ধ তিন অধ্যায়ে, তৃতীয়স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। এইরূপে কবি দ্বাদশস্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। আবার অধ্যায়-বিভাগেও তিনি সর্ব্বদা ভাগবত অনুসরণ করেন নাই, যেমন ভাগবতের "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" ইত্যাদি প্রথমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকটীর অনুবাদ গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভাগবত-বর্ণিত প্রধান

প্রধান ঘটনাগুলি তিনি ইচ্ছানুরূপ গ্রহণ করিয়া নিজের ভাষায় তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। কবি নিজেও বলিয়াছেন—

তবে শুন কহি ভাই, হরিগুণ কথা।
কথার ছলে কহিব শ্রীভাগবত-মতা॥

পসং, ২ পৃঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে এই গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অধ্যায়-বিভাগে মিল নাই। বঙ্গবাসী সংস্করণে তৃতীয় অধ্যায়ে এই গ্রন্থের প্রথমস্কন্ধ শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি উভয় সংস্করণেই প্রায় একই প্রকার। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ভাগেই বঙ্গবাসী সংস্করণে যে কয়টি সংস্কৃত শ্লোক রহিয়াছে তাহা পরিষৎ-সংস্করণে মুদ্রিত হয় নাই।

তৎপর—

বন্দো প্রভু নারায়ণ সর্ব্ব-সুখদাতা।
নরাবতার বন্দো অখিল পরিত্রাতা॥

এই শ্লোকটি বঙ্গবাসী সংস্করণে নূতন সংযোজনা। দ্বিতীয় অধ্যায়টি উভয় সংস্করণে প্রায় একই প্রকার, কিন্তু পরিষৎ সংস্করণের পরবর্ত্তী তিনটি অধ্যায় বঙ্গবাসী সংস্করণে তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য পরিষৎ-সংস্করণের তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি জ্ঞাপক—

ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস-গান॥

ভণিতাটি বঙ্গবাসী সংস্করণে পাওয়া যায় না। তারপর পরিষৎ সংস্করণের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রারম্ভসূচক কয়েকটি শ্লোক বঙ্গবাসী সংস্করণে প্রথম স্কন্ধের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এদেশে পুথি লিখিবার কালে গ্রন্থ কিরূপে

পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভণিতা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, অধ্যায়বিভাগে যেন পরিষদের আদর্শ পুথিই অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল।

যাহাই হউক, ভগবতাচার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার রচনা পাঠ করিলে মূল সংস্কৃত শ্লোকের ধারণা অনেকটা মনে উদিত হইয়া থাকে। তিনি লিখিয়াছেন—

নিগমকল্পতরু-বিগলিত ফলে।
শুকমুখে পতিত অমৃত মধু ভরে॥
ক্ষিতিতলে অবতরি ভাগবত নাম।
পিয়রে ভাবুক তাই রসিক সুজান॥

আর সংস্কৃত শ্লোকে আছে—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

ইহাকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু কবি যেভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যথাসাধ্য মূলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস এইরূপ আদর্শ অনুসরণ করেন নাই, এইজন্য তাঁহারা স্বাধীনভাবে গ্রন্থ-রচনার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগবতাচার্য্য সর্ব্বদা আদর্শের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। অতএব তাঁহার গ্রন্থে যে কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ভাগবতের প্রতিচ্ছবিমাত্র, কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থ রচনায় তিনি অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই প্রশংসা কাহার প্রাপ্য তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাসের প্রারম্ভ-সূচক রচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

শুক বলে পরীক্ষিৎ করিয়া ভকতি।
বৃন্দাবন-বিহার শুনহ নরপতি॥
গোপীকার কাম্য-সিদ্ধি করিতে মুরারি।
বৃন্দাবন-পুলিনে চলিল শ্রীহরি॥
শরৎ সহায় আর পুর্ণিমা রজনী।
মনোহর মুরলী বাজাল যদুমণি॥
একত্র মিলিয়া আইল ষড়্ঋতুগণ।
যমুনা লহরী তাহে সুমন্দ পবন॥
প্রফুল্ল কমল দল ভ্রমর গুঞ্জরে।
কুহু কুহু কোকিল করয়ে সুমধুরে॥ ইত্যাদি

পরিষৎ সং, ১৯৯ পৃঃ

কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণে আছে—

গোপীকার সঙ্গে কৃষ্ণ করিব রমন।
মনে হেন কৈলা যদি প্রভু নারায়ণ॥
শরৎ-যামিনী চারু চৌদিকে বিমল।
প্রফুল্ল মালতী জাতি যুথিকা সুন্দর॥
বহু গুণ বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমা শশী উদিত গগনে॥
চিরদিনে যেন নারী পতি দরশনে।
সর্ব্ব দুঃখ শোক হরে আনন্দিত মনে॥
কমলা বদন তুল্য পূর্ণ শশধর।
তা দেখিয়া আনন্দিত ভাবে গদাধর॥ ইত্যাদি

(ঐ, ২৩৬ পৃঃ)

এই যে দশ পঙ্‌ক্তি করিয়া উভয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল, ইহাতে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। অতএব জয়মাল্য আমাদের হাতেই থাকিয়া যায়, সাহস করিয়া আমরা কাহার গলায় অর্পণ করিব তাহা বুঝিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি হয়ত ভাগবতাচার্য্যের রচনা, অপরটি অন্য কোন কবির রচনা হইবে, ভাগবতাচার্য্যের নামে চলিয়া যাইতেছে। দ্বিজ রামকান্তের রাসলীলা সম্বন্ধীয় আলোচনায় ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই কবির রচনাই বঙ্গবাসী-সংস্করণে ভাগবতাচার্য্যের ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে (পরে দ্রষ্টব্য)।

দ্বিজ মাধব-রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কবির পরিচয়:—প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব আচার্য্যের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত ভ্রাতা, এবং বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন—

দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া-নগর॥
তাহার পত্নী হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন-পত্নী নাম হয় মহামায়া।
একমাত্র কন্যা প্রসাবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
একমাত্র কন্যা তাঁর, না হইল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রে তারে কৈলা দান॥

কালিদাস মিশ্র-পত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্র রত্ন সর্ব্বগুণধাম॥
একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস।
পৃথ্বী-ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি॥
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি॥

প্রেমবিলাস, ৩১৫ পৃঃ

এই মাধব নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—

নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিহ হইল বিদিত॥

মহাপ্রভুর অভিষেকের সময়ে তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, এবং চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। ইহার পরে সাধন ভজন করিতে করিতে তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাহা দেখিয়া মাধবের মাতা ঠাকুরাণী তাঁহার বিবাহের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন। এইজন্য মাধব পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনেই অবস্থান করিতে থাকেন। তৎপর মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দের সহিত খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হন। উৎসবের পরেই তিনি পুনরায় বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন যে, খেতুরীর উৎসবের পরে জাহ্নবীদেবীর সহিত বৃন্দাবনে যাইয়া নিত্যানন্দ মাধবাচার্য্যের সঙ্গে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্ব-উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন—

বৃন্দাবনে গেলুঁ আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে।
মাধব-আচার্য্য সনে ভ্রমিনু আমি রঙ্গে॥

এইঁ করিলা মোরে তত্ত্ব-উপদেশ।
তাঁর পদপদ্মে মোর প্রণতি বিশেষ॥

প্রেমবিলাস, ৩১৭ পৃঃ

নিত্যানন্দ দাসের মতে এই মাধবাচার্য্যই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
গীতি-বর্ণনাতে তিঁহ করি নানা ছন্দ॥
রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে কৈল অনুগ্রহ।
সব ভক্তগণ তাঁরে করিলেন স্নেহ॥
মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করিলা আদেশ।
দীক্ষা মন্ত্র মাধবেরে কর উপদেশ॥

ঐ, ৩১৬ পৃঃ

এখানে যেভাবে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে ইহা ১৪৩১শক বা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। কিন্তু প্রেমবিলাসে প্রদত্ত মাধবাচার্য্যের এই পরিচয় সন্দেহের অতীত নহে। নিত্যানন্দ দাস মাধবাচার্য্যকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত ভ্রাতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবাচার দর্পণে আছে—

সুধীরা যে সখী মাধবাচার্য্য এবে।
সনাতন মিশ্র-পুত্র সুধীরা জানিবে॥
নবদ্বীপে বাস, বিষ্ণুপ্রিয়া শাখা জানি।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁহার ভগিনী॥

এখানে মাধবাচার্য্যকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহোদর ভাই বলা হইয়াছে। অথচ প্রেমবিলাসের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে বিষ্ণুপ্রিয়ার আর কোন ভাই ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন সনাতনের "একমাত্র" কন্যা, আর তাঁহার অন্য কোন "সন্তান" ছিল না। যে সকল প্রাচীন পুথির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাতেই এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি থাকিলে প্রকৃত সত্য নিদ্ধারণ করা কষ্টকর। এদিকে নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইতেরা বলেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতার নাম যাদব (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পরিশিষ্ট, ৬১ পৃঃ ; মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং, ভূমিকা, ২—৩ পৃঃ ; সাহিত্য, ১৩০৬ সাল, ফাল্গুন, ৬৬৭—৬৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কেহ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। অতএব মাধবাচার্য্যকে চৈতন্যদেবের শ্যালকরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকায় কৃষ্ণমঙ্গলকার মাধবাচার্য্যকে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কবির বংশধরেরা চান্দুয়ায় (বীরভূমি, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৩৪ পৃঃ) এবং ময়মনসিংহ, মালদহ, ত্রিপুরা, ঢাকা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় বাস করিতেছেন (কিশোরগঞ্জ বার্ত্তাবহ, ১৩৩৩ সাল, ৭ই মাঘ)। কবি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া চৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন (সাহিত্য, ১৩০৬ সাল, ৬৬৮ পৃঃ)। কবির নাম বোধ হয় "ভূদেব-মাধব" ছিল, কারণ তাঁহার ভণিতায় আছে—

চৈতন্য-চরণ-ধন   শিরে করি আভরণ
ভূদেব-মাধব ভাসে।

(বঙ্গবাসী সং, ৪ পৃঃ)

কবি স্বপ্নে কৃষ্ণের বা চৈতন্যদেবের আদেশ লাভ করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত মধুর সঙ্গীত।
নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদিত॥

স্বপনে পাইনু মুঞি কৃষ্ণ-উপদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥ ঐ, ২ পৃঃ

অন্যত্র—স্বপনে হইল কৃষ্ণচৈতন্য-আদেশ।

কঃ বিঃ, ৯৮০ সং পুথি, ৪ পৃঃ।

আমাদেরও মনে হয় তথাকথিত বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা মাধব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। প্রেমাবিলাসে যেভাবে মাধবের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, তিনি চৈতন্যদেবের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। খেতুরীর উৎসব ১৫০৪ শক বা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল ধরিয়া লইলে, সেই সময়ে মাধবাচার্য্যের বয়স প্রায় একশত বৎসর হয়। এত অধিক বয়সে তিনি বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আবার ইহারও পরে নিত্যানন্দদাস বৃন্দাবনে গমন করিয়া মাধবাচার্য্যের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহাও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ কোন "আচার্য্য" প্রভুর "ভৃত্য" কৃষ্ণদাস যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বন্দনা-অংশে আছে—

অদ্বৈত স্বরূপ বন্দ রায় রামানন্দ।
রূপ সনাতন বন্দ করিয়া আনন্দ॥
বৃন্দাবন দাস বন্দ হইঞা সম্মত।
জাহার রচিত গীত চৈতন্য-ভাগবত॥

পরিষৎ সং, ৫ পৃঃ

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চৈতন্যভাগবত রচনার পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৫৪৬ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল বলিয়া অভিজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন[১]। ইহার পরে কৃষ্ণদাস

১। দীনেশ বাবুর মতে ১৫৭৩ খ্রীঃ; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ও মুরারিলাল অধিকারীর মতে ১৫৭৫ খ্রীঃ; রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খ্রীঃ; ডাঃ বিমান মজুমদার মহাশয়ের মতে ১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (চৈতন্যচরিতের উপাদান, ১৮৫ পৃঃ)।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহা পাঠ করিয়া মাধবাচার্য্য ইহার প্রশংসা করিয়া ঐ গ্রন্থ দক্ষিণে প্রচারিত হইবে, এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা যে বঙ্গদেশেই ঘটিয়াছিল তাহা দক্ষিণে প্রচারের কথা হইতেই বুঝা যায়। অতএব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা মাধব, এবং নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধবকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধব এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এবং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে গ্রন্থ-রচনা করিয়া থাকিবেন, এবং ইহার পরে কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থের প্রাচীনত্ব:—কবি দৈবকীনন্দন তাঁহার "বৈষ্ণববন্দনায়" লিখিয়াছেন—

মাধব-আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

এক বৃন্দাবন দাসও তাঁহার "বৈষ্ণববন্দনায়" লিখিয়াছেন—

তবে ত বন্দনা কৈলুঁ মাধব-আচার্য্য।
কৃষ্ণগুণ বর্ণনা সদাই যাঁর কার্য্য॥
যে কৃষ্ণমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে॥

কৃষ্ণমঙ্গল্ রচয়িতা কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

মাধব-আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

শ্রীজীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

বন্দে শ্রীমাধবাচার্য্যং কৃষ্ণমঙ্গলকারকম্।
(শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পরিশিষ্ট ১১১ পৃঃ)

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল অতি প্রাচীন গ্রন্থ।

কবির ভণিতা—

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা এক চিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব-রচিত ॥

এইভাবে কবি প্রায় সর্ব্বত্রই নিজেকে "দ্বিজ মাধব" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে দুই এক স্থানে "মাধব-আচার্য্য" ভণিতাও পাওয়া যায়—

মাধব-আচার্য্য কহে শুনিলে দুরিত দহে
পরম মঙ্গল হরিকথা।

বঙ্গবাসী সং, ৪৫ পৃঃ

কিন্তু কোন কোন হস্তলিখিত পুথিতে ভাগবতাচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণীর অনুকরণেও দুই একটি ভণিতা সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীকৃষ্ণের লীলা যত অদ্ভুত কাহিনী।
মাধব-আচার্য্য রচে কৃষ্ণ-তরঙ্গিনী ॥

ঐ, ৪৯ পৃঃ।

গ্রন্থের পরিচয়—মাধব ভাগবতের দশমস্কন্ধ প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, যেমন যদুবংশ ধ্বংস ও পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের বিবরণ একাদশ স্কন্ধ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ অবলম্বন করিয়াও তিনি আখ্যায়িকার সমাবেশ করিয়াছেন, যথা—

রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ-মতে ॥

বঙ্গবাসী সং, ১৭৪ পৃঃ

পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে॥

ঐ, ২১২ পৃঃ।

ইহা ব্যতীত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডে বর্ণিত লীলার উপাদান তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও গোপীগণ কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য পরামর্শ করিয়া মথুরায় যাইতেছেন।

কবির রচনার নমুনা :—শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায়—

কোটি চন্দ্র জিনি অতি অনুপম তুণ্ড।
অরুণ অধর স্মিত বিকসিত গণ্ড॥
কুন্দ জিনিয়া দন্ত পরম উজ্জ্বল।
আকর্ণ লোচনভার বড়ই প্রসর॥
দীঘল নাসিকা গ্রীবা সিংহসুত রঙ্গ।
ত্রিভুবন জিনিয়া সুন্দর গজস্কন্ধ॥
সুললিত ভুজদণ্ড লম্বিত অঙ্গুলি।
ক্ষীণ তনুভাগমধ্য রুচির ত্রিবলী॥
চরণ সরসিরুহ মধুকর বোল।
হিমকর জিনি নখ রজনী উজোর॥ ঐ, ১৬ পৃঃ

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের সাজসজ্জা—

লজ্জাভয় পরিহরি যত গোপীগণ।
যে যে কর্ম্মে রত ছিল ত্যজিল তখন॥
কেহ কেহ ত্যজিলেক ধেনুর দোহন।
কেহ গৃহ পরিহরি দুগ্ধ আবর্ত্তন॥
কেহ কেহ ত্যজিলেক রন্ধন ভোজন।
কেহ শয্যা ত্যজি, কেহ পতির সেবন॥

কেহ পুত্রে স্তন্যপান করি পরিহরি।
ভূষণ করয়ে সবে দেখিতে শ্রীহরি॥
কেহ কেহ দেয় এক নয়নে অঞ্জন।
কেহ এক কুচে দেই কুঙকুম চন্দন॥
কেহ কেহ দেয় অধ সীমন্তে সিন্দুর।
কেহ ভ্রমে পদে হার, করেতে নূপুর॥
হস্তের ভূষণ কেহ পরয়ে চরণে।
হস্তেতে পরয়ে কেহ পদের ভূষণে॥

ঐ, ৯৪ পৃঃ।

কবির অন্যান্য গ্রন্থ :—মাধব সংস্কৃতভাষায় প্রেমরত্নাকর নামে একখানি বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (সাহিত্য, ১৩০৬ সাল, ৬৬৮ পৃঃ; বঙ্গবাসী সং, ভূমিকা, ৩ পৃঃ; শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পরিশিষ্ট, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যদুনন্দনের গোবিন্দবিলাস ও যদুনাথ দাসের গোবিন্দচরিত

এই দুইখানি গ্রন্থই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "গোবিন্দলীলামৃত" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। কৃষ্ণদাস ভাগবতের কৃষ্ণলীলাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অনুবাদও এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইল। কিন্তু উভয় গ্রন্থে আশ্চর্য্যজনক রচনা-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গোবিন্দলীলামৃতের প্রথম সর্গের—

নিশাবসানং সমবেক্ষ্য বৃন্দা
বৃন্দং দ্বিজানাং নিজশাসনস্থং।
নিযোজয়ামাস সরাধিকস্য
প্রবোধনার্থং মধুসূদনস্য॥১১॥

আসন্ যদর্থং প্রথমং দ্বিজেন্দ্রাঃ
সেবাসমুৎকণ্ঠধিয়োঽপি মূকাঃ।
বৃন্দানিদেশং তমবাপ্য হর্ষাৎ
ক্রীড়ানিকুঞ্জং পারিতশ্চুকূজুঃ ॥১২॥

দ্রাক্ষাসু সার্য্যঃ করকেষু কীরাঃ
জগুঃ পিকীভিশ্চ পিকা রসালে।
পীলৌ কপোতা প্রিয়কে ময়ূরাঃ
লতাসু ভৃঙ্গা ভুবি তাম্রচূড়া ॥ ১৩ ॥

এই শ্লোকে তিনটির অনুবাদে যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন মাঝে।
শয়ন কুসুমকুঞ্জে কুসুমিত সেজে ॥
রসের আলসে দুহু সুখে নিদ্রা যায়।
হেম মণি-মরকত জনু এক ঠায় ॥
সেবাপর যারা তারা সময় জানিঞা।
যার জে জে সেবা হয় করে হর্ষ পাঞা ॥
নিশা অবসানে পক্ষী জাগিল সকল।
নিশব্দেই আছে সবে নিজ নিজ থল ॥
রাধাকৃষ্ণ জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে।
বৃন্দার আদেশ বিনু জাগাইতে নারে ॥
তবে বৃন্দাদেবী জবে আদেশিলা তারে।
নিকুঞ্জ বেড়িয়া সবে কোলাহল করে ॥
দ্রাক্ষা তরুতে সারী দালিম্বে ডাকে কীর।
কোকিল কোকিলী ডাকে আম্রবৃক্ষে থীর।

পিলুবৃক্ষে কপোত আর কদম্বে মউর।
লতাতে ভ্রমরা গুঞ্জে ভূমে তাম্রচূড় ॥
যদুনন্দনের গোবিন্দবিলাস, কঃ বিঃ ৩৯৫৫ সং পুথি, ৬ পত্র।

কিন্তু যদুনাথ দাসের গ্রন্থে আছে—

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন মাঝে।
শয়ন কুসুমকুঞ্জে কুসুমিত সেজে ॥
রসের আলসে দুহু সুখে নিদ্রা জায়।
হেম মণি-মরকত জনু এক ঠায় ॥
সেবাপর যেই সম(*) জানিঞা।
আর জে জে সেবা হয় করে হর্ষ পাঞা ॥
নিসি অবসানে পক্ষী জাগিল সকল।
নিসব্দেই আছে সবে নিজ নিজ স্থল ॥
রাধাকৃষ্ণ জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে।
বৃন্দা-আজ্ঞা বিনু শব্দ করিতে না পারে ॥
তবে বৃন্দাদেবী জবে আজ্ঞা দিল তারে।
ক্রিড়া-নিকুঞ্জে বেঢ়ি সভে সব্দ করে ॥
দ্রাক্ষা বৃক্ষে সারী আর দাড়িম্ব বৃক্ষে কীর।
কোকিল কোকিলা ডাকে আম্রবৃক্ষে থীর ॥
পিলুবৃক্ষে কপোত আর কদম্বে মউর।
লতাতে ভ্রমরা গুঞ্জে ভূবি তাম্রচূড় ॥
কঃ বিঃ ৪০৯১ সং পুথি, পত্র ৫

অতএব সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত উভয় গ্রন্থে প্রায় একই রচনা পাওয়া যাইতেছে। তথাপি উভয়ের ভণিতা এইরূপ—

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাসে।
এ যদুনন্দন নিজ দৈন্য পরকাসে ॥
ঐ, ৩৯৫৫ সং পুথি, পত্র, ৬

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাসে।
গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথ দাসে॥

ঐ, ৪০৯১ সং পুথি, পত্র, ৫

অন্যত্র—

নিকুঞ্জে নিশান্ত কেলি মধুর বিলাস।
এ যদুনন্দন কহে রসময় ভাস॥

ঐ, ৩৯৫৫ সং পুথি, পত্র ১৪

এবং নিকুঞ্জ নিশান্ত কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহএ কিছু যদুনাথ দাস॥

ঐ, ৪০৯১ সং পুথি, ১৪ পত্র

ইহা হইতে বুঝা যায়, উভয়েই গোবিন্দ লীলামৃতের অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন অপরকে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইহারও মীমাংসা করা যাইতে পারে।

পদকল্পতরু এবং গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় একাধিক যদুনন্দনের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু একজন মাত্র যদুনাথের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র, যথা—

রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম এক স্থান॥
তিন পুত্র তাঁর—কৃষ্ণপদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥

চৈতন্যভাগবত,

অন্যত্র—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥

চরিতামৃতের আদির একাদশে

এবং—

যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥

চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যের ষষ্ঠে

ইহাই লক্ষ্য করিয়া সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"ইহাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত না হইলেও ইহাঁর কবিচন্দ্র উপাধি দ্বারাই বুঝা যায় যে, ইনি একজন কাব্য-প্রণেতা, বা অন্ততঃ পক্ষে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।" (তরুর ভূমিকা, ১৯৫ পৃঃ)।

উপরে যদুনন্দন ও যদুনাথের যে সকল ভণিতা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যদুনাথ কৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ গ্রন্থ কবি নিজেই "গোবিন্দ চরিত" নামে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যদুনন্দনের গ্রন্থের নাম বোধ হয় (গোবিন্দ) বিলাস। অতএব সতীশ রায় মহাশয় যে বলিয়াছেন—"তাঁহার পক্ষে কোন কোন পদে ছন্দের অনুরোধে যদুনন্দন নামের পরিবর্ত্তে চতুরক্ষর যদুনাথ নামের ব্যবহার করা অসম্ভব বোধ হয় না" (তরুর ভূমিকা, ১৯৫ পৃঃ) এই সিদ্ধান্ত যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ এখানে আমরা দুইখানি গ্রন্থ পাইতেছি, তাহার একখানিতে সর্ব্বত্রই যদুনন্দন ভণিতা, এবং অপর খানিতে সর্ব্বত্রই যদুনাথ ভণিতা মিলিতেছে। অতএব এখানে নামের অক্ষর সংক্ষেপ করিয়া ভণিতা প্রদানের কথা উঠিতেই পারে না, আবার গ্রন্থের নামও বিভিন্ন। এইজন্য আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, যদুনাথ ও যদুনন্দন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ডাঃ

বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"জগদ্বন্ধু ভদ্র ও সতীশ চন্দ্র রায় পদকর্ত্তা যদু, যদুনাথ, যদুনন্দনকে গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদক যদুনন্দন স্থির করিয়াছেন। কি প্রমাণের বলে তাঁহারা যদু ও যদুনাথ ভণিতার পদ যদুনন্দনে আরোপ করেন তাহা বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ইঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।" (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, পরিশিষ্ট, ৬৫ পৃঃ)। কিন্তু একই গ্রন্থের অনুবাদ উভয়েই করিয়াছিলেন বলিয়া উভয়ের রচনায় সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, একে অপরকে অনুসরণ করিয়াছেন। যদুনাথ মহাপ্রভুর সমসাময়িক, কিন্তু যদুনন্দন তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী। এইজন্য আমাদের বোধ হইতেছে যে, যদুনাথের রচনাই সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত যদুনন্দন নিজের ভণিতায় চালাইয়াছেন। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "প্রায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দলীলামৃত, এবং ১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল" (চৈতন্যচরিতের উপাদান, ৩০৬, ১৮৫ পৃঃ)। চৈতন্যভাগবতে যদুনাথকে "কবিচন্দ্র" বলা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঐ গ্রন্থ রচনার সময়ে তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা হইলে তিনি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ ব্যতীত আরও কোন গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে রচনা করিয়া কবি-খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যদুনাথ "ভ্রমর গীতারও" বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৪৭ম অধ্যায়ের ৯ হইতে ১৯ সংখ্যক ১১টি শ্লোক ভ্রমরগীতা নামে প্রচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে কোন বিরহিণী গোপী একটি ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে এই শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতে লিখিত আছে। যদুনাথ এইভাবে ইহাদের অনুবাদ করিয়াছেন—

শুন শুন ভক্তগণ করহ শ্রবণ।
ভ্রমর দেখিয়া যে কহিল গোপীগণ॥

কৃষ্ণ মধুপুরে গেল এথা গোপীগণ।
দিবানিশি নাহি জানে করয়ে রোদন॥
কৃষ্ণের বিরহ বিনে নাহি জানে আন।
কৃষ্ণে সমর্পিলে গোপীসকলের প্রাণ॥
দশে পাঁচে গোপী সব একত্রে বসিয়া।
কৃষ্ণকথা কহে সবে চিত্ত নিবারিয়া॥
একদিন গোপীগণ কহে কৃষ্ণ কথা।
দৈবযোগে ভ্রমর চলিয়া গেল তথা॥

সাঃ পঃ ২৯২ সং পুথির প্রারম্ভ

ভাগবতের ঐ সকল শ্লোকের ভাবানুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইলেও কবির কল্পনাপ্রসূত রচনাও ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোপীগণের বারমাসী হইতে কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

ফাল্গুনে দ্বিগুণ বহে বসন্তের বাও।
সহিতে না পারি তাহে ভ্রমরের রাও॥
রসাল মুকুল ডালে দেখি প্রাণ যায়।
প্রার্ণনাথ নাহি ঘরে কি করি উপায়॥
চৈত্রে চাতকপক্ষী ডাকে পিয়া পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিল মোরে হাতে নিধি দিয়া॥
পলাস কাঞ্চন বিকসিত নানা ফুল।
আর নাকি প্রাণনাথ আসিবে গোকুল॥

* * * *

দারুণ আষাঢ় মাসে মেঘের গর্জ্জন।
শুনিয়া বিদরে বুক স্থির নহে মন॥ ইত্যাদি

ঐ, ৪-৫ পৃঃ

ইহা ব্যতীত কবি কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে অনেক পদও রচনা করিয়াছিলেন (পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণী দ্রষ্টব্য)। অতএব যদুনাথের কবি-খ্যাতি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করিবার পূর্ব্বেও প্রচারিত হইতে পারে[১]। উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যদুনাথ সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়াও কিছু কাল জীবিত ছিলেন। আর যদুনন্দন ১৫২৯ শকে (১৬০৭ খ্রীঃ) কর্ণানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। অতএব তিনি যদুনাথের পরবর্ত্তী।

যদুনন্দন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হইল।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

বিদগ্ধমাধব, ১।৩৩

১। ডাঃ সুকুমার সেন ভ্রমরগীতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"কবি কাব্যের নাম দিয়াছেন মাথুর-বর্ণনা। মনে হয় ইহা কবি প্রণীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যের অংশ মাত্র।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫৩৯ পৃঃ)। যদুনাথ যে কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সেন মহাশয়ের কল্পনা মাত্র। ভ্রমর গীতার শেষে "মাথুর-বর্ণনা কহে যদুনাথ দাস" আছে বলিয়া তাহাতে গ্রন্থের নামের সন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ ইহা দ্বারা গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অন্যত্র ভণিতা এইরূপ—

ভ্রমর-সঙ্গীত কহে যদুনাথ দাস।

ঐ, ১৩ পৃঃ

ইহার অনুবাদে যদুনন্দন লিখিয়াছেন—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গঢ়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি॥ ধ্রু॥
আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাঢ়ায় কানে
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে হয় তবে নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু আঁখর দেখি যুড়ায় তপত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণ-রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়।
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম উনমাদ॥
যে কানে পয়শে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সবভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্যস্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যদুনন্দন দাস কয়॥

বিদগ্ধমাধব, ৩০ পৃঃ

যদুনন্দনের কর্ণানন্দ এবং জগন্নাথবল্লভ নাটকের ভাবানুবাদ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে।

ইহা ব্যতীত যদুনন্দন কৃষ্ণকর্ণামৃতেরও ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত এই গ্রন্থের একখানি অনুলিপি হইতে ইহার প্রারম্ভভাগের কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর।
যাহা আস্বাদিল প্রভু শচীর কোঙর॥
রায় রামানন্দের সনে বিদ্যানগরে।
আস্বাদিলা কর্ণামৃত অতি মনোহরে॥
শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর।
সাম্যক জানিয়ে ভাব যাহার সুধীর॥
আদ্যোপান্ত কৃষ্ণকেলী মাধুরী বর্ষয়।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য রসে সর্ব্ব রসময়॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাবে মগ্ন হইআ।
টীকা লিখিলেন অতি সুন্দর করিআ॥
আমি ক্ষুদ্রমতি তার কিবা অর্থজানি।
তাহাই লিখি যে সাধু মুখে যেই শুনি॥

ক: বি: ১১০৮ সং পুথির প্রারম্ভ

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যের নবম পরিচ্ছেদে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্বা তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহাঁ দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকলে পঢ়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥

কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়া নিল॥

তৎপর রামানন্দের সহিত দেখা হইলে তিনি তাঁহাকে

কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুথি দিলা॥
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥
রামের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল—রাখিল লিখিয়া॥

কৃষ্ণদাস কৃত টীকা অবলম্বনে যদুনন্দন এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কবির পরিচয়:—গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবানন্দ, এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। তাঁহার পিতা অতিশয় গুণবান্ এবং বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ের আধার ছিলেন। জাহ্নবীর পশ্চিম কূলে তাঁহাদের বাস ছিল, এবং কবি "আচার্য্য গোসাঞির" নিকট ভৃত্যের কার্য্য করিতেন, যথা—

আপনার কথা কিছু করি নিবেদন।
নির্লজ্জ হইঞা কহি শুন শ্রোতাগণ॥
মাতা অতি পতিব্রতা পদ্মাবতী নাম।
পিতা সে যাদবানন্দ অতি গুণবান॥
তর্ক বর্ক পিতা মোর কিছুই না জানে।
সভাকে উত্তম জ্ঞানে দাস-অভিমানে॥

জাহ্নবী পশ্চিম-কুলে বসতি আমার।
বর্ণিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব নহে অধিকার॥
আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্যকার্য্য।
দেখিয়া করিল দয়া মাধব-আচার্য্য॥

পরিষদ সং, ৩৮৫ পৃঃ।

এই আচার্য্য গোসাঞি কে ছিলেন, তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে অনন্ত আচার্য্য, চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভৃতি চৈতন্য-ভক্তগণের সন্ধান পাওয়া যায়, আবার শ্রীনিবাসেরও আচার্য্য উপাধি ছিল। নরোত্তম-বিলাসের ষষ্ঠ সর্গে খেতুরীর উৎসব বর্ণনায় শ্রীনিবাসকে "আচার্য্য গোসাঞি" রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কাহাকে কবি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও নির্ণয় করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—

আমার প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।
দীক্ষা মন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণ ধরি॥

ঐ, ৩৮৪ পৃঃ

জাহ্নবী দেবীকেও ঈশ্বরী বলা হইত, আবার প্রেমবিলাসেও অন্য এক ঈশ্বরীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর স্ত্রী দ্রৌপদী দেবী, যথা—

শ্রীনিবাস আচার্য্য নিজ পত্নী দুইজনে।
দীক্ষামন্ত্র দিলা অতি আনন্দিত মনে॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পত্নীর দ্রৌপদী নাম ছিলা।
পরে তিঁহ ঈশ্বরী নামেতে ব্যক্ত হৈলা॥

বহরমপুর (২য়) সং, ৩৪৭ পৃঃ

আচার্য্য গোসাঞির, এবং গঙ্গার পশ্চিম কূলে বসতির উল্লেখ থাকাতে দ্রৌপদী দেবীর নিকটেই যে কবি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই

সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই গ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থে চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ থাকাতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

কবি স্বপ্নে আদেশ লাভ করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—

মোর কণ্ঠে ভর করি কহাও আপুনি।
কিবা লেখি কিবা পড়ি কিছুই না জানি॥
একদিন স্বপনে আসি দিলা দরশন।
সেহিত ভরসা মনে করিএ লিখন॥
আদ্যন্ত সংক্ষেপ করি যতনে লিখিল।

পরিষৎ সং, ৩৮৫ পৃঃ

গ্রন্থশেষে কবি বর্ণিত বিষয়ের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, তিনি দশম স্কন্ধের কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ স্কন্ধের যদুবংশ-ধ্বংস, এবং দ্বাদশ স্কন্ধের পরীক্ষিতের স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত ভাগবতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি লিখিয়াছেন—

ইহারে বলিএ ভাই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
সেই সে বুঝএ জার অন্তর নির্ম্মল॥

ঐ, ৩৯১ পৃঃ।

কিন্তু ইহাতে দান খণ্ড ও নৌকাখণ্ডের আখ্যায়িকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—

তবেত কহিল আর দাননৌকাখণ্ড।
শুনিতে শ্রবণ সুখ অমৃতের খণ্ড॥

ঐ, ৩৮৯ পৃঃ

কিন্তু কবির উক্তি হইতেই জানা যায় যে, তিনি সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার গ্রন্থই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মনে ভয় ছিল যে, মাধবাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থরচনার বিষয় জানিতে পারিলে অনিষ্টের সূত্রপাত হইতে পারে। কিন্তু মাধবাচার্য্য এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া ইহা "দক্ষিণে" প্রচারিত হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—

পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞি।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে যাই॥
লিখিতে না পাই মন সদাই তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্য দেখিয়া গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাইঞা গান শুনি অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এখাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥

ঐ, ৬ পৃঃ

কবি মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে "কৃষ্ণদাস" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য॥
না পড়িল না শুনিল হিয়া পরকাশ।
বুঝিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণদাস॥

ঐ, ৩৮৫ পৃঃ

গ্রন্থ-পরিচয়ঃ—গণেশাদি দেবতার বন্দনার পরে কবি পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের উল্লেখ করিয়া ভাগবত-কথনের ভিত্তি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। ভাগবতেও এইভাবে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। তারপর কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দশমস্কন্ধ-বর্ণিত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে অথচ সরস ভাষায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে

কবি অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কবি পড়াশুনা করেন নাই, বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত ইহা বলিলেও মূল ভাগবতের সহিত যে তাঁহার পরিচয় ছিল তাহা গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল তিনি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের রচনা সরল ও মধুর, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশে তিনি ইহা আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। মাধবাচার্য্য যে ইহা পাঠ করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন, ইহা কবির অহেতুক আত্মশ্লাঘা নহে। দানলীলার প্রারম্ভে গোপীগণ যেভাবে সাজসজ্জা করিয়া মথুরায় পসরা লইয়া যাইতেছেন, তাহার বর্ণনায় তরল পয়ার ছন্দে কবি লিখিয়াছেন—

এত বলি সভে মেলি করিয়া সুবেশ।
মণিজাদে খোঁপা বাঁধে আচরিঞা কেশ॥
ফুল গাঁথি দিল তথি কবরী বেড়িয়া।
তাহে অলি করে কেলি পড়িছে ঘুড়িয়া॥
নাসাগতি গজমতি শ্রবণে কুণ্ডল।
মৃদুহাসি মুখশশী করে ঝলমল॥
ইন্দুমাঝে ভাল সাজে কজ্জলের রেখা।
মেঘ-আড়ে বিধুবরে আধ দিছে দেখা॥
মণিহার ভুজে তাড় অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
কমলিনী সুবলিনী মন লয় চুরি॥
কটি বেড়ি নীল শাড়ী চরণে নূপুর।
জিনি মতি দন্ত পাঁতি কপালে সিন্দুর॥

পরিষৎ সং, ১৩৮ পৃঃ।

এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনায় কবি এক নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন।

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অন্ত নহি কিছু কহি হরিবংশ-মতে॥

ঐ, ১৩৭ পৃঃ

অন্যত্র—

আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড।
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড॥
হরিবংশে লিখিয়াছে করিঞা বিস্তার।

ঐ, ১৫০ পৃঃ

অথচ হরিবংশে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত কবি সংক্ষেপে রাধাকর্তৃক কৃষ্ণের বংশী চুরি (ঐ, ১৪৪ পৃঃ) এবং কৃষ্ণকর্তৃক রাধার ভারবহন (ঐ, ১৫১ পৃঃ) লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে এই সকল আখ্যায়িকা বিশেষ প্রচলিত ছিল। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলেও দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কোন নজির দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। ভাগবত-বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণদাস ভাগবত-বহির্ভূত লীলার আদর্শস্বরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হরিবংশের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভবানন্দের হরিবংশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেও এইরূপ উক্তি রহিয়াছে, যথা—

সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ।
সঙ্ক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বলে দীন ভবানন্দে॥

ঐ, ২২ পৃঃ

অথচ প্রচলিত হরিবংশে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকে পাইবার জন্য বড়াইর সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু এখানে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য গোপীগণ পরামর্শ করিয়া বড়াইর সহিত মথুরায় যাইতেছেন। চৈতন্য—পরবর্ত্তী কালে প্রচারিত গোপীপ্রেমের আদর্শে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। (তুঃ—প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলী)। কবি ব্রজবুলীতেও পদ রচনা করিয়া গ্রন্থে মাধুর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন। "বারমাসিঞা" হইতে এখানে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

শ্রাবণ ভেল পরবেশ।
জর জর পাঁজর শেষ ॥
সঘনে বরিখত মেহ।
কামে ঝাঁপি উঠে দেহ ॥
ভাদরে নাগর ভোর।
অব শূন্য মন্দির মোর ॥
ঘন ঘন বিজুক মালা।
কো সহে বিরহক জ্বালা ॥
আশ্বিন ভেল পরবেশ।
অবহু রহল দূরদেশ ॥
প্রিয়াকো দরশন লাগি।
ই দিন যামিনী জাগি ॥
আয়ত কাত্তিক মাস।
কেলি করব ইহ রাস ॥
কহতহু কিসোন দাস।
অব সব দূরে গেয় আশ ॥

ঐ, ২৩২ পৃঃ

কবিশেখরের গোপালবিজয়

কবির পরিচয় :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় গোপালবিজয়ের অনেকগুলি পুথি সংগৃহীত রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৯৬০, ৯৬১ ও ৯৬৩ সংখ্যক তিনখানি পুথিই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এবং ৯৬০ সংখ্যক পুথিতে সমগ্র গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যাইতেছে। আবার ৯৬৩ সংখ্যক পুথিখানি যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী অংশ সাহিত্য-পরিষদের ১২৯০ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুথি অবলম্বনে এই আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল।

গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হারাবতী। কবি বলিয়াছেন যে, গোপালবিজয় রচনার পূর্ব্বে তিনি গোপালচরিত মহাকাব্য, গোপালের কীর্ত্তনামৃত, এবং গোপীনাথবিজয় নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত।
তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তনামৃত ॥
গোপীনাথবিজয় নাটক কৈল আর।
তবু গোপবেশে মন না পুরে আমার ॥
তবেই পাঁচালি করি গোপালবিজয়ে।
বৈষ্ণব জনের রেণু ধরিয়া হৃদয়ে ॥
সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন ॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হারাবতি।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি ॥

৯৬৩ সং পুথি, ২ পত্র

অতএব ইহাও জানা যাইতেছে যে, কবির নাম দৈবকীনন্দন সিংহ, এবং উপাধি কবিশেখর। পদকল্পতরুর (পরিষৎ সং) এবং গৌরপদতরঙ্গিণীর (২য় সং) ভূমিকায় দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর রচয়িতা এক রায়শেখর বা কবিশেখর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে সাধারণতঃ তাঁহার "শেখর" "রায় শেখর" "শেখর রায়" জাতীয় ভণিতাই দৃষ্ট হয়। ইহাই লক্ষ্য করিয়া সতীশ রায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবির পূর্ণ নাম সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর ছিল। (তরুর ভূমিকা ২:৯ পৃঃ)। ইহার সহিত দৈবকীনন্দন নামের সাদৃশ্য নাই। একখানি শাখানির্ণয় গ্রন্থেও এই কবির সম্বন্ধে লিখিত আছে—

তত: সদ্‌গুণযুক্তঃ শ্রীকবিশেখর রায়কঃ।
চিত্রাণি গীতপদ্যানি গীয়ন্তে যস্য সঙ্গনৈঃ॥

প্রদীপ, ১৩১২, ৫৬ পৃঃ

ইহাতেও কবির "সিংহ" পদবীর উল্লেখ নাই। এই জন্য বোধ হয়, দৈবকীনন্দন সিংহ, ও রঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর বা শেখর রায় পৃথক্ ব্যক্তি।

দ্বিতীয়তঃ রায়শেখরের পদাবলীতে চৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরগণের সহিত রঘুনন্দনেরও বন্দনা পাওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তনামৃতের পরে রচিত হইলেও গোপালবিজয়ে ইঁহাদের কাহারও উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা কবির চতুর্থ গ্রন্থ হইলে তিনি যে অধিক বয়সে ইহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। তখনও যে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। ব্যাসদেব অন্যান্য পুরাণ রচনা করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া যেমন ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, কবি প্রায় সেইভাবেই গোপাল-বিজয় রচনার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব রঘুনন্দনের শিষ্য হইলে কবি এই গ্রন্থে নিজের গুরুর সম্বন্ধে কিছু বলিতেন ইহা আশা করা যাইতে

পারে। প্রকৃতপক্ষে রায় শেখর হইতে তিনি পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থে রঘুনন্দনাদির উল্লেখ করেন নাই।

পদকল্পতরুতে শেখর ভণিতার ৯৮টি, এবং রায় শেখর ভণিতার ৩৫টি পদ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত কবিশেখর ভণিতার পদের সংখ্যা ৪২। তন্মধ্যে গৌরলীলার পদও রহিয়াছে। কবিশেখর বলিয়াছেন যে, তিনি গোপালের কীর্ত্তনামৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত কবিশেখর ভণিতার পদগুলির মধ্যে গৌরলীলা বিষয়ক যে সকল পদ রহিয়াছে তাহা রায়শেখরের রচিত বলিয়াই বোধ হয়। অবশিষ্ট-পদগুলির মধ্যে যে দুই কবির রচনাই মিশিয়া গিয়াছে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই কবির রচিত গোপালের কীর্ত্তনামৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু যে গ্রন্থ দণ্ডাত্মিকা পদাবলী নামে প্রচারিত রহিয়াছে তাহাকে "কীর্ত্তনামৃতের" সহিত অভিন্ন কল্পনা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না, কারণ পূর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, কবি গ্রন্থের নাম ধরিয়াই তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—যথা—গোপাল-চরিত নামে মহাকাব্য, গোপীনাথ-বিজয় নামে নাটক, এবং গোপাল-বিজয় নামে পাঁচালী। এই অবস্থায় কীর্ত্তনামৃতই যে গ্রন্থের নাম ছিল তাহা ধারণা করা করা যাইতে পারে। কবির অন্যান্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি গোপাল-বিজয়ে তাহাদের উল্লেখ হইতে মনে হয়, ঐ সকল গ্রন্থ কীর্ত্তনামৃত এবং গোপালবিজয়ের ন্যায় হয়ত বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল, নতুবা কবি তাহার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া যাইতেন। তাহা হইলে এই মহাকাব্য এবং নাটক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে সুপ্রাচীন বলা যাইতে পারে। শেখর রায় যে পদাবলী-কাব্যনাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই। আবার চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে নরহরি, মুকুন্দ ও রঘুনন্দনের সহিত চৈতন্য দেবের যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা পাঠ

করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, রঘুনন্দনের ভক্তির খ্যাতি তখনই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী ছয় বৎসরের লীলা মধ্যলীলা রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া (মধ্যের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বলা যাইতে পারে যে, এই ঘটনার প্রায় ২০ বৎসর পরে চৈতন্যদেব অপ্রকট হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময়ে রঘুনন্দন বয়সে প্রবীণ এবং দীক্ষা দানেরও উপযুক্ত ছিলেন ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। রায়শেখর তখন তাঁহার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। তারপর ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত খেতুরীর উৎসবে রঘুনন্দনের সহিত রায় শেখরের নামের উল্লেখ হয় নাই বলিয়া সতীশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব্বেই রায় শেখর অপ্রকট হইয়াছিলেন। (তরুর ভূমিকা, ২১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব রায়শেখর ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা বলা যাইতে পারে[১]। অপরপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০ সংখ্যক পুথির শেষ ভাগে "শাকে গজাব্ধি শর চন্দ্র মিতে" ইত্যাদি, অর্থাৎ ১৫৪৮ শক বা ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত আছে। ইহা সম্ভবতঃ গ্রন্থ রচনার তারিখ। তাহা হইলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবির বর্ত্তমানতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ঐ অনুলিপির তারিখ ধরিয়া লইলেও একমাত্র ইহারই বলে কবিশেখরকে ইহার প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া রায়শেখরের সমকালবর্ত্তী কল্পনা করা যেন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আবার একই সময়ে দুইজন কবি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদ্বারা তাঁহাদের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা কবিশেখরকে রায় শেখর হইতে স্বতন্ত্র কবি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছি। তিনি বোধ হয় রায় শেখরের পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবির ভণিতা :—

১। শৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত মহাশয় ১৩১২ সালের "প্রদীপে" লিখিয়াছেন—
"রায়শেখর সম্ভবতঃ ১৫৫০ হইতে ১৬০০ খ্রীঃ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন"
(ঐ, ৫৭ পৃঃ)।

গোবিন্দবিজয়ের সর্ব্বত্রই কবিশেখর ভণিতা পাওয়া যায়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬১ সংখ্যক পুথির ৮৫ পত্রে একটি মাত্র রায়শেখর ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, যথা—

মন্দ সুবর্ণে কভু যোউ (জ্যোতি) নাহি রহে।
রায়শেখর তাহা দেখিল (?) কথা কহে॥

দৈবকীনন্দন সিংহের কবিশেখর উপাধি ছিল, ইহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। অতএব গ্রন্থের সর্ব্বত্র নিজেকে কবিশেখর রূপে উল্লেখ করার পরে যে একটি ভণিতায় তিনি "রায়শেখর" লিখিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহার পক্ষে রায়শেখর ভণিতাও অর্থহীন হইয়া পড়ে। অতএব ইহা পরবর্ত্তী সংযোজনা মাত্র। অপর পক্ষে দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে "শেখর", "রায়শেখর" "শেখররায়" ভণিতাই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য করিয়া সতীশ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এই কবির ব্যক্তিগত নামের মধ্যে "শেখর" শব্দ ছিল, অর্থাৎ ইহা চন্দ্রশেখর বা শশি-শেখরের মত কিছু হইবে। ইহাতে যে "কহে কবিশেখররায়" যাতীয় ভণিতা মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে "কবি" শব্দটি শেখর রায়ের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "কবি শেখররায়" রূপে পাঠ করাতেই দুই কবির অভিন্নত্বের ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কবিশেখরের পক্ষে শুধু "শেখর" ভণিতাও সম্পূর্ণই অর্থহীন। তথাপি গোপালবিজয়ের কোন স্থানে—

শেখর যে কহে গোপালবিজয়ে
শুনিতে আতি রসাল।[১]

১। ডাঃ সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে" এই ভণিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তিনি কোন্ পুথিতে ইহা পাইয়াছেন তাহার নির্দ্দেশ দেন নাই। আমরাও ইহার সন্ধান পাই নাই। দৈবকীনন্দন সিংহ কবিশেখরের পক্ষে শুধু শেখর ভণিতা সম্পূর্ণই অর্থহীন।

এইরূপ একটি ভণিতা যদি থাকিয়া থাকে, তাহা যে ছন্দ-রক্ষার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ইহাও লিপিকর-প্রমাদের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থ পরিচয়:—জগবন্ধু বাবু গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, ১৭০১ শকের লেখা গোবিন্দবিজয়ের একখানা হস্তলিখিত পুথি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রায় ২৫০০ শ্লোক ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬১ সং পুথিখানি খণ্ডিত হইলেও ইহার ১১২ পত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অতএব গ্রন্থখানি যে বৃহৎ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দেবতার বন্দনার পরে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধবসংবাদে এই খণ্ডিত গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১২৯০ সংখ্যক পুথি হইতে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। তাহাতে কংসবধের পর উগ্রসেনের অভিষেক, নন্দের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন, গোপীগণের বিলাপ, মথুরায় দূতী-প্রেরণ, উদ্ধবসংবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন ও গোপীগণের সহিত মিলনের পরেই গ্রন্থ-সমাপ্তির উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

হেন মতে সব সখী নাগরের সঙ্গে।
নাগর শেখর বঞ্চে কৃষ্ণ নানা রঙ্গে॥

* * *

কেবল আনন্দময় গোপী অবতার।
কেবল সে রসময় নন্দের কুমার॥
তাহে সব একু ঠাই বিধির ঘটনে।
হেন রস সুখময় দেখ সর্ব্ব জনে॥
বৃন্দাবনে ভরি সব রসের বাদলে
তাহে প্রেমতরঙ্গ অধিক উথলে॥

ইহার পরেই

গোপালবিজয় সাঙ্গ গোপাল-লহরি।
আনন্দে সকল লোক বল হরি হরি॥
কবিশেখরে কহে হরি বিনু নাই গতি।
ইহলোকে নানা সুখ পরতে মুকতি॥
ঐ, ২২ পত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০ সংখ্যক পুথিতেও গ্রন্থ এই ভাবে শেষ হইয়াছে। ইহাতে দান ও নৌকালীলা বিস্তৃত ভাবে বর্নিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাধা মদন-পূজা করিতে যাইতে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হয়। অবশেষে বড়ায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি দানলীলার অনুষ্ঠান করেন।

গ্রন্থকার শক্তিশালী কবি ছিলেন। তাঁহার "কবিশেখর" উপাধি অপাত্রে অর্পিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার রচনার নমুনা স্বরূপ এখানে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

শিখণ্ড মণ্ডল উড়ে চূড়ার উপরে।
ইন্দ্রধনু উঠে যেন নব জলধরে॥
ললাটে চন্দন রেখা অতি সে উজলী।
নব জলধরে যেন ধবল বিজুলী॥
অঞ্জনে রঞ্জিত আখি দেখি মনোহরে।
মধুলোভে কমল বেড়িল মধুকরে॥
৯৬১ সং পুথি, ৩৭ পত্র

অথবা—

আগু সে বড়াই পাছে সব গোপনারী।
নদী মাঝে জাএ জেন হংস সারি সারি॥
ঐ, ৪৮ পত্র

এবং—

একে সে সোনার বাঁশি তাহে ইন্দ্রনীলে।
ভ্রমরে বেড়িল জেন চম্পকের মালে॥

ঐ, ৬২ পত্র

কবি এই রূপেই উৎপ্রেক্ষা-উপমার মালা গাঁথিয়া স্বীয় নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বস্তুতঃ যাবতীয় কৃষ্ণমঙ্গলের মধ্যে ইহা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

কবির পরিচয়ঃ—এই কৃষ্ণদাস মহাভারতের অনুবাদক বিখ্যাত কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর। গোপালদাস নামক একজন ব্রহ্মচারী কবিকে দীক্ষা দান করিয়া কৃষ্ণকিঙ্কর নাম প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসের ভণিতায় কবি নিজেকে কৃষ্ণকিঙ্কর নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। গুরু তাঁহাকে শ্রীনন্দনন্দন-ভজনার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণবিলাস রচিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণকুমার গুরু অতি দয়াবান্।
কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোরে কৈল পরিত্রাণ॥
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুয়া।
আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিয়া॥
সে গুরু-কৃপাতে দূর করি মহাদম্ভ।
অনুভবি হরিকথা করিল আরম্ভ॥

পরিষৎ সং, ১ পৃঃ।

কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস জগন্নাথ-মঙ্গলে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কাশীরাম মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণবিলাসও প্রায় সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। কবির সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় কাশীরাম দাস সম্বন্ধীয় আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের পরিচয় :—কাশীরামের ভ্রাতার রচিত বলিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিতে আমাদের ঔৎসুক্যের উদয় হয় বটে, কিন্তু কবির রচনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয় নাই। গ্রন্থ-রচনায় কবি একমাত্র পয়ার ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। আখ্যায়িকাগুলি অতি সাধারণভাবে বর্ণিত হওয়াতে পাঠ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলেও দুই এক স্থলে রচনার কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বিবাহের সময়ে দৈবকীর সাজসজ্জা-বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

বাহুতে দুমুটি শঙ্খ অতি বিলক্ষণ।
তাহার উপরে শোভে সোণার কঙ্কণ॥
তাহার উপরে টাড় মাণিকে খেচনি।
কটিতে ঘুঙ্ঘুর বাজে ঝুন ঝুন শুনি॥
মকর কুণ্ডল দুই শ্রবণে হিন্দোলে।
দশনে মুকুতা-পাঁতি অতি মৃদু বলে॥
মুকুতা প্রবাল গলে ঝলমল করে।
সুবর্ণ বাউলী শোভে কর্ণের উপরে॥
নাসাহলে গজমতি শুদ্ধ মণিময়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হইল উদয়॥

পরিষৎ সং, ১২ পৃঃ

কবি দান-নৌকালীলা প্রভৃতি বর্ণনা করেন নাই। একখানি খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দশম স্কন্ধের ৬৩ম অধ্যায়ে বর্ণিত উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিজ হরিদাসের মুকুন্দমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ

কবির পরিচয় ভদ্ররচিত অশ্বমেধপর্ব্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, চৈতন্যশিষ্য দ্বিজ হরিদাসই মুকুন্দ-মঙ্গলাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০৫ সংখ্যক পুথি হইতে মুকুন্দমঙ্গলের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

বন্দনাংশে কবি লিখিয়াছেন—

ভাগবত দশম স্কন্ধের পদ্যাবলী।
ভাষায় লিখিতে বড় করিয়ে বিকলী॥
আপনে রচিয়া শ্যাম করাহ লিখন।
তুমি মোর ধনপ্রাণ তুমি যে কারণ॥

কঃ বিঃ ১০০৫ সং পুথি, ১ পত্র

তৎপর—

নবম স্কন্ধের কথা কহিলেন মুনি।
হৃষ্ট হৈয়া শুনিলেন রাজা-শিরোমণি॥
ভকতের অগ্রগণ্য রাজা পরীক্ষিত।
শুকে প্রশ্ন করিলেন কৃষ্ণের চরিত॥
অবধান কর গোসাঞি ব্যাসের নন্দন।
কৃষ্ণকথা সুধা বর্ষে তোমার বদন॥
ব্রহ্মসাপ হৈল মোরে পরম দুর্ব্বার।
কিঙ্কর করিয়া মোরে কর অঙ্গীকার॥

এই ভাবে প্রস্তাবনার পরে দশম স্কন্ধের ঘটনা অবলম্বনে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। বসুমতী ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দেবগণ সহ বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন, এবং বিষ্ণু কংসবধের

জন্ম অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হইলেন। পরে বসুদেব ও দৈবকীর বিবাহ। কংস রথের সারথী হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে—

দড়া ধরি যায় কংস হরষিত হয়া।
আকাশে হইল বাণী আনন্দ দেখিয়া॥
যার দড়া ধরি যাসি হরিস অন্তরে।
উহার অষ্টম গর্ভে হানিবেক তোরে॥

ঐ, ৫ পত্র

বসুদেবের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাকে কংসের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন কংস—

তুষ্ট মন হয়া রাজা কহিছেন সরস॥
এ বালক লয়া যাও আপনার ঘরে।
অষ্টম গর্ভের পুত্র আনি দিবে মোরে॥

ঐ, ৬ পত্র

তৎপর নারদের মুখে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী শুনিয়া কংস বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহার পরে কবি কৃষ্ণের জন্ম, পূতনা, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতির নিধন, এবং কৃষ্ণের অন্যান্য বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে কালিয়দমনে এই খণ্ডিত গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। যথা—

আজ্ঞা মাগি প্রদক্ষিণ কৈল বারবার।
সমুদ্রেতে গেলা লয়া সব পরিবার॥
ঘুচিল বিষের জ্বালা, অতি সুবিমল।
সেই হইতে অমৃত সমান হৈল জল॥
ষোড়শ অধ্যায় দশমের হৈল সায়।
লিখিল তা হরিদাস প্রাকৃত ভাষায়॥

ঐ, ৬০ পৃঃ

ভাগবতেও দশমের ষোড়শ অধ্যায়ে কালিয়-দমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি সম্পূর্ণরূপে ভাগবত অনুসরণ করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ ৯০ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র ১৬ অধ্যায়ের বিবরণ আমরা পাইতেছি। অতএব গ্রন্থখানি যে অতি বৃহৎ ছিল তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। অন্যান্য কবি নানা স্থান হইতে বিবিধ আখ্যায়িকা আনিয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কিন্তু হরিদাসের গ্রন্থে ইহা লক্ষিত হয় না। এই জন্যই পরে তিনি "কৃষ্ণচরিত্র" রচনা করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে ইহাকে দশম স্কন্ধের সরল অনুবাদরূপে প্রকাশিত করা যাইতে পারে।

২। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। সহজ ভাষায় কবি কৃষ্ণের বিবিধ নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে। শিশুকালে প্রতিদিন প্রাতে পিতামহীর মুখে

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর॥

ইত্যাদি ক্রমে সমগ্র স্তোত্রটির আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে ইহা আমাদেরও মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। এখনও অনেকে ভক্তির সহিত ইহা পাঠ করিয়া থাকেন।

৩। পদকল্পতরুতে হরিদাসের ৬টি মাত্র পদ সংগৃহীত রহিয়াছে।

কবি ব্রজবুলীতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

দুতিমুখে শুনইতে ঐছন রীত।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত॥

কহইতে গদগদ কণ্ঠহি বোল।
সখি-মুখ নিরখই অন্তর দোল।। ইত্যাদি—

তরু, ১২৯ সং পদ

"নাচিতে না জানিতমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি" ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে হরিদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। তাঁহার জীবনের ঘটনার সহিত পদ-বর্ণিত বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হয় হরিদাসই এই পদের রচয়িতা। কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তনের সহিত পরমানন্দের ভণিতায় জগদ্বন্ধু বাবু কর্ত্তৃক গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। অশ্বমেধ পর্ব্বের বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল

কবির পরিচয়:—দুঃখী শ্যামদাসের বিস্তৃত জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি তাঁহার মাতাপিতার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

শ্রীমুখ জনম দাতা সুমতি ভবানী মাতা
যাঁর পুণ্যে নিরমিল তনু।
দুর্লভ জগত-রঙ্গ দেখি শুনি সাধু সঙ্গ
শিরে বন্দোঁ পিতৃ পদ-রেণু॥

বঙ্গবাসী সং, ২ পৃঃ।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এখানে কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল—

"মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে-বংশীয়

কায়স্থ। তিনি স্বয়ং তাঁহার রচিত এই গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ গান করিয়া এবং পাঠ করিয়া লোককে শুনাইতেন। তিনি তৎকালিক মেদিনীপুরের রাজাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় কতক ভূমি বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথকতার জন্য তাঁহার ভক্তেরও অভাব হয় নাই। তিনি অনেকের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বংশধরেরা ঐ সকল শিষ্যবংশের লোকদিগের গুরুর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এখন তাঁহারা "অধিকারী" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।"

কবির সময়ঃ—দশশালা বন্দোবস্তের সময় কবির বংশীয় দ্বারকানাথ অধিকারী এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে দুঃখী শ্যামদাসের বৃত্তিপ্রাপ্ত ভূমিগুলিকে দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে গণ্য করা হইয়াছিল। এই সনন্দের তারিখ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহাতে লেখা আছে যে, "দেওয়ানীর পূর্ব্ব হইতেই" ঐ সকল জমি কবির উত্তরাধিকারিগণের দখলে ছিল। গোবিন্দ-মঙ্গলের ভূমিকায় কবির বংশলতার যে সন্ধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী কবির অধস্তন চতুর্থ কি পঞ্চম বংশধর। অতএব প্রায় ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

কবির ভণিতাঃ—কবি প্রায় সর্ব্বত্রই নিজেকে "দুঃখী শ্যাম" বা "দুখী শ্যামদাস" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

গোবিন্দমঙ্গল দুঃখী শ্যামদাস ভণে।

বঙ্গবাসী সং, ১০৭ পৃঃ।

অথবা—কান্দে রাধা বিনোদিনী দুঃখী শ্যাম গান।

ঐ, ৯৭ পৃঃ।

ইহা ব্যতীত তিনি পিতা মাতার নাম উল্লেখ করিয়াও যে ভণিতা দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

গ্রন্থের পরিচয় :—গোবিন্দমঙ্গল প্রধানতঃ ভাগবতের দশম্‌স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত হইলেও ইহার প্রথম এবং শেষভাগে অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও রচনার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। পরীক্ষিতের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মনারদ সংবাদ" "জয়বিজয়ের ব্রহ্মশাপ" পর্য্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম ১৭ পৃষ্ঠার আখ্যায়িকা ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর শেষভাগের "যদুবংশ ধ্বংস" ও "পরীক্ষিতের বৈকুণ্ঠ-গমন" প্রভৃতি একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ হইতে সংগৃহীত। ইহা ব্যতীত "গোলোকে রাধা কৃষ্ণের নিত্যবিহার" বর্ণনায় ব্রাহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডে কবি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে অনুসরণ করিয়াছেন।

কবির কবিত্ব :—গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ "বন্দনা"-ভাগে কবি বিনয়ের সহিত লিখিয়াছেন—

ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ না পাইল অন্ত
অগোচর গোবিন্দের লীলা।
গোবিন্দমঙ্গল কহি ভুবনে দুর্ল্লভ এহি
ভবসিন্ধু তরিবার ভেলা॥
গগনে গরুড় গতি তা দেখি বায়স মতি
মন করে উড়িবার তরে।
কেশরী পশ্চাৎ যেন মৃগ ধেয়ে আসে তেন
দুঃখী শ্যাম বৈষ্ণব গোচরে॥ ঐ, ২ পৃঃ

রাসলীলা প্রসঙ্গে—

নটবর বেশে মনের হরিষে
কেলি কদম্বের তলে।
ভুবন-মোহন নন্দের নন্দন
তপন-তনয়া মূলে॥

শুন মহীপতি কৃষ্ণের আরতি
মধুর মূরতি কানু।
সুদীর্ঘ কেশর চারু পীতাম্বর
রতিপতি মোহে তনু॥ ইত্যাদি

ঐ, ১০৪ পৃঃ

এই রচনা যে সরল ও সুন্দর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসের বর্ণনায় কবি প্রথমে ভাগবতই অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণের বংশীবাদন, গোপীগণের আগমন, তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন ও উপদেশ, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপীগণের খেদ ও প্রেমগর্ব্বিতার গর্ব্বভঙ্গ প্রভৃতি বর্ণনার পরে প্রচলিত কৃষ্ণলীলার অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের মিলন সংসাধিত করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি মূল গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন। কবির রচিত দানলীলার আখ্যায়িকা সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অভিরাম দত্ত বা দাসের
গোবিন্দ-বিজয় বা শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল

গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু তিনি গোবিন্দমঙ্গল রচয়িতা কবিচন্দ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কারণ উক্ত গ্রন্থে অভিরাম-বর্ণিত রাসলীলার অনেক অংশ কবির ভণিতা সহ উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব অভিরাম যে অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। কবিচন্দ্রের সময়ে এই গ্রন্থের বিশেষ খ্যাতি না থাকিলে তিনি ইহা হইতে পদ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিজের গ্রন্থের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেন না।

কবির ভণিতা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি দত্ত-বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, যথা—

গোবিন্দ-বিজয় গায় অভিরাম দত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত হইল সমাপ্ত ॥

ক: বি: ১৭৫৭ সং পুথি, ২০০ পত্র

অন্যত্র—

অনুব্রজে কতদূর আইলা বৈবস্বত।
গোবিন্দ-বিজয় গায় অভিরাম দত্ত ॥

সাহিত্য-পরিষদের ১২১৪ সং পুথি, ১৬৭ পৃ:

আবার কবি "দাস" আখ্যা গ্রহণ করিয়াও ভণিতা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

গোবিন্দ-পদারবিন্দ মকরন্দ আশে।
লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভাসে ॥

ক: বি: ৯৪৫ সং পুথি, ৮২ পত্র

এবং—

অধম মুরুখ বড় অভিরাম দাস।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ নিতে মনে বড় আশ ॥

ঐ, ২ পৃ:

অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, কবির কুলোপাধি ছিল "দত্ত", কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত তিনি "দাস" আখ্যায়ও নিজেকে প্রচার করিয়াছেন।

গ্রন্থের পরিচয়:—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আখ্যায়িকা লইয়া এই গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিলে অশ্বত্থামা তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে দুর্য্যোধন তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিলে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বধের প্রতিজ্ঞা করেন। ইঁহাদের বধের পরে অর্জ্জুনের

সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে উত্তরার গর্ভপাত বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে কৃষ্ণের দ্বারকায় গমন, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, পরীক্ষিতের জন্ম, তৎকর্ত্তৃক কলি-নিগ্রহ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও প্রায়োপবেশন, এবং শুকদেবের নিকট ভাগবত শ্রবণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ অনুসরণ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর দশম স্কন্ধের কৃষ্ণ-জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মণিহরণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৫৭ সং পুথিতে ইহার পরেই লিখিত আছে[১]—

গোবিন্দ-বিজয় গায় অভিরাম দত্ত।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল-গীত হইল সমাপ্ত ॥

ঐ, ২০০ পত্র

অভিরাম দানলীলা ও নৌকালীলা বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু রাসের পরে জলকেলীতে বংশীচুরির একটু আখ্যায়িকা রহিয়াছে। জলবিহারের সময়ে কৃষ্ণের বংশী অপহৃত হইয়াছিল, কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও ইহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। তখন সকল গোপীকে তীরে উঠিতে বলা হইল। অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া যমুনার জলেই তিনি বংশী প্রাপ্ত হইলেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের দুইখানি বড় পুথি আছে। তন্মধ্যে ১৭৫৭ সং পুথি ২০০ পত্রে শেষ হইয়াছে, কিন্তু ৯৪৫ সং পুথিখানি ২০০ পত্রের পরেই খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে। ইহার শেষ পত্রেও মনিহরণের আখ্যায়িকা আছে বলিয়া মনে হয়, আর দুই এক পত্রেই এই পুথি শেষ হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের ১২১৪ সংখ্যক পুথিতেও এই গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া যায়, ইহা ৩১৮ পত্রে শেষ হইয়াছে। কিন্তু ২২৪ পত্রের পরে গুণরাজখানের রচনা এই পুথিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লিপিকার লিখিয়াছেন—"অভিরামের কৃত কথক পুস্তক ছিল, তাহা সমাপ্ত পাইলাম না। অতএব গুণরাজ খানের কৃত পুস্তক লইঞা শেষে সাঙ্গ করিলাম। ইহাতে কেহ দোষ লইবেন না।" এই ভাবেই এক কবির গ্রন্থে অপর কবির রচনা স্থান লাভ করে।

এক সময়ে এই গ্রন্থের বিশেষ প্রচার ছিল বলিয়া বোধ হয়, কারণ কবিচন্দ্রও ইহার অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কবির রচনার নমুনা স্বরূপ তাহা হইলে এখানে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল—

ত্রৈলোক্যমোহন শুনি মুরলীর গীত।
ধ্বনিমাত্র নিল হরি ব্রজাঙ্গনা চিত ॥
সময় পূর্ণিমা রাত্রি প্রদোষ সময়।
করিলা বংশীর ধ্বনি দৈবকী-তনয় ॥
শুনিয়া সে বংশীর সুস্বর ভুজঙ্গমে।
দংশিল সকল কলাবতীর মরমে ॥
বিষাল শরের ঘায় যেমন হরিণী।
তেমত বংশীর স্বরে চঞ্চল গোপিনী ॥
জর জর হৈলা গোপী মন্মথ-শরে।
বিরহ আনল বাড়ে সবার অন্তরে ॥
গৃহ কর্ম্ম ত্যাগ করি যত ব্রজাঙ্গনা।
বংশী শুনি নিতম্বিনী পাশরে আপনা ॥

ক: বি: ৯৪৫ সং পুথি, ১১১ পত্র

দুর্লভনন্দনের ভাগবত

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সং ১০২৪ অবলম্বনে লিখিত)

ইষ্ট দেবের বন্দনার পরে গ্রন্থ এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

নৈমিসে নৈমিস-ক্ষেত্রে সৌনক আদি ঋষি।
কৃষ্ণকথা কুতুহলে সুতেরে জিজ্ঞাসি ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস সংহিতা পুরাণ।
ব্যাসদেব প্রসাদেতে সকল তত্ত্ব জান ॥

ঈশ্বরের লীলা আছে অনেক প্রকার।
তার সার দৈবকী-নন্দন অবতার॥
তার অবতার কথা কহ সুত শুনি।
কলিকাল-সাগরেতে কর্ণধার তুমি॥

ইহার উত্তরে সুত বলিতেছেন—

শুন অবতার কথা যে কারণে যথা তথা
শ্রীহরি ধরে যেইরূপ।
সকল ভুবনকারী বিরাট শরীর ধরি
জলে নাভি পদ্মে চতুর্মুখ॥
সনকাদি রূপ ধরি দ্বিতীয়ে বরাহ হরি
দন্তে মহী করিল স্বস্থান।
তৃতীয়ে নারদ নাম চতুর্থে নাম নারায়ণ
পঞ্চমে কপিল দিল জ্ঞান॥
ষষ্ঠে দত্ততও (দত্তাত্রেয়) হয় সপ্তমেতে যজ্ঞময়
অষ্টমে ঋষভ অবতার।
নবমেতে পৃথুমূর্ত্তি দোহন করিল পৃথ্বী
দশমে............॥

এইরূপে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে ভগবানের দ্বাবিংশ অবতারের বিষয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া এবং সংহিতাদি রচনা করিয়াও মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই, এমন সময়ে নারদ আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত ব্যাসদেবের নিকট বর্ণনা করিতেছেন—

বেদবাদি এক বিপ্র ছিল এক দেশে।
শুদ্রা এক দাসী ছিল তাহার নিবাসে॥

বুঝিতে না পারি কিছু দৈবের ঘটন।
সেই শুদ্রা দাসীগর্ভে লভিনু জনম ॥
জননী পালন করে বাড়ি প্রতিদিনে।
ব্রাহ্মণের কার্য্যে বুলি জননীর সনে ॥
ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে তার কাছে আমি।
হেন কালে আচম্বিতে জয় কৃষ্ণধ্বনি ॥
জয় কৃষ্ণধ্বনি শুনি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী চারি জন উপনীত ॥

ইহারা চারিজন বর্ষার চারিমাস সেই ব্রাহ্মণের গৃহে যাপন করিয়াছিলেন ; সেই সময়ে আমি তাঁহাদের সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ আমার কর্ণে মন্ত্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে মাতৃবিয়োগের পর আমি বনে গমন করিয়া উপাসনা করিলে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিব। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে রাত্রিতে গোদোহনের জন্য গমন করিবার কালে সর্পদংশনে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তৎপর আমি বনে গমন করিয়া ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলাম এবং তাহারি ফলে পরজন্মে নারদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই আখ্যায়িকা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে কবি প্রথম হইতেই ভাগবত অনুসরণ করিয়া তাহার সারমর্ম নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

শৃঙ্গীনামে মুনির কুমার কুতুহলে।
বালকের সঙ্গে খেলে কৌসিকের জলে ॥
হেনকালে জনকের অপমান শুনে।
কোপে চমকিত তনু বলে অভিমানে ॥

এতদিন হৈল ভাই বিপরীত ধন্দ।
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় বৈশ্য সেবক সম্বন্ধ ॥
ঠাকুরের অপমান করে যে সেবকে।
যজ্ঞদ্রব্য নষ্ট যেন করে পোষা কাকে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গেলা আর নাহি কর্ত্তা।
প্রভু বিনে ব্রাহ্মণের এতেক অবস্থা ॥
বলিতে বলিতে কোপে বশ হৈল তনু।
মুখখানি হৈল যেন প্রভাতের ভানু ॥
আতাম্রলোচনঘন করে ছলছল।
সিন্দূরে মণ্ডিত যেন অসিত কমল ॥
শৃঙ্গীবশে আর ভাই মোর দেখ বল।
হাতে করি লৈল শিশু কৌসিকের জল ॥
বজ্রবাক্যে ব্রহ্মশাপ দিলুঁ সেইজনে।
তক্ষক দংশনে পরলোক সাতদিনে ॥ (২০ পত্র)

এই আখ্যায়িকা প্রথম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে। আদর্শের সহিত তুলনা করিলে এই অনুবাদ যে অনেকটা মূলের অনুরূপ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে কবি প্রত্যেক অধ্যায় হইতে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মালাধর বসু প্রভৃতি ভাগবতের অনুবাদকারিগণ অনেকেই ভাগবতের দশম ও একাদশস্কন্ধ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্লভনন্দন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক স্কন্ধের উল্লেখ করত এইকাব্য রচনা করিয়াছেন। ভাগবতাচার্য্যের গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। রচনা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল এবং দোষবিবর্জ্জিত হইয়াছে। ভাগবতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণরূপে এই গ্রন্থের প্রচার হইতে পারে। দুর্লভ-নন্দনের সময় সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের

পুঁথিতে লিপিকাল ১০৮৫ সাল লিখিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু অস্পষ্টতার দরুণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই তারিখের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয় যে কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল

কবির পরিচয়:—কবির নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী এবং উপাধি কবিচন্দ্র। নিবাস ছিল—বিষ্ণুপুরের ৮ ক্রোশ পূর্ব্বস্থ লেগোগ্রামের দক্ষিণসীমা-সংলগ্ন পান্নুয়া গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী, যথা—

চক্রবর্ত্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত গাইল শঙ্করে।

মুদ্রিত সং, ২৫ পৃঃ

অন্যত্র—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্নুয়ায় বসতি॥

ঐ, ৩০৬ পৃঃ

গ্রন্থের বিভিন্ন ভণিতায় গোবিন্দমঙ্গলব্যতীত ভাগবতামৃত, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ রহিয়াছে—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ভাগবতামৃত।

ঐ, ৩২৪ পৃঃ

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।

ঐ, ২৬৩ পৃঃ

(১) ডাঃ সেনের গ্রন্থে 'পরমানন্দের ভাগবত'রূপে এই গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। দুর্লভ-নন্দন যে কি প্রকারে পরমানন্দে পরিণত হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

রাধিকামঙ্গল-গীত সুধার সমান।
শঙ্কর বলেন সবে সুধা কর পান॥

ঐ, ১৯২ পৃঃ

কবি স্বপ্নে ব্যাসদেবের আদেশ লাভ করিয়া গোবিন্দমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে কৃপা কৈল যারে ব্রাহ্মণের বেশে॥

ঐ, ১৬৮ পৃঃ

কবির সময় সম্বন্ধেও ধারণা করা যাইতে পারে। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের আদেশে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন—

শ্রীযুত গোপালসিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্ত্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ॥
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে।
বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে॥
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ॥*

ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ।৵০

কবিকে রাজা গোপাল সিংহ বীরবৌলী ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। অতএব জীবদ্দশাতেই কবি সম্মানিত হইয়াছিলেন, ইহাও জানা যাইতেছে। কবিচন্দ্রের মহাভারতের শেষ পর্ব্বগুলিতে "কবিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কথকচন্দ্রে কয়" এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে ধারণা করা যাইতে পারে যে, কবি বোধ হয় সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

* পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দমঙ্গলের ভূমিকা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

কবি রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে রামায়ণ, এবং বীরসিংহের রাজত্বকালে শিবমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পাঙুয়ায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি॥

রামায়ণের একটি ভণিতা

অন্যত্র—

বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদামতি ইষ্টের চরণে।
সংকীর্ত্তন অভিলাষী তাঁহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্র রস ভণে॥

শিবমঙ্গলের একটি ভণিতা

বিশ্বকোষ, ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের রাজাদের যে বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বীরসিংহের (১৬৫৬-৮২ খৃঃ) পরে দুর্জ্জন সিংহ (১৬৮২-১৭০২), তৎপর রঘুনাথ সিংহ (২য়) (১৭০২-১৭১২) ও গোপাল সিংহ (১৭১২-১৭৪৬) রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। বীরসিংহ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে লালজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুর্জ্জন সিংহের সময়ে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মদনমোহনের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোবিন্দমঙ্গলের বন্দনা-অংশে এই মন্দিরের বর্ণনা রহিয়াছে—

পূর্ব্বেতে আছিল প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
কৃপা করি মল্লবংশে আইলা বিষ্ণুপুরে॥
নবরত্ন তুলি দিলা দিব্য অট্টালিকা।
প্রভুর পাশে শোভিতেছে শ্রীমতী রাধিকা॥ ইত্যাদি

তৎপর—

ধন্য রাজা মল্লবংশে সার্থক জীবন।
যার রাজ্যে সাড়ে তিন কোটি দেবগণ॥

মুদ্রিত সং, ৩ পৃঃ

এখানে রাজার নামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মন্দির নির্ম্মাণকারী দুর্জ্জন সিংহকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব কবি বীরসিংহের রাজত্বকালে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সময়ে শিবমঙ্গল, দুর্জ্জন সিংহের সময়ে প্রায় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে গোবিন্দমঙ্গল, রঘুনাথের সময়ে রামায়ণ, এবং গোপাল সিংহের সময়ে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কবির নামে প্রদত্ত ১০২৮ ও ১০৩৩ সালের পাট্টাপত্র পাওয়া গিয়াছে[১]। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি কবিচন্দ্রের নামে প্রদত্ত এই পাট্টা দুইটির নকল আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে "সন ১০৩৩ মালাব্দে" স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, যদিও মাখনবাবু ইহা "সালাব্দে" পাঠ করিতে চাহেন। মাখনবাবুর পাঠ অনুযায়ী কবি ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বুঝা যায়। অতএব ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি প্রচারিত হইয়া থাকিবে, কারণ এই পাট্টাতে শঙ্করকে "কবিচন্দ্র" বলা হইয়াছে। অথচ তাঁহার রামায়ণ, মহাভারত, শিবমঙ্গল ও গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি ইহার পরবর্ত্তী কালেই রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দবিজয়ের ভূমিকায় মাখনবাবু লিখিয়াছেন, বীরসিংহ রাজার আমলে রচিত শিবমঙ্গলে কবি নিজের ৮৫ বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। "বীরসিংহ রাজার শেষ আমলে ৯৮৮ মল্লাব্দে বা বাঙ্গালা ১০৮৯ সালে শিবমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিলে তাহার পূর্ব্বস্থ ৮৫ বৎসরে কবিচন্দ্রের আবির্ভাব কাল" (ভূমিকা, ।৶০ পৃঃ) ১০০৪ বঙ্গাব্দ বা ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ হয়। গোপাল সিংহের রাজত্ব ১৭১২ খৃষ্টাব্দে

১। গোবিন্দমঙ্গলের ভূমিকা, ।৶০ পৃঃ।

আরম্ভ হইয়াছিল ধরিয়া লইলে কবি ১১৫ বৎসর বয়সের সময় মহাভারত রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন বুঝিতে, হয়। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অপর পাট্টার তারিখ মল্লাব্দেই লিখিত হইয়াছে। এই মল্লাব্দ ধরিয়া গণনা করিলে ১৭২২ ও ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহাই গোপাল সিংহের রাজত্বকাল।[২]

গ্রন্থ পরিচয় :—কবিচন্দ্র আবশ্যক মত ভাগবতের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে পালার আকারে গোবিন্দমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ইহা ভাগবতের ভাবানুবাদ মাত্র। কবি নিজেও বলিয়াছেন "ভারত-ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র ভণে" (মুদ্রিত সং, ৩৯ পৃঃ)। এইজন্যই গ্রন্থের অপর নাম "ভাগবতামৃত", যথা—"ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে" (ঐ, ৪৪ পৃঃ)। মঙ্গলাচরণ ও বন্দনার পরে প্রথমস্কন্ধ হইতে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের বিষয় বর্ণনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তারপর চতুর্থ স্কন্ধের ধ্রুবচরিত্র ও দক্ষযজ্ঞ, পঞ্চম স্কন্ধের জড়ভরতোপাখ্যান, ষষ্ঠ স্কন্ধের অজামীল উদ্ধার, সপ্তমের প্রহ্লাদচরিত্র, অষ্টমের সমুদ্রমন্থন ও বামনাবতার, নবমের অম্বরীষ-আখ্যায়িকা বর্ণনার পরে কবি দশম স্কন্ধের কৃষ্ণজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন, অবশেষে কৃষ্ণলীলাবসান বর্ণনায় গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কবি অন্যান্য পুরাণ হইতেও আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন "কন্বমুনির পারণ" বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—"ভবিষ্যপুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে" (ঐ, ১১৮ পৃঃ), এবং পারিজাত হরণ পালায় মধ্যে মধ্যে "হরিবংশে ব্যাস-উক্তি কবিচন্দ্র ভাষে" (ঐ, ৩৪৫ পৃঃ) এইরূপ নির্দ্দেশও প্রদান করা হইয়াছে। কবি দান ও নৌকালীলার পদ রচনা করেন নাই, কিন্তু গেড়ু চুরি, মূষিকমার্জ্জার লীলা, কলঙ্কভঞ্জন, দাতাকর্ণ, কৃষ্ণকালী উপাখ্যান প্রভৃতি ভাগবতারিক্ত বিষয় সমূহও বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণের মধ্যে

২। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হইয়াছে যে, সরকারী কাগজপত্রে ১৭৩০ হইতে ১৭৪৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত গোপাল সিংহের রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় (ঐ, ২৮ পৃঃ)।

কলঙ্কভঞ্জন, কৃষ্ণকালী-লীলা ও দাতাকর্ণের পালা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাল্যকালে "শিশুবোধকে" আমরা দাতাকর্ণের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছি, রমণীগণকে আগ্রহের সহিত কলঙ্কভঞ্জন পাঠ করিতে দেখিয়াছি, এবং যাত্রায় কৃষ্ণলীলা অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই সকল লীলা সহজ ও সরল ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহা কবিচন্দ্রের প্রতিভার অপূর্ব্ব দান বলিয়াই লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। রাস বর্ণনাতেও কবির পাণ্ডিত্যের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি বিদগ্ধমাধব, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয়ের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার আর কোন গ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ইহাতে চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ হইতেও একটি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গের "চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমঙ্গলবলয়িতকেশম্" ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদে কবি লিখিয়াছেন—

ময়ূর-চন্দ্রিকা চারু চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
চিকুরে বেষ্টিত হৈলে করে ঝলমল ॥
ইন্দ্রধনু অনুরূপ প্রচুর সাজনি।
অতিশয় মেদুর মধুর রূপখানি ॥

মুদ্রিত সং, ২১৩ পৃঃ

ভাগবতের দশম স্কন্ধের "রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি (১০।২৯।১) এইরূপে অনুবাদিত হইয়াছে—

শারদ উৎফুল্ল ফুল্ল মল্লিকাদি যত।
দেখিয়া বনের শোভা উচাটন চিত ॥
যোগমায়া জগন্নাথে করিয়া আশ্রয়।
অনঙ্গে প্রবেশ কায় স্থিরতর নয় ॥

ঐ, ১৯৯ পৃঃ

আবার গোপীগণের সাজসজ্জা বর্ণনায় ভাগবতের শ্লোকগুলির (১০।২৯।৫-৬) ভাবানুবাদে কবি লিখিয়াছেন—

কোন গোপী গাভী যত দোহাইতেছিল।
দোহন ছাড়িয়া সবে ধাইতে লাগিল॥
কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তন পরিহরি যায়।
কেহ পরিবেশন ত্যজিয়া বনে ধায়॥
কেহ কেহ শিশু মুখে দুগ্ধ দিতেছিল।
বালকে ফেলিয়া ভূমে ধাইয়া চলিল॥

ঐ, ২০০ পৃঃ

"তথাহি শ্রীগোবিন্দবিজয়ে" এইরূপ উল্লেখ রাসের পালার অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের ২১১ পৃষ্ঠায় এইরূপ উক্তির পরে—

রাধাকৃষ্ণ নিকুঞ্জে কৌতুকে পুষ্প তুলি।
বনে বনে ভ্রমণ করেন বনমালী॥

ইত্যাদি ক্রমে যে পদ্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সমাপ্তিতে অভিরাম দাসের ভণিতা পাওয়া যায়, যথা—

সবে বিরহিণী বলে করিয়া হুতাশ।
ভাবে কৃষ্ণ পাবে কহে অভিরাম দাস॥

ঐ, ২১২ পৃঃ

ইহা হইতে বুঝা যায় কবি, অভিরাম দাস কৃত গোবিন্দ বিজয় হইতেই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় এই গ্রন্থের যে অনুলিপি রহিয়াছে (৯৪৫ সং পুথি) তাহার সহিত উদ্ধৃতাংশ প্রায় মিলিয়া যাইতেছে। এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধাই কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভাগবতে রাধার নাম নাই, কোন এক গোপীর

কথা লিখিত আছে। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও রাধা এই কার্য্যে অগ্রসর হন নাই, কিন্তু কবিচন্দ্র অভিরাম দাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কবিচন্দ্রের গ্রন্থে যদুনন্দন দাস কৃত গোবিন্দলীলামৃতের বঙ্গানুবাদ হইতেও ভণিতা সহ পদাংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে, যথা—

আসি বংশীবটতলে মাণিক্য কুট্টিম পরে
গায়ে যদুনন্দন বিরলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৪ সংখ্যক পুথির ১৬৮-৯ সং পত্রে এই পদাংশ সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত পাওয়া যাইতেছে। যদুনন্দন ১৫২৯ শকে (১৬০৭ খ্রীঃ) তাঁহার কর্ণানন্দ রচনা করিয়াছিলেন (তরুর ভূমিকা, ১৯৫পৃঃ)। অতএব কবিচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা কবিচন্দ্রের সময় সম্বন্ধীয় আমাদের সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বনেও তিনি রাধা-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন যথা—

রাধা নাম জপি মহাদেব হৈল ভোলা।
রাধা গুণ গেয়ে পাইলা পারিজাত মালা।
রাধা জপি নারদ হইলা জীবন্মুক্ত।
গুপ্ত নাম রাধা ভাগবতে নাহি ব্যক্ত॥
অভিপ্রায় ব্যাসের বুঝিতে কেবা পারে।
প্রকৃতি খণ্ডে ব্রহ্ম করি লেখে রাধিকারে॥

মুদ্রিত সং ২১৬ পৃঃ।

কবি দানলীলা বর্ণনা না করিলেও বড়াইকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কালিয় নাগকে দমন করিবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণ হ্রদে ঝাঁপ দিয়াছিলেন তখন—

হেন কালে এই স্থানে আইল বড়াই।
কোথা তোমার কানু তারে সুধালেন রাই॥

মুদ্রিত সং ১৪৭ পৃঃ

অতএব বড়াইর আখ্যায়িকা কবির নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

মুষিক-মার্জ্জার লীলা ও কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি পালার ভণিতায় "রাধিকা মঙ্গলের" উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভাগবতাতিরিক্ত এই সকল পালার সমষ্টিতে রাধিকামঙ্গল নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহাই মুদ্রিত গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে।

কবিত্ব সম্পদে কবিচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ঠ স্থানীয় না হইলেও সরল ও প্রাঞ্জল রচনার জন্য যে ইহা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল, তাহা কতকগুলি পালার অত্যধিক প্রচার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ দাতাকর্ণ ও রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি পালাতে কবির উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সরস্বতীর প্রিয়সখী কল্পনার সাহায্যে তিনি মধুচক্র রচনা করিয়া গৌড়জনের চিত্ত হরণ করিয়াছেন। যে কোন পুথিশালায় কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কবিচন্দ্রের পালা-গুলির অনুলিপিও প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত দুই বিখ্যাত কবির প্রাধান্য স্বীকার করিলেও কবিচন্দ্র এদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

ভবানন্দের হরিবংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৺ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সতীশ বাবু সুদীর্ঘ ভূমিকায় ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কবি নিজের সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কিন্তু ইহা জানা যাইতেছে যে, তিনি সারদা বা সরস্বতীর বরে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

পাইয়া সারদার বর শ্লোক ভাঙ্গি মনোহর
রচিলেক ভবানন্দ দীন।

৭ পৃঃ

ইহা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর" প্রভৃতি ভণিতা মনে করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাসলীকেও বাগীশ্বরী বা সরস্বতীরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইজন প্রাচীন কবিই সরস্বতীর বরলাভ করিয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

ভবানন্দ লিখিয়াছেন যে, ব্যাসদেব রচিত হরিবংশের শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—

সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ অংশ।
সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদ-বন্ধে।
লোকে বুঝিবারে বলে দীন ভবানন্দে॥

এইরূপ উক্তি শ্রীনিবাসাচার্য্যের পত্নীর শিষ্য কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলেও রহিয়াছে (ঐ গ্রন্থালোচনা দ্রষ্টব্য)। অথচ এই সকল বিবরণ প্রচলিত হরিবংশে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভবানন্দ নিজেই এই সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাধাকৃষ্ণের গুহ্যাতিগুহ্য এই প্রেমলীলা হরিবংশে বর্ণনা করিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে নিষেধ করিয়া-ছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না, যথা—

একদিন শ্রীকৃষ্ণ আমার ঘরে আসি।
কহিলেগ মোর ঠাঞি মৃদু মৃদু হাসি॥
রাধার আমার প্রেম বর্ণিছ আপনে।
এহি কার্য্য করিবা যেন অন্যে না বাখানে॥
একান্ত ভক্তিয়ে যদি শুনে কোনজনে।
তবে মোর প্রীত যদি বাখান আপনে॥

ঐ, ১৭৪ পৃঃ

ইহাও গীতগোবিন্দের "যদি হরিস্মরণে সরসং মনো" ইত্যাদি শ্লোকটি মনে করাইয়া দেয়। যাহাই হউক, এই জন্যই ব্যাসদেব শিষ্যগণকে এই লীলা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন নাই, এবং ইহা প্রচলিত হরিবংশে স্থান লাভ করে নাই। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন উপলক্ষেও কবি নারদীয় পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন (৬৪ পৃঃ), এবং অন্যত্র—

কৌশিক পুরাণ মত কহে হরিবংশ।

১৮৭ পৃঃ

অথচ নারদীয় পুরাণে উক্ত আখ্যায়িকা নাই, এবং কৌষিক পুরাণেরও নাম পাওয়া যায় না (হরিবংশের ভূমিকা, ৫ পৃঃ)। কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, অতএব আখ্যায়িকা বিন্যাস করিবার পক্ষে তাঁহার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পাছে লোকে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করে, ইহা কল্পনা করিয়া আদর্শ স্বরূপ এই সকল পুরাণের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। [১]

তথাপি পৌরাণিক ভিত্তির উপরে এই গ্রন্থে অনেক আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগেই অসুর ধ্বংসের জন্য কৃষ্ণাবতারের কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণের কথোপকথনচ্ছলে রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সার এবং প্রহ্লাদ চরিত্র, মদন ভস্ম, রুক্মাঙ্গদের একাদশী প্রভৃতি আখ্যায়িকার বর্ণনা পাওয়া যায়। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন, গোষ্ঠ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, অক্রূরের আগমন ও কৃষ্ণের মথুরায় গমন প্রভৃতি উপাখ্যানও পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃষভানুর গৃহে রাধার জন্ম ও আয়ানের সহিত বিবাহও বৈষ্ণবমতসম্মত। তথাপি গ্রন্থ-রচনায় কবি স্বাধীন ভাবেই ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন।

সতীশবাবু যে কয়খানি পুথি অবলম্বনে হরিবংশ সম্পাদিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানির অনুলিপির তারিখ ১০৯৬ সাল অর্থাৎ ১৬৮৯

১। হরিবংশের ভূমিকা, ৪৸৶—৫৶৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(ঐ, ভূমিকা, ৪৸৵ পৃঃ)। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের প্রায় সমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (ঐ, ৩৸৵০ পৃঃ)। কবি যে সময়েই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা হরিবংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ বড়াই যে রাধার মাতামহী অর্থাৎ রাধার মাতা পদুমার পিসী, তাহার নির্দ্দেশ একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রদান করিয়াছেন। অথচ হরিবংশে আছে—

হেনকালে আইল রাধার মাতামহী ॥

(ঐ, পৃঃ ২১)

ইহা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণ মাত্র তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব রাধা যে সাগরের ঘরে পদুমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই আখ্যায়িকার সহিত ভবানন্দ পরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ বড়াই-ঘটিত কৃষ্ণলীলার আখ্যায়িকার প্রবর্ত্তক যে চণ্ডীদাস তাহা সনাতনের ভাগবতের টীকা হইতেও জানিতে পারা যায়, আর এই হরিবংশেও বড়ায়ের সাহায্যে কৃষ্ণলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সরস্বতীর বরে গ্রন্থ রচনার উল্লেখ যেন বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয়তঃ দানলীলায় রাধার রূপ-বর্ণনায় ভবানন্দ সমুদ্রমন্থন ও রম্য সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

যতরত্ন সমুদ্রেত সব তোমারি ঠাঞি।
মথন করিলে কেনে তাহাকে না পাই ॥
*　　*　　*　　*　　*
চরিত্রে লক্ষ্মীর সম, মুখে শশধর।
সুগন্ধেত জিন পারিজাত তরুবর ॥

৫৪ পৃঃ

ইহার সহিত তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

সুন্দরী রাধা ল স্বরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥
ষোলকলা সংপুন্ন চন্দ্রবদন।
সকলগুণ সংপুনী রাধা চন্দ্রাবলী।
গজরাজ গতি, পরিমল পারিজাত॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১ সং, ৬৯ পৃঃ

অন্যত্র হরিবংশে—

অথর্ব্বেদ শাস্ত্র-উক্তি অঙ্গিরা কহিছে।
রম্য সরোবর স্ত্রীর সর্ব্ব অঙ্গে আছে॥
দুই ভুজ মৃণাল সে অতি সুকোমল।
লীলা লাবন্য জল স্রোত আর জল॥
বহু-মলা জিনি নারীর কেশ শোভাকর।

ঐ, ৫৫ পৃঃ

তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

সুন্দরী রাধা ল সরোঅরময়ী।
বাহু তোর মৃণাল, কর রাতা উতজল।
লাবন্য জল তোর সিহাল কুন্তল।

ঐ, ১৯৫ পৃঃ

রূপ বর্ণনা নানা ভাবেই করা যায়, কিন্তু এইভাবে সরোবর ও সমুদ্রমন্থনের উল্লেখ হইতে ধারণা করা যায় যে, এক কবি অপরকে অনুকরণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস দানখণ্ডের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ভবানন্দ পাঠ করিয়া ছিলেন। সতীশ বাবুও বলিয়াছেন যে, ভবানন্দ বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবি।

হরিবংশের আখ্যায়িকা এই—রাধা যমুনাতে জল আনিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে রাধা তাঁহার সখী শ্রীমতীকে কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহার সহিত কোন বাক্যালাপ করেন নাই। তৎপর রাধা বড়াইকে প্রেরণ করেন, এবং তাহার দৌত্যে রাত্রে গোপনে উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়। ইহার পরে মথুরার হাটের পথে দান ও নৌকা লীলা, রাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপর কৃষ্ণ প্রথমে মথুরায়, এবং তথা হইতে দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকা হইতে উদ্ধব বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। তাঁহার সহিত রাধা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া বিলাসান্তে কৃষ্ণের শরীরে লীন হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকে পাইবার জন্য কৌশলে কৃষ্ণ দান লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিবংশে রাধা ও তাঁহার সখী শ্রীমতী স্বেচ্ছায় পঞ্চমীর ঘাটে কৃষ্ণ সন্দর্শনের জন্য যাইতেছেন। হরিবংশ রচনার কালে রাধার প্রেম আদর্শীভূত হইয়াছিল, তাই কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরাগ দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এই জন্যই কাব্যাংশে হরিবংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী, কৃষ্ণের প্রস্তাবে যদি তিনি সহজেই সম্মত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে সামান্যা স্ত্রী-পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে হইত। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রথম ভাগে কৃষ্ণের প্রতি রাধার পরম বিরাগ বর্ণনা করা সুসঙ্গত হইয়াছে। পরে ইহাই অনুরাগে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাধা চরিত্রের ক্রমিক অভিব্যক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতেই দানলীলার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তির সার্থকতা অনুভূত হয়। কিন্তু হরিবংশে মিলনের পরবর্ত্তী দানলীলার আখ্যায়িকা তেমন জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। কৃষ্ণের শরীরে রাধার লীন হইয়া যাওয়ার পরিকল্পনা যেন চৈতন্যদেবের জগন্নাথ বা গোপীনাথে লীন হইয়া যাওয়ার প্রসিদ্ধিই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভবানন্দ আরও নূতনত্বের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই রহিয়াছে—

ভারতভূমিতে রাজা নামে জন্মেজয়।
পরীক্ষিত ঔরসে জন্ম সারদা-তনয়॥
শৃঙ্গীমুনির শাপে রাজা হৈল ভগ্নবৎ।
ক্রমাগতে শুনিলেক গীতা-ভাগবত॥

ইহা যে জৈমিনি-ভারতের আখ্যায়িকা (ব্যাস-ভারতের নহে) তাহা মহাভারত সম্বন্ধীয় আলোচনায় পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভবানন্দ এখানে সঞ্জয় প্রমুখ কবিগণের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। জৈমিনি-ভারত যে এদেশে অপ্রচলিত ছিল না, তাহা এই উল্লেখ হইতেও প্রমাণিত হয়।

কেবল বিলাস কৌতুকের আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইলেও হরিবংশে সরস রচনার অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হইল—

কালা কালা করি বোল বিনোদিনি
তাতে কি বোলিতে পারি।
তোমার আমার আইস বিনোদিনি
রূপ যে বদল করি॥
কাজল বরণ আমাকে দেখিয়া
তুমি যদি মোকে নিন্দ।
তবে কেন তুমি কালিয়া কাজল
ভুরুর উপরে পিন্ধ॥

কালা কালা বলি হের বিনোদিনি
নিরবধি গালি দেস।
আমার অধিক বরণ কাজল
তোমার মাথার কেশ॥
কালা বিনে গোরা উজল না হয়
কালা সে আঁখির জ্যোতি।
কালারে নিন্দিয়া গলায়ে পিন্ধহ
কাজল বরণ পুতি॥
১০৭-৮ পৃঃ

দ্বিজ রামকান্তের রাসলীলা

বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ে (১ম খণ্ড, ৮০৬-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কবির নিবাস পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার ওড়নই গ্রামে ছিল। তৎপর তিনি রঙ্গপুরের ব্রাহ্মণী-পুণ্ডা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি ওড়নইর মৈত্রকুলোদ্ভব। ইনি ভাগবতাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন" ইত্যাদি। তৎপর কবির গ্রন্থ হইতে যে অংশ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার শেষ ভাগে আছে—

ফুল ফলে নম্র হইয়া কৈলা পরণাম।
সাধু সাধু বলি হরি কৈলে কি বাখান॥
কৃষ্ণ-দরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এহি পথে॥
অভাগিনী গোপনারী করিয়ে জিজ্ঞাসে।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ উপদেশে॥

এহিমতে তরুলতা পুছিয়া বেড়ায়।
বৃন্দাবনে ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায় ॥
ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন ॥
কত কত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে।
গোপীগণ সেই সেই লীলারূপ ধরে ॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়।
শুনিলে দুরিত খণ্ডে হরে ভবভয় ॥
গুরুপদে করি মতি দীনহীন ভ্রান্ত।
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত ॥

ইহারই উল্লেখ করিয়া কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন[১]—"বস্তুতঃ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে রামকান্তের কাব্যের নিদর্শনরূপে যেটুকু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ভাগবতাচার্য্যের কাব্যেরই অংশ মাত্র, স্বতন্ত্র রচনা নহে। কৌতূহলী পাঠক বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ের ৮০৬-৮০৮ পৃষ্ঠার সহিত কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীর ত্রিংশ অধ্যায় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে রমাকান্ত ভাগবতাচার্য্যের কাব্যের একটি পুথির লিপিকার মাত্র।"

এই উক্তি সম্পূর্ণই মিথ্যা। আমরা পরিষৎ সংস্করণের কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী, পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহার দশমের ত্রিংশ অধ্যায়ের রচনার সহিত রমাকান্তের রচনার মিল খুঁজিয়া পাই নাই। একই বিষয় বর্ণিত হইলেও উভয় কবির রচনায় পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

কিন্তু কবি রঘুনাথ পণ্ডিতের রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারেই কবি লিখিয়াছেন—

কত কত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে।
গোপীগণ সেই সেই লীলারূপ ধরে ॥

১। ডাঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪০২-৪০৩ পৃঃ।

ইহারই বিস্তৃত বিবরণ কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে রহিয়াছে, বলিয়া কবি ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াই আর ইহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। আমরা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

কানুর বিচ্ছেদে কার না রহে জীবন।
কৃষ্ণলীলা করিতে লাগিল গোপীগণ॥
এক সখী বলে আমি পুতনা রাক্ষসী।
আর সখী কৃষ্ণ হৈয়া স্তন্য পিল আসি॥
কোন সখী বোলে আমি শকট হইল।
কৃষ্ণরূপ হঞা কেহো চরণে ঠেলিল॥ ইত্যাদি

পরিষৎ সং, ২০১ পৃঃ

কবি নিজেই বলিতেছেন—"বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত", অথচ ইহা অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত সমালোচক মহাশয় টিপ্পনী করিয়াছেন—"এখানে" "বিংশতি" শব্দটি "ত্রিংশ" বা "ত্রিংশতি" শব্দের ভ্রান্ত পাঠ মাত্র।" এই ভ্রান্তি কাহার? আসল কথা এই যে, যিনি কল্পনা-বলে এই বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি পরিষৎ-সংস্করণ ও বঙ্গবাসী-সংস্করণ মিলাইয়া পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই। বঙ্গবাসী-সংস্করণ হইতে ভাগবতাচার্য্যের রাসের প্রারম্ভ-সূচক যে দশ পঙক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত রামকান্তের রচনা মিলিয়া যাইতেছে, অথচ পরিষৎ-সংস্করণে মুদ্রিত রচনার সহিত ইহার মিল নাই। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, রামকান্তের ভণিতাযুক্ত এই বিংশ অধ্যায়ের রচনাই বঙ্গবাসী সংস্করণের ত্রিংশ অধ্যায়ে ভাগবতাচার্য্যের রচনারূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই জন্যই পরিষৎ-সংস্করণের রচনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, পরিষৎ-সংস্করণে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাই

ভাগবতাচার্য্যের খাঁটি রচনা। বঙ্গবাসী-সংস্করণে রামকান্তের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া রামকান্তের রাসের অন্যান্য অংশ উদ্ধার করা যাইতে পারে। কবি ভাগবতাচার্য্যের পরে আবির্ভূত হইয়া স্বাধীনভাবেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের গোবিন্দ-বিজয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮২৯ সংখ্যক পুথিতে এক কৃষ্ণদাস-রচিত গোবিন্দমঙ্গলের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণবিলাস-রচয়িতা কাশীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস হইতে এই কবিকে গ্রন্থের নাম ও ভণিতা দৃষ্টে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কবির বিশেষ কোন পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই। তবে তিনি যে গোবিন্দ-মঙ্গলের অন্তর্গত প্রহ্লাদ-চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই পুথির ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায়, যথা—

গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায়।
প্রহ্লাদ-চরিত্র এতদূরে সমাধায়॥

৯ম পত্র

এই গ্রন্থের অনুলিপি ১১৭০ সালে (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছিল। অতএব প্রায় দুই শতবৎসর পূর্ব্বে কবি বর্ত্তমান ছিলেন ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। দৈত্যগণের সহিত নৃসিংহদেবের যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

চারিদিকে যত অস্ত্র ফেলিছে অসুর।
গিলিতে প্রবৃত্ত হইলা নৃসিংহ ঠাকুর॥
ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জে করাল বদন।
কত কোটি সূর্য্য জেন বিকট দশন॥

কত অস্ত্র গিলে কত চারি হস্তে ধরে।
ভৈরব গর্জ্জনে ফেলে দিগদিগন্তরে॥

৮ম পত্র

জীবন চক্রবর্ত্তীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কবির পরিচয়:—কবির পরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। ভণিতায় ইহাই মাত্র জানা যায় যে, তিনি নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র ছিলেন—

শ্রীকৃষ্ণচরণ মনে   যে জন একান্ত শুনে
কৃষ্ণদেব চিন্তিবে কুশল।
চক্রবর্ত্তী নারায়ণ   তস্য পুত্র শ্রীজীবন
বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬৪৩ সং পুথি, ২ পৃঃ

অন্যত্র—

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী   কেবল ব্যাসের মূর্ত্তি
ভাবি তার চরণ যুগল।
জীবন তাহার সুত   আদেশ পাইয়া ক্রত
বিরচিল শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল॥

ঐ, ৫৪৬৩ সং পুথি।

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবি ব্যাসরূপী পিতার আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ পরিচয়:—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারখানি পুথিতে (১০২৮, ১০৩৭, ৫৬৪৩ এবং ৫৪৬৩ সংখ্যক পুথি) কবির রচিত নৌকালীলা, কালিয়া নাগের ক্ষোভ হইতে গোপবালকগণের রক্ষা, এবং কালিয়দমনের আভাস ও সুদাম ব্রাহ্মণের উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে। নৌকালীলার প্রারম্ভ এইরূপ:—

গোপীরে করিতে পার চলে কৃষ্ণ কর্ণধার
তরী লয়্যা রহিল আপনি।
জানিয়া প্রভুর ছল যমুনায় অগাধ জল
অতিবেগে বহে তরঙ্গিণী॥
মথুরার গোপনারী সুখে বেচা কেনা করি
সভে বলে চল যাই ঘর।
যাইতে অনেক দূর আছে বৃকভানু পুর
বেলা হৈল তৃতীয় প্রহর॥
বুড়ী বলে-চল সবে বিলম্ব না কর তবে
এত বলি গমন তুরিত।
পরিহাস সখী সঙ্গে হাসিতে খেলিতে রঙ্গে
যমুনার তটে উপনীত॥

৫৬৪৩ সং পুথি।

ইহা হইতে বুঝা যায়, মথুরা হইতে ফিরিবার পথে বড়াই বুড়ীর সাহায্যে নৌকালীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কালিয়দমন ও সুদামের আখ্যায়িকায় কবি সংক্ষেপে ভাগবতেরই ভাবানুবাদ করিয়াছেন।

দ্বিজ কবিরত্নের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কবির পরিচয় কিছু জানা যায় না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১০০৪ সংখ্যক পুথিতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কালিয়দমন, গজকচ্ছপের যুদ্ধ, প্রলম্ব-বধ, এবং বস্ত্রহরণ পালা পাওয়া গিয়াছে। রচনার নমুনা এইরূপ :—

অঝোর নয়নে কালি কান্দে বিদ্যমান।
ক্ষেমা করি মহাপ্রভু দেহ প্রাণদান॥
চন্দ্র সৃজিলে প্রভু কত সুধা দিয়া।
ভুবন করয়ে আলো অমৃত সিঞ্চিয়া॥

উপকার বিনে সে না হয় অপকারী।
তার যশ ঘোষয়ে লোক ত্রিভুবন ভরি।

ঐ, ৩৪ পৃঃ

ভণিতা—

অমৃত অদ্ভুত সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে।
দ্বিজ কবিরত্ন গান হরিপদ তলে॥

ঐ, ৩৮ পৃঃ

দ্বিজ পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কবির পরিচয় বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তিনি অন্ততঃ ভাগবতের দশম ও একদশ স্কন্ধ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, ইহা জানিতে পারা যায়, যথা—

এতদূরে সাঙ্গ হল দশমের কথা।
একাদশে কহিব কৃষ্ণের গুণগাথা॥

কঃ বিঃ, ৪০২৮ সং পুথি, ৯৪ পৃঃ

অন্যত্র—

ভাগবত মতে বিপ্র পরশুরাম ভণে।
উচ্চস্বরে হরি-ধ্বনি বোল সর্ব্বজনে॥

পরশুরাম মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন—

চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণ কমল।
দ্বিজ পরশুরামে গায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

কঃ বিঃ ৩১৮৩ সং পুথি, ৪ পৃঃ

পরশুরামের অক্রূরাগমন, কালিয়দমন, গুরুদক্ষিণা, দানখণ্ড, পারিজাত হরণ, শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান, সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন প্রভৃতি পালা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সুদামা চরিত্রের একখানি পুথি (সাহিত্য-পারিষদের

১২৭৮ সং পুথি দ্রষ্টব্য) ১০৬৪ সালে বা ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। অতএব ধারণা করিতে পারা যায় যে, কবি অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। কবির উপাধি ছিল "চক্রবর্ত্তী" এজন্য ভণিতায় তিনি "বিপ্র" বা "দ্বিজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুথি শুন সর্ব্বলোকে ॥

প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১-১, ১৬৯ পৃঃ

অন্যত্র—দ্বিজ পরশুরাম গান গোপাল ভরসা ঐ
এবং—বিপ্র পরশুরামে গায় কৃষ্ণ-অবতার।

ব-সা-প-প, ৬, ৭৮ পৃঃ

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে দ্বিজ পরশুরামের ভাগবত হইতে সুদামা-চরিত্র পালাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ ৮৯৭—৯০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে কবির রচনার নিদর্শন স্বরূপ কিয়দংশ এই খানে উদ্ধৃত হইল :—

শুন শুন পরীক্ষিত হৈয়া এক মন।
আছিলা কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন ॥
সুদামা তাহার নাম জগতে বিদিত।
সর্ব্বশাস্ত্র জানে সে বিচারে পণ্ডিত ॥
লোভ-মোহ নাহি তার নাহি অভিমান।
সংসারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান ॥

এই ব্রাহ্মণ পত্নীর পরামর্শে কৃষ্ণের সহিত দ্বারকানগরে সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণী ভিক্ষা করিয়া চারি মুষ্টি খুদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়াই কৃষ্ণ দরশনে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং নিজে যাচ্ঞা করিয়া ঐ খুদ ভক্ষণ

করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা সুদামার বাড়ীতে যাইয়া তাহার জন্য এক সুবর্ণের পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সুবর্ণের ঘর দ্বার অতি মনোহর।
সুবর্ণের কলস শোভে চালের উপর ॥
চৌদিকে বেড়িয়া দিল মনোহর গড়।
গোধন বেড়ায় গৃহে কত পালে পাল ॥
তাহার কোণে সরোবর দেখিতে সুন্দর।
ভ্রমর ভ্রমরী সব করে কলরব ॥
ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই দাসদাসীগণ।
হস্তী ঘোড়া দেখি যেন ইন্দ্রের ভুবন ॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সুদামা নিজের বাড়ীতে আসিয়া ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু আর এক পরশুরাম কর্ত্তৃক মাধবসঙ্গীত নামে এক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়াও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তিনি নাকি চম্পক নগরীতে থাকিয়া কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন রায় এবং তিনি মনোহর দাসের শিষ্য ছিলেন (বীরভূম বিবরণ, ৩, পৃঃ ১৬৩)।

এক মনোহর দাস বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থ-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন এবং উক্ত রাজার দ্বার পণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য ইঁহার বন্ধু ছিলেন। ইনি ১৫০০ শকাব্দার পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন (তরুর ভূমিকা, ১৮৫ পৃঃ)

অতএব এই মনোহরের শিষ্য হইলে এই পরশুরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম যদি মধুসূদন রায় হয় তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। অতএব বিপ্র পরশুরামের সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব কল্পনা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।

বাসুদেব ঘোষের শ্রীকৃষ্ণলীলা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২৬২২ সংখ্যক পুথিতে এই গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পুথিখানি খণ্ডিত হইলেও ইহাতে সুবল-সংবাদ, ননীচুরি, ভানুপূজা, মানভঞ্জন, দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড, দূতীসংবাদের পালা পাওয়া গিয়াছে। পুথির অনুলিপির তারিখ ১২৫৮ সাল।

দানখণ্ডের প্রারম্ভ এইরূপ—

একদিন সখীগণ একত্র হইয়া।
করয়ে পরম যুক্তি বড়াইকে লয়া॥
শুন শুন বড়াই আই বলি যে তোমাকে।
কালি তোমার সঙ্গে যাব মথুরার বিকে॥

৭ পত্র

গোপীগণকে লইয়া চলিতে বড়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কত মণ দধি লইয়া যাইতেছে। উত্তরে—

ললিতা বলেন আই মোর সাত মণ।
বিশাখা বলেন আই মোর পাঁচ মণ॥
কেহ বলে পাঁচ মণ, কেহ বলে তিন।
শ্রীরাধিকা বলেন আই মোর এক মণ॥
বড়াই বলে শ্রীমতী গো জানি ভাল মতে।
তব মন নিরন্তর কালা চাঁদের কাছেতে॥
রসিক নাগর সেই, তুমি রসবতী।
রসিক না হলে কভু না জানে পীরিতি॥

৭ পত্র

অবশেষে মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে তাঁহারা দেখিলেন,

শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গা নৌকা লইয়া যমুনার তীরের নিকটে অপেক্ষা করিতেছেন। পার করিতে বলাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

সব গোপী পার করিতে নিব আনা আনা।
রাধিকাকে পার করিতে নিব কানের সোনা॥
গোপীগণে পার করিতে নিব বুড়ি বুড়ি।
শ্রীরাধাকে পার করিতে নিব গায়ের সাড়ী॥

অবশেষে পারের সময়ে নৌকা ডুবিল, এবং জলমধ্যে রাধা কৃষ্ণ মিলিত হইলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শই প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কবির ভণিতা এইরূপ—

বাসুদেব ঘোষে বলে রাধাকৃষ্ণ পদতলে
যুগল রূপ নয়ন ভরি হের।

২ পত্র

অন্যত্র—রাধাকৃষ্ণ পদ ভাবি বাসুদের ভণে।

৬ পত্র

নরহরি দাসের ভাগবত

এই গ্রন্থের বিবরণ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৮১১-৮৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যে পুথি হইতে উহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ৬১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অতএব কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবির ভণিতা এইরূপ—

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ অভিলাষে।
কৃষ্ণ-লীলামৃত দাস নরহরি ভাষে॥

অন্যত্র— শ্রীগুরু চরণ পদ্ম বন্দিয়ে মাথায়।
কেশব-মঙ্গল দাস নরহরি গায়॥

এবং— শ্রীমদ্ভাগবত কথা ব্যাসের বর্ণিত।
কহে নরহরি দাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচরিত, কেশবমঙ্গল, কৃষ্ণলীলামৃত প্রভৃতি শব্দ এই গ্রন্থের সমনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কবির রচনার নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

নিদাঘ সময়ে তথা ভাস্কর প্রবল।
সভার বদনে বহে ঘন ঘর্ম্মজল
ভ্রমণ করিয়ে শিশু কাননের মাঝে।
নটগণ মধ্যে ভাল শোভে নটরাজে॥
পর্ব্বত উপরে বহে পর্ব্বতের ঝারা।
সে স্থানেতে বারি অতি সুশীতল পারা॥
কোন কোন স্থানে হয় দিব্য সরোবর।
বিকাশ কমল তাহে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
রাজহংস সারি সারি সারস করে কেলি।
মন্দ মন্দ বায়ু উঠে জলের হিল্লোলি॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৮১৫-৮১৬ পৃঃ)

ঋতু-বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন :—

নিদাঘ হইল গত বরিষা আইসে॥
রবিকর তাপেতে তাপিত অষ্টমাস।
তাপ দূরে গেল হইল মেঘের প্রকাশ॥
ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জ্জন।
দমকে দামিনী ঢুকু ঢুকু বরিষণ॥
ধরাধর বরিষণে ধরা ভেল সুখী।
সর্ব্বদা সন্তোষে নৃত্য করে সব শিখী॥ ইত্যাদি

(ঐ, ৮১৭-১৮ পৃঃ)

কবি রুক্মিণীহরণ পালাটি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জরাসন্ধ শিশুপালকে এই ভাবে সান্ত্বনা দিতেছেন :—

যথা শিশুপাল আছে হাতে বান্ধা সুত।
দন্তবক্র জরাসন্ধ তথা উপনীত॥
শিশুপালে কহে ফিরি যাহ নিজালয়।
দুঃখ না ভাবিহ মনে হারি পরাজয়॥
কখন সংগ্রাম জিনি কখন বা হারি।
ইহাতে সুবুদ্ধি লোক শোচন না করি॥
সপ্তদশ বার হারিলাম কৃষ্ণ-হাতে।
তবু একবার তারে না পারি জিনিতে॥
তোমার কারণে যুদ্ধ হারিলাম সবাই।
তবু দণ্ড দিব কভু লাগ যদি পাই॥ ইত্যাদি

[ঐ, ৮৩২—৮৩৩ পৃঃ]

অচ্যুতদাসের কৃষ্ণলীলা

এই গ্রন্থের বিবরণ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৮৬০-৮ পৃঃ)। কবির পরিচয় জানা যায় না, কিন্তু যে পুথি হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে একশত বায়ান্ন পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব কবি বোধহয় সমগ্র কৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। মথুরায় যাইবার কালে কৃষ্ণের বেশ-ভূষার বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন :—

ক্ষুদ্র ঘন্টিকা তাহে বান্ধিল আমোদে।
চলিতে বাজএ নানা যন্ত্রের শবদে॥
তবেত বান্ধিল চূড়া কপালে টানিঞা।
সুগন্ধি কুসুমদাম তাহাতে বেড়িঞা॥

তাহার মূলেতে মণি-মাণিকের পাতি।
রবির কিরণ হেন দেখি সেই জ্যোতিঃ॥
তবে ত দিলেন মস্ত শিখীচাঁদ মাঝে।
সঘনে উড়িছে বায় অধিক বিরাজে॥
ললাটে তিলক দীর্ঘ অতি মনোহর।
নাসিকা পর্য্যন্ত শোভা দেখিতে সুন্দর॥

[ঐ ৮৬৮ পৃঃ দ্রঃ]

ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের ভাগবত

এই গ্রন্থের বিবরণ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৯২৪-৩০ পৃঃ)। কবির পরিচয় জানা যায় না। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রজক-বধের তত্ত্ব কবি এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন :—

মুনি বলে নৃপমণি করহ শ্রবণ।
কেন অবিচার করিলেন নারায়ণ॥
বস্ত্র-উপলক্ষে কৈলা রজক-উদ্ধার।
যে হেতু রজক-বধ শুন তত্ত্ব তার॥
ত্রেতা যুগে হৈল তার রাম অবতার।
অযোধ্যায় আইলে করি সীতার উদ্ধার॥
অযোধ্যায় শ্রীরাম যে রজকের ভাষে।
পঞ্চমাসের গর্ভ সীতা দিল বনবাসে॥
লোক মুখে শুনিয়া রজক গুণধাম।
জোড় করে আইল যথা আছেন শ্রীরাম॥
রামের নিকটে রজক আইল তখন।
গলে বাস দিয়া বলে শুন নারায়ণ॥

আমি অতি দুরাচার পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমার কথায় হৈল জানকীর বন ॥
কত অপরাধ কৈনু না যায় বর্ণন।
নিজ হস্তে কর মোর মস্তক ছেদন ॥
শ্রীরাম বলেন যদি বধিব তোমাকে।
নিন্দুকের অপরাধ ভুগিবেক কে ॥
এই হেতু বলি তোমায় রজক কুমার।
বর দিনু কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার ॥
বস্ত্র উপলক্ষ মাত্র শুনহ রাজন।
এই হেতু করিলেন রজক-নিধন ॥

(ঐ ৯২৬—২৭ পৃঃ)

রাধাকৃষ্ণ দাসের ভাগবত

এই গ্রন্থের বিবরণ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৯৩০-৯৫৯ পৃঃ)। এই গ্রন্থের নাম "দ্বারকাবিলাস" ছিল বলিয়া বোধ হয়, যথা—

সেই রাধা-কৃষ্ণদাস এই দ্বারকা-বিলাস
পঞ্চমতে করিল রচন ॥

অন্যত্র— রাধাকৃষ্ণ দাস দ্বারকা-বিলাস
ভাষাতে করে রচন ॥

যে পুথি অবলম্বনে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে গদ্যরচনাও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রচনা পাঠ করিলে মনে হয় কবি উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। রুক্মিণীর বিবাহ-প্রসঙ্গই বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে রুক্মিণীর সাজসজ্জার বিবরণ কবি এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

কনক-বেষ্টিত রতনে জড়িত
মণিময় আভরণ।
রুক্মিণীর অঙ্গে পরাইল রঙ্গে
যেথা সাজে যেমন॥
আঁখি নীলোৎপল তাহাতে কজ্জল
উজ্জ্বল করিয়া দিল।
কোন স্ত্রী রসিকা চন্দন-কলিকা
নাসিকায় প্রকাশিল॥
একে দুটি পদ জিনি কোকনদ
অলক্ত পড়িল তায়।
শোভিল যেমন প্রভাত-তপন
উদিত যেন দু পায়॥ [ঐ ৯৪২ পৃঃ]

ভবানন্দ সেনের ভাগবত

এই গ্রন্থের পরিচয় বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৯২১-৯২৩ পৃঃ)। কৃষ্ণের নিকটে আগত একটি ঘুঘুর নিকটে কৃষ্ণ ব্রজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই ভাবে গ্রন্থটির আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরে পক্ষী কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

জল বিনে যেন মীন সদা হয় অতি ক্ষীণ
শেষ বিনে যেমন সংসার।
কাম বিনে যেন রতি সদা কান্দে দিবারাতি
তোমা বিনে রাধার কে আর॥
সীতার শোকে রঘুনাথ বানর লইয়া সাথ
পাঠাইল বীর হনুমানে।

যাইয়া পবন-সুত রণ কৈল অদ্ভুত
মারিল বহুত চরগণে ॥
কনক লঙ্কা ছারখার রাক্ষস করে হাহাকার
কান্দে রাজা শিব শিব স্মরি।
সেইমত গোপনারী কান্দিয়া আকুল হরি
ছারখার হৈল ব্রজপুরী ॥ (ঐ, ৯২২ পৃঃ)

ভক্তরামদাসের গোকুলমঙ্গল

এই গ্রন্থের পরিচয় বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে (ঐ, ১—১, ১১২—১৪ পৃঃ; এবং ১—২, ১০২—৩ পৃঃ, সাহিত্য ১৩১০, ৯১—১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" ইহার নিকট অতি নগণ্য বোধ হইবে। ইহাও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ বা তদবলম্বনে লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সুন্দর কবিত্ব-সৌরভে আমোদিত, বিবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব ছন্দ ও রাগরাগিণীর ঝঙ্কারে মুখরিত।" কবির ভণিতা এইরূপ—

গোকুল-মঙ্গল কহে মহামুনি ব্যাস।
ভক্তদাসে বোলে রাজা পূর্ণ হউক আশ ॥

অথবা— গোকুল-মঙ্গল ভণে দাস ভক্তরাম।
সাজিল পোতনা বুড়ি হিংসিবারে শ্যাম ॥

রচনার নমুনা—

আলো বন্ধু, বড় যে নিঠুর তোর হিয়া।
মরিমু অবলা রাধা পীরিতে ঠেকিয়া ॥ ধুয়া ॥
ধৈরজ না মানে মনে তুয়া প্রেমফান্দে।
পীরিতে অবলার প্রাণ নৈলা কালাচান্দে ॥

তোমার বিরহে হরি গরল ভখিমু।
নহে জাতি কুল তেজি যোগিনী হইমু ॥
এমত নিষ্ঠুর কেনে হইলা মুরারি।
তুয়া মনে সাধ যে বধিতে গোপনারী ॥
নিশ্চএ মরিমু নারী তুয়া প্রেমফান্দে।
ভক্তরামে কহে পুনি কহে কালাচান্দে ॥

অন্তত্র— নাচে নন্দলাল, নাচে নন্দলাল।
গোপী বোলে নন্দলাল ভাল নাচেরে ॥
ঘন ভুরু ঠারে অলি চুরাএ উরে
চরণে নূপুর বাজে রে ॥ ধ্রু ॥
গোপি সঘন মঙ্গল গাহেরে।
যেন চাতকিনী হেরে মেঘপানি
কানু পানে গোপি চাহেরে ॥
রঙ্গ করে ব্রজ নারীরে।
শ্যাম চিকণ অঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গ
অধরে মুরারি পুরেরে ॥ ইত্যাদি

দানলীলা ও অন্যান্য পালা

কবিশেখরের দানলীলা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সং—৯৬৬,৯৬৩

প্রারম্ভ :—

রঙ্গে ঢঙ্গে রহি বসি সব সখীজনে।
মধুপুরি বিকে যায় হরসিত মনে ॥

হেনমতে গোপীসব জায় নিতে নিতে।
তা শুনিআ কানাই ধরিতে নারে চিতে ॥
দান-প্রবন্ধ কথা শুন সর্ব্বজনে।
কহে কবিশেখর অমৃত বরিসনে ॥

একদিন কৃষ্ণ সঙ্গিগণকে ধেনু-রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া নিজে যমুনার তীরে এক কদম্ববৃক্ষের মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে—

হেন বেলাঅ লাসে বেসে সাজিঞা পসরা।
সে পথে মথুরা বিকে জায় ব্রজবালা ॥
তা দেখি কানুর গা ধরণে না জায়।
রসের সাগরে ভাসে থল নাহি পায় ॥

এদিকে গোপীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া—

পটের পুতলি জেন রহে সারি সারি।
বড়াইরে বলিতে লাগিল বোল দুইচারি ॥
হে কি দেখিএ বড়াই কদম্বরে তলে।
দেখিতে দেখিতে প্রাণ অধিক উথলে ॥
তড়িত জড়িত দেখি নবজলধরে।
সম্পূর্ণ শ্যামল চাঁদ তাহার উপরে ॥
শ্যাদচাঁদ উপরে ধবল চাঁদ কলা।
ধবল চাঁদের শিরে তিমিরের মালা ॥

বড়াই বলিল—

কেহো কতি না চাহিয় আইস সাবধানে।
কানু কিছু পুছিলে না দিহ সম্বিধানে ॥

কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া—

হাসিঞা রসিক বুড়ি দিল আখি ঠারে।
গোপী রহাবারে ডাকে নন্দের সুন্দরে ॥

বাহু পসারিঞা কৃষ্ণ আগুলিল পথে।
সব গোপী সমুখে রহিল হেটমাথে॥

কৃষ্ণ বলিলেন—

এবার চাতুরিপনা না রহে তুমার।
বার বরিসের দান নি এইবার॥
ই বোল সুনিঞা বুড়ি উভ করি নড়ি।
মারিবার আশে আস্তে হাস্তা জায় রড়ারড়ি॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ রাধার নিকট বার বৎসরের দান চাহিয়াছিলেন। এখানে তাহারই প্রতিধ্বনি মিলিতেছে। বিশেষতঃ সনাতনের নির্দেশ অনুযায়ী যখন চণ্ডীদাসই দানলীলার প্রবর্ত্তক, তখন এখানে কবি যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যাহাই হউক, কৃষ্ণের কথা শুনিয়া

এ বোল সুনিঞা কোপে রাধিকা সুন্দরী।
বুড়ি লক্ষ করি কিছু কহে ধীরি ধীরি॥
বড়ার তনয় তুমি বড় বলি (জানি)।
তুমার বদনে কেন হেন সব বানি॥
সকল গকুল পুরে নন্দ অধিকারী।
কংস রায় মহারাজার নাম করি॥
তাহার তনয় তুমি গকুলের প্রাণ।
রূপেগুণে নাহি সুনি তুমার সমান॥

কিন্তু কৃষ্ণ দমিবার পাত্র নহেন, তিনি দেহ ও বিবিধ অলঙ্কারের উপরে দান চাহিয়া বসিলেন। শুনিয়া গোপীগণ বড়াইকে বলিল—

ভাল বলি বড়াই আইলু তোর সঙ্গে।
মাঝে বসি দেখ তুমি দুহার তরঙ্গে॥

চল সব পসার আনিয়া জাই ঘরে।
দেখি কি করিতে পারে নন্দের সুন্দরে ॥

কিন্তু কৃষ্ণ বাধা দান করিয়া রাধাকে বলিলেন—

কি মরে দেখাহ রাধা নহলি জৌবন।
দান না পাইলে তোমা ছাড়ে কোন জন ॥
বড়ার ঝিআরি তুমি বড়ার বৌহারি।
ধিক ধিক বচন বলিতে কিছু নারি ॥
নহে অবশেসে দোস না দিহ আমারে।
দান নিব আর কুলে করিব থাঁথাঁরে ॥

ইহা শুনিয়া রাধা বড়াইকে যাইয়া বলিতেছেন—

দানী হঞা স্বামীর মত জৌবন বাখানে।
পরনারী পরসনে সঙ্কোচ না মানে ॥
নানামতে রতি আশে কুবচন বলে।
দুবাহু পসরি বোলে আস্ত করি কোলে ॥
জদি মোরে নন্দসুতা আর কিছু বলে।
ঝাঁপ দিঞা প্রাণ দিব জমুনার জলে ॥

তখন বড়াই বলিল—

পিরিতে মানাঞা জাব নন্দের কুমারে।
কোন বোল লাগি ঝিএ হইলে অস্থিরে।
পিরিতের সাকোঁ কৃষ্ণ জানি সর্ব্বকালে।
বচনে রঞ্জিয়া জাব কি কাজ কচালে ॥
হঠে জারে ইন্দ্র আদি দেবতা নাহি আঁটে
বলে জারে কংস থরহরি কাঁপে পাটে ॥

নারী হঞা কি কাজ সে জন সনে বাদে।
এখনি করাত্যে বড় পারে পরমাদে ॥

বড়াইর এই কথা শুনিয়া—

শুনিঞা বুড়ির এত সরস বচনে।
বাহু রোষে রুসিঞা উঠিল সখীগণে ॥
ভাল তুমি বড়াই কহসি ভাল কথা।
সময় বুঝিঞা কর হেনক ব্যবস্থা ॥
একে ছল ধরে কৃষ্ণ আরে হেন কহ।
আপনার জাতি নাস আপনে করহ ॥
বুঝিল তোমার কথা পাকের বড়াই।
সব সখী মেলী জাব কানাইর ঠাই ॥

সখীরা কৃষ্ণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন—

কি মিছা যুগতি কর গোয়ালা সুন্দরী।
বোধ না পাইলে লাগ না ছাড়ে মুরারি।
জবে দান দিতে নাহি এক বোল ধর।
রাধা এড়ি বিকে জাহ মথুরা নগর ॥

ইহা শুনিয়া বড়াই বলিলেন—

ভালই বচন বৈলে উদার কানাই।
ভালে তোর বাপের মুখে লাজ নাই ॥
রাহুর নিকটে চাঁদ রহে কতখনে।
সিংহের সমীপে কেবা সমর্পে হরিণে ॥
মত্ত হাতী হাতে কিবা থাপে ফুলমানে।
ঘৃত কে অবুধ রাখে জলন্ত আগুনে ॥ ইত্যাদি

কিন্তু রাধা আসিয়া বলিলেন—

জে জাবে সে জাউ বিকে মোর নাহি সাধে।
পসরা জে নিবে নেয়, ঘর জাএ রাধে॥

ইহা বলিয়া তিনি বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া গেলেন। আর সকলে তরুতলেই বসিয়া রহিল, এবং এই সুযোগে কৃষ্ণ রাধার নিকটে যাইয়া বলিলেন—

রাখিল তোমারে এই জমুনার তীরে।
দেখি কি করিতে পারে আইহন বীরে॥
ধরিল আঁচল হের ছাড়িয়া না দিব।
উচিত জে দান হএ এইখানে নিব॥

ইতিমধ্যে সেখানে বড়াই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া রাধা বলিলেন—

বুঝত বুঝত বড়াই কানুর গেয়ান।
কাহার নারীর হেন করে অপমান॥
এ বোল বলিয়া রাই কান্দে ঝরঝরে।
তা দেখি দয়াএ কানু ছাড়িল আঁচলে॥

তখন কৃষ্ণ বলিলেন—

আমা না চিনলী রাই অবুধ গোয়ালী।
আমি ত্রিভুবন সার দেব বনমালী॥

রাধা প্রত্যুত্তর করিলেন—

কহিয়া কি কাজ তোমার জানিল বেভার।
দেবতা নহিলে কেনে হবে ঘাটীয়াল॥

রাধার এই কথা শুনিয়া—

রাধার বচন কানু ভাবে মনে মনে।
বিসাইল কাণ্ডে যেন ঝুমিল হরিণে॥

তুলনীয়—

বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন

অতঃপর কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার নিকট পাঠাইতেছেন—

চল জাহ বড়াই বুঝাহ চন্দ্রাবলী।
আশ দিয়া দাস বলি রাখু বনমালী ॥

বড়াই আসিয়া কৃষ্ণের উক্তি "এককে শতেক করি কহে রাধা ঠাই।" তাহা শুনিয়া রাধা বলিলেন—

কহিয় কানুরে মিছা করে অভিলাসে।
রাধিকা কি শোভা করে রাখালের পাসে ॥
বিকশিত কমলে পতঙ্গ নাহি সাজে।
কাক নাহি শোভা করে কোকিলের মাঝে ॥
রাঙ্গের সহিত কভু হিরা নাহি যুড়ি।
কৃষ্ণ সঙ্গে মিলাইতে কাকে চাহ বুড়ি ॥

রাধার এই কথা বড়াই যাইয়া কৃষ্ণের নিকট বলিলে তিনি বড়াইর অনুমতি লইয়া রাধার নিকটে আসিয়া বলিলেন—

নন্দের নন্দন বলি আমা নাহি জানি।
মোর গুণ সব বেদ পুরাণে বাখানি ॥
ব্রহ্মাস্ত্র আমার বোল লঙ্ঘিতে না পারে।
ত্রিভুবনে সকল আমার অধিকারে ॥
আমি দেব বনমালী সংসারের সার।
ভূমি ভার খণ্ডাইতে আমার অধিকার ॥
সে আমি গোকুলপুরে ভ্রমিএ লীলাএ।
ত্রিভুবন থির নহে আমার মায়াএ।

পুরুব জনমে রাধা তুমি মোর নারী।
তেকারণে আপনা না বাসি তোমা স্মরি॥

ইহা শুনিয়া রাধা উত্তর করিলেন—

তোমার বচন কানু আকাশের ফুল।
শুনিতে মধুর বিচারিতে নাহি উন (মূল ?)॥
রাখাল হইয়া এথা খণ্ডাহ বিধাতা।
দানী হয়া ত্রিভুবনে ধর জয় ছাতা॥
যবে তুমি লক্ষ্মীনাথ বোলাহ দামোদরে।
তবে কেনে হেন মতি পাপ পরদারে॥
জাহার মহিমা বেদ পুরাণে ফুকরে।
সেবা কেনে চাহে পর নারী হরিবারে॥
ভাল লোক মুখে শুনি হেনক বিচার।
পরদার বই সে পাতক নাহি আর॥
অহল্যা হরিয়া ইন্দ্র গেল ছারখারে।
সীতা হরি রাবণরাজা সবংশে সংহারে॥
পায়ে পড়ি কানায়ি ঘুচাহ পরিহাস।
পরিজন শুনিলে করিবে সর্ব্বনাশ॥

ইহার পরে কৃষ্ণ নানা প্রকারে প্রেম-নিবেদন করিলে রাধা বলিলেন—

অলপ বএসে তোর এত কামাতুর।
বাপেরে বলিয়া কেনে বিভা নাহি কর॥
জদি বা আপনে বিভা করিতে না পার।
ভ্রমহ বৈরাগী হয়া দেশ-দেশান্তর॥

তথাপি কৃষ্ণ পুনরায় রাধিকার রূপের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন, তাহা শুনিয়া রাধা সখীগণের নিকটে চলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণ বড়ায়ির নিকট যাইয়া বলিলেন—

কানু কহে বড়াই মোরে কহত স্বরূপে।
জথা জাই তথা রাই একি অপরূপে ॥
বাহু পসারিয়া জাই দূরতে পালাএ।

তখন—

বড়ায়ির হাতে ধরি রসিক মুরারি।
বহুত বিলাপ করে রাধিকা সোঙারি ॥
না জিব না জিব বড়াই রাধার বিরহে।
তুষের আনল জেন পোড়ে সব দেহে ॥
অহন্নিশি রাধা রাধা করি প্রাণ জাএ।
সে কেনে দেখিয়া মুখ তুলিয়া না চাএ ॥
হের বড়াই আপন অভাগ্য করি বাসি।
একদিন রাধা মুখে না দেখিল হাসি ॥
এখন বচন মোর না শুনিল হেলে।
আমা সোঙারিব রাধা অবশেষ বেলে ॥
আজি হৈতে ছাড়িলু মুঞি বিষয় বিলাস।
রাধা লাগি কৈল আমি বৃন্দাবনে বাস ॥
ইষ্টরূপে ভাবি আমি রাধিকা যুবতী।
বিরহ আনলে দিব আপনা আহুতি ॥ ইত্যাদি

ইহা শুনিয়া বড়ায়ি বলিল—

রাধিকা তোমার নারী তুমি তার পতি।
ইহা বিঘটাতে পারে কাহার শকতি ॥
এক উপদেশ শুন নন্দের কুমারে।
আগে জমুনায় তুমি ধরহ কাণ্ডারে ॥

ইহার পরে নৌকাখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের মিলন সংসাধিত হইয়াছে। যমুনাতে নৌকা ডুবাইয়া কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ভাবে ও ভাষায় এবং

কল্পনায় ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে। ইহারই প্রতিধ্বনি অন্যান্য কবি-রচিত দান-খণ্ডের পালাতেও পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় এখানে আলোচিত হইল।

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে দানলীলা

(বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে সঙ্কলিত)

রাধা সখীগণের সঙ্গে যমুনাতে জল আনিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্বরাগের উদয় হয়। সেই সময়ে—

আচম্বিতে পথে কানু দেখিল বড়াই।

ইহার পরে কবি বড়াইর রূপ ও বেশের বর্ণনা করিতেছেন—

বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি।
পাকা চুলে রঙ্গ ফুলে বেন্ধেছে কবরী॥
সীথায় সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা।
শ্রবণে কুণ্ডল যেন দিনমণি ছটা॥
এ বৃদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
রসনা চাপনে নড়ে দশন সকল॥
স্বর্ণসূত্রে নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুই গোটা তার দোলে নাভিমূলে॥
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী অষ্ট অলঙ্কার।
গৌর বরণ রূপে অস্থি চর্ম সার॥
এক পদ চলে বুড়ী চার পদ বৈসে।
হাঁটু ধরি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাসে॥
অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ী পরে পীতাম্বর।
নড়ি ধরি দাঁড়াইল কানুর গোচর॥

তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

শেত চামর সম কেশে।
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।

কৃষ্ণ বড়াইকে দূতী নিযুক্ত করিয়া রাধিকার নিকটে পাঠাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রাধা বলিলেন—

মরগো বড়াই বুড়ী দুটি আঁখি খাও।
রাখালে ভজিতে মোরে যুকতি শিখাও॥
অন্য কেহ হেন বোল বলিত আমাতে।
ইহার উচিত শাস্তি দিতাম হাতে হাতে॥
তুমিত বড়াই আই তে কারণে সহি।
গৌরব রাখিনু আজি তুয়া মুখ চাহি॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা বড়াইকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখানে তাহারই প্রতিধ্বনি মিলিতেছে। এই পরিস্থিতির উপরে চৈতন্য-পরবর্ত্তী ভাবধারা যে ধীরে ধীরে কবি-মানসে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রয়াসে ব্যর্থমনোরথ হইয়া যখন বড়াই বলিল—

সে কানু মহিমা রাধে কি কহিব তোরে।
আগম নিগম বেদে না জানে তাহারে॥
মহামুনিগণ যাঁর অন্ত নাহি পায়।
সদাশিব যাঁর গুণ পঞ্চমুখে গায়॥
হেন প্রভু নিন্দিস্ যৌবন-অহঙ্কারে।
ঝুরিয়া মরিবে পাছে না ভজি কানুরে॥

তখন রাধা বড়াইর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। বড়াই যাইয়া নন্দকে বলিল—"কংস তোমাকে শাস্তি দান করিতে মনস্থ করিয়াছে, কারণ এখন আর তুমি গোয়ালিনীদিগকে মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে পাঠাইতেছ না।" ইহা শুনিয়া গোপবৃদ্ধগণ বড়ায়ের সঙ্গে গোপবধূগণকে মথুরায় পাঠাইতে স্বীকৃত হইল। তখন—

বড়াই সংহতি করি যত ব্রজনারী।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় চলে সারি সারি ॥
আগে পিছে গোপী মধ্যে বিনোদিনী রাই।
আগুয়ান হৈয়া পথে চলিল বড়াই ॥

কৃষ্ণ আসিয়া পথরোধ করিয়া দান চাহিলেন। রাধা বলিলেন—

সাক্ষাৎ ভাগিনা তুমি কি বলিব আর।
অন্য কেহ হৈলে শাস্তি করিতু তাহার।

কৃষ্ণ বলিলেন—

শুন রাধে আমি তোর না হই ভাগিনা।
আমি তোর নিজ পতি তুমি বরাঙ্গনা ॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরিস্থিতিতেই এই উক্তির সার্থকতা লক্ষিত হয়। সেখানে মুগ্ধা রাধাকে এই কথা বলিয়াই কৃষ্ণ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাধা বলিলেন—

তুমি যদি লক্ষ্মীকান্ত শুনহ কানাই।
তবে কেন এত লোভ গোপিনীর ঠাঁই ॥
অখিল ভুবনপতি বলিয়া বলাহ।
তবে কেনে বনে বনে গোধন চরাহ ॥

কিন্তু কৃষ্ণ—

হাসি হাসি ধরে কানু রাধার আঁচলে
বাহু পসারিয়া রহে মন্মথ-বিহ্বলে ॥

এত দেখি বৃষভানুরাজার নন্দিনী।
পসরা তুলিয়া বলে চলহ গোপিনী ॥

তখন তাহাকে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণ নানাভাবে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে—

রাধিকারে কোল দেয় কমলনয়ন।
কান্দে রাধা বিনোদিনী দুঃখী শ্যাম গান ॥

এই সময়ে বড়াই আসিয়া বলিল—

আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়।
তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্যামরায় ॥

ইহার পরে যমুনায় নৌকা ডুবাইয়া কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে দানখণ্ড

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত)

কবি বস্ত্র-হরণের পরে দান-লীলার পালাটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বস্ত্রহরণের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, এই জন্য মথুরায় গোরসাদি বিক্রয় করিতে যাইবার কালে কৃষ্ণকে পথে দেখিতে পারিবেন ভাবিয়া তাঁহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া—

শাশুড়ী স্বামীর ঠাঁই বলিল এই বোল।
ঘরে কেন নষ্ট হয় বাসী দধি ঘোল ॥
দশবিশ সখী মেলি যাব মথুরায় ॥
বেচিয়া আসিব সব গোরস তথায় ॥

এইভাবে তাঁহারা মথুবায় দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার অনুমতি লাভ করেন। তখন—

গোপীর প্রধানা রাধা চলে আগুয়ান।
ত্রিভুবন-রমণী জিনিয়া যার ঠান॥
চন্দ্রাবলী আদি সখী যায় কাছে কাছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চন্দ্রাবলী এখন রাধার সখীতে পরিণত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বত্রই রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, কিন্তু এখানে চন্দ্রাবলী পৃথক্ নায়িকা রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের ভাব-ধারার নিদর্শন মাত্র। যাহাই হউক কৃষ্ণ আসিয়া যখন দান চাহিলেন, তখন রাধা বলিলেন,—

রাই বলে আই আই এ বড় অদ্ভুত।
কেন হেন অপযশ কহে নন্দসুত॥
কভু নাহি শুনি দান যমুনার তীরে।

এবং আরও বলিলেন—

আপনার অপযশ আনিলে আপনি।
তুমি যশোদার পো, আমি মাতুলানী॥

কিন্তু কৃষ্ণ বার বৎসরের দান চাহিলেন। উত্তরে রাধা বলিতেছেন—

যোল বৎসর বয়স আমার বার বরিষের চাহ দান। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও কৃষ্ণ রাধার নিকট বার বৎসরের দান দাবী করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত গ্রন্থের প্রভাবই লক্ষিত হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধিকার পসার ধরিয়া টান দিলেন, তখন—

খসিয়া পড়িল বিড়া দূরে গেল ডালি।
কি কর কি কর বলি বুড়ি মারে তালি॥

এবং—

আই আই করিয়া ডাকেন বড়াই বুড়ি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই পালাতেও বড়াই আবির্ভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সকলের ঘৃত ঘোল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে দেখিয়া—

তা দেখি বড়াই হইল আগুন সোসর ॥
ক্রোধবুলী দন্তসারি আঁখি পাকাইয়া।
গোপালে মারিতে যায় লড়ি হাতে লইয়া ॥

এই জন্ম কৃষ্ণের হাতে তাহাকে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল। অবশেষে বড়াই গোপীগণকে লইয়া মথুরার দিকে অগ্রসর হইলে কৃষ্ণ নদী পার করিবার কালে যমুনায় নৌকা ডুবাইয়া রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

গুণরাজ খানের গ্রন্থে দানলীলাদি

১৪০৫ শকাব্দে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানি পুথি অবলম্বনে কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবিজয় সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে দানলীলাদির কোন প্রসঙ্গ নাই, কারণ ভাগবতে দানলীলা না থাকাতে এই গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৫৮ এবং ৬১৪৪ সং পুথিদ্বয়েও দানলীলা-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ৬৮ সংখ্যক পুথিতে দানলীলা, ও ভারখণ্ডের, এবং ১৩৬০ সংখ্যক পুথিতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনা রহিয়াছে। এই সকল আখ্যায়িকায় সর্ব্বত্রই বড়াই বুড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬৮ সংখ্যক পুথির বর্ণনায় দেখা যায় যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এক ফুলের বাগানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে রাধা এবং তাঁহার সখীগণ যাইয়া ফুল তুলিয়া আনিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হয়, আর রাধা প্রমুখ গোপীগণও কৃষ্ণকে দেখিয়া মোহিত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে এই ফুলবাগানের বর্ণনা রহিয়াছে। সখীগণ সহ রাধাও সেখানে ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে গোপীগণের পুষ্পচয়নের আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, রাধাকে দেখার পরে—

কৃষ্ণ মহর্চ্চিত ভেল ঘরে গেল রাই।
এথেক দেখিআ তথাত রহিল বড়াই ॥

তখন কৃষ্ণ বড়াইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ চাহি বড়াই জিজ্ঞাসা কিছু করি।
কি নাম এহার হএ কাহার সুন্দরি ॥

রাধা বৃষভানুর নন্দিনী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে, কৃষ্ণ বড়াইর নিকট তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া বড়াই বলিল—

কানাই আবেস দেখি বড়াই জে বোলে।
দান হলে থাক জাই কদম্বের তলে ॥

তৎপর বড়াই গোকুল নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন বড়াই বলিল—

সবে মিলি চল কালি দধি বিকি ছলে।
তথাতে দেখিবা কৃষ্ণ কদম্বের তলে ॥

যখন এই ব্যবস্থা অনুযায়ী গোপীগণ মথুরার দিকে যাইতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কানু বলিলেন—

কানু বোলে জথচিত দান আমি চাই।
লেখা করি দেহ জথ আছে তুমা ঠাই ॥
রাই বোলে জদি তুমি হইআ থাক দানি।
ঘরে জাইতে দিব দান করি বিকিকিনি ॥

কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন "রাজার দুহাই রাধা চন্দ্রাবলি বোলে"।

সেই সময়ে—

কৌতুকে আঁচল ধরি ত্রিদশের নাথ।
ঠেলাঠেলি ছলে কুচে দিল নখঘাত ॥

মার্জিত-রুচি পাঠক ইহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ কিভাবে এই সকল পালাতে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য ইহা উদ্ধৃত হইল। অবশেষে বড়াই আসিয়া বলিল—

কানাই জে নাতি হএ রাধিকা নাতিনি।
দুই আমার আপ্ত হএ ভিন্ন নাহি জানি॥

বড়ায়ের সহিত রাধাকৃষ্ণের এইরূপ সম্পর্কের উল্লেখ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেই পাওয়া যায়। অবশেষে বড়াই ব্যবস্থা করিয়া দিল—

বড়াই বোলে কানাই পার কর তুমি।
ফিরিবার কালে দান দিআ জাইব আমি॥

এইভাবে দানলীলার পরেই নৌকালীলার অবতারণা করা হইয়াছে। পার হইবার কালে নৌকা ডুবিল, এবং গোপীগণের বস্ত্র-অলঙ্কার সব ভাসিয়া গেল। অবশেষে সকলে হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ অলঙ্কারাদি প্রত্যর্পণ করেন। এখানে বস্ত্রহরণের প্রভাব লক্ষিত হয়। তারপর গোপী-গণ পার হইলে কৃষ্ণ বলিলেন—

হাসিআ বোলএ কৃষ্ণ শুনহ যুবতি।
দান না পাইলে আমি জাহিব সংহতি॥

তখন বড়াই বলিল—

বড়াই বোলেন কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
রাধা সঙ্গে জাইবা পসার লহ এইক্ষণ॥
চিনিতে তুমারে জেন কেহ নাহি পারে।
যুবতি সঙ্গতি চল কান্দে করি ভারে॥

অতএব নৌকালীলার পরে এই ভারখণ্ডের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই পর্য্যায়ে এই সকল লীলা বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। গুণরাজ খাঁ অথবা

অন্য কোন ব্যক্তি ইহা রচনা করিয়া থাকিলেও সেই সময়ে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শই গৃহীত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর দানলীলা

এই পালার প্রথম পদটিতেই দেখা যায় যে, কৃষ্ণ আসিয়া রাধার সহিত রাত্রি যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং পরদিন যে তাঁহারা দান সাধিবার ছলে গোষ্ঠে মিলিত হইবেন, এইরূপ পরামর্শও স্থিরীকৃত হইয়াছিল—

পুরুব সঙ্কেত করিতে বেকত
তাহার লাগিয়া ভেল ॥

এই সঙ্কেতের অর্থ পরে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

ইঙ্গিত কটাক্ষে কহিয়া চলিল
রসিক নাগর কান।
মথুরার পথে বিকি অনুসারে
সাধিতে চলিলা দান ॥

অতএব উভয়ের সম্মতিতেই এই লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা প্রকৃত-পক্ষে অভিসারের প্রকারভেদ মাত্র। রাধিকা "গবাক্ষে বদন দিয়া" কৃষ্ণকে দেখিলেন, এবং তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া সখীকেও দেখাইলেন, পরে সাজ-সজ্জা করিয়া—

বড়ায়েরে ডাকি কহে চন্দ্রমুখী
যাইব মথুরা পানে।

অতএব এই পালাতেও বড়ায়ের অবতারণা রহিয়াছে। প্রচলিত পদাবলীতে দান ও নৌকালীলা ব্যতীত আর কোন পালাতেই বড়ায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না, অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই বড়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আসিয়া পরবর্ত্তী কবিগণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়া

বসিয়াছে। দান ও নৌকালীলার পদ যাঁহারাই রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বড়াইকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যাম-নামমালা জপিতে জপিতে
আনন্দে চলে তথাই॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পরম বিরাগকে অনুরাগে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য যে দানলীলাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, এখানে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। রাধাকে এখানে আমরা প্রগল্‌ভা নায়িকার পর্য্যায়ে পাইতেছি—যাহার চিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহখণ্ডে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যেখানে শেষ হইয়াছে, পরবর্ত্তী পদাবলী সেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব। রাধার ভাব, কান্তি গ্রহণ করিয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পরে আর কোন বৈষ্ণব কবি রাধার বিরাগের কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যে মার্জ্জিত রুচির এখন আমরা বড়াই করি তাহাও এই কারণ-সম্ভূত।

যাহাই হউক—

শ্যাম-পরসঙ্গ বড়াই সহিতে
কহিয়ে চলিয়ে যায়।

এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে—

কানু কহে শুন গোপী আমার বচন।
দান দিয়া মথুরাতে করহ গমন॥

তখন গোপীগণ বলিলেন—

এই পথে মোরা করি আনাগোনা
কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
কেবা কড়ি দিবে হেথা॥

এবং রাধা বলিলেন—

রাধা বলে শুন বেদনী বড়াই
বড়ই বিষম শুনি।
এ পথে জগাত ঘাটে ঘাটিয়াল
কখন নাহিক জানি॥

তুলনীয়—

এতকাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞি দানী এহা বাটে॥
(কৃঃ কীঃ, ১ম সং, ৫৯ পৃঃ)।

তৎপর রাধা বলিতেছেন—

যে বলে জগাতি তাহে যায় জাতি
কুলেতে বজর পড়ি।

অথচ এই পালাতে ইহার পূর্ব্বে কৃষ্ণ একমাত্র "রাজার হাসিল কড়ি" দান স্বরূপ চাহিয়াছেন, যুবতীর যৌবন নহে। অতএব রাধার এই উক্তির সার্থকতা নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যায়িকাটি এই সময়ে এতই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কবি স্পষ্টভাবে কিছু না লিখিয়াও ঐ সকল ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ যুবতীর যৌবন দান স্বরূপ চাহিয়াছেন, ইহা ভাষায় প্রকাশ করিবার সাহস কবির হয় নাই। অথচ তিনি যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আদর্শস্বরূপ গ্রহণ না করিলে, তাহা অসম্পূর্ণই

থাকিয়া যায়। ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী মার্জিত রুচির নিদর্শন মাত্র। বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ রাখিয়া এইভাবে সুরুচির পরিচয় দেওয়া কাব্যাংশে দোষণীয়। ইহার পরেও কবি রাধার বেশভূষার উল্লেখ করিয়াই দান দাবী করাইয়াছেন, কখনও যৌবন যাচ্ঞা করান নাই। যাহাই হউক, নানা প্রকার কথা কাটাকাটির পরে—"শ্যাম ধরি রাই-হাথে বসায়ল তরুর ছায়ায়," অর্থাৎ রাধার অভিসারের উদ্দেশ্য সফল হইল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন—

আইস ধনি রাধা তুমি তনু আধা
অন্তরে বাহিরে ভাবি।
এবং—গোলক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ-অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥

অর্থাৎ চৈতন্য-পরবর্ত্তী ধর্ম্মতত্ত্ব কৃষ্ণের মুখ দিয়া উৎসারিত করা হইয়াছে। একই পালা বিভিন্ন যুগে আসিয়া কিভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণের সখাসখীগণের নামকরণ হয় নাই (পদকল্পতরুর ভূমিকা দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই পালাতে রহিয়াছে—

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবল চলিয়া গেলা।
ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিলা
পাতিতে দানের ছলা॥

অতএব এই পালাটি যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের উল্লেখ

যখন ইহাতে রহিয়াছে, তখন এই কবিকে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় না।

বড়াই চণ্ডীদাসের নূতন সৃষ্টি। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রাধাকৃষ্ণ লীলা পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী প্রভৃতির সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দান ও নৌকা-লীলার ব্যাপারে সর্বত্রই বড়াই বুড়ীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চৈতন্যদেব যে দান-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতেও নিত্যানন্দ প্রভু বড়ায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের দান ও নৌকাকীলার পদে, ভবানন্দের হরিবংশে এবং যাবতীয় কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যে বড়ায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবই লক্ষিত হয়।

উদ্ধবসংবাদ ও হংসদূত

উদ্ধবসংবাদের আখ্যায়িকা মূলতঃ ভাগবতের অন্তর্গত। কৃষ্ণ যে মথুরা হইতে উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৬-৪৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী ইহা অবলম্বন করিয়া "উদ্ধবসন্দেশ" নামক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। ভাগবতের আদর্শে রচিত হওয়াতে রূপের গ্রন্থে যে, উক্ত পুরাণ-বর্ণিত আখ্যায়িকার সাদৃশ্য লক্ষিত হইতে পারে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। কিন্তু তিনি স্বীয় গ্রন্থে অনেক নূতনত্বেরও সমাবেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় ভাগবতের ভাবানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থেও যে উদ্ধবের এই আখ্যায়িকা স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই সকল গ্রন্থের অনেক পালা পৃথক্‌ভাবেও প্রচারিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে অনেকস্থলেই এই জাতীয় বিচ্ছিন্ন পালাগুলি মূল গ্রন্থেরই অংশবিশেষ মাত্র, অতএব ইহাদিগকে পৃথক্ গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে

না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শঙ্কর কবিচন্দ্রের উদ্ধবসংবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা তাঁহার গোবিন্দমঙ্গলের অন্তর্গত একটি পালামাত্র। কবি নিজেও বলিয়াছেন—

ব্যাসের ভাষিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।
দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধবগমনে॥

ক: বি: ৭১৮ সং পুথি, ১৭ পৃ:

কবি ইহা বলিলেও তাঁহার গ্রন্থে অনেক নূতনত্বের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ধব বৃন্দাবনে আগমন করিলে পর যশোদা যেভাবে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

ঘরে ঘরে ডাকিয়া বেড়ায় নন্দরাণী।
কার ঘরে আছ বাছা ইন্দ্রনীলমণি॥
একবার রাখ প্রাণ মোরে দেখা দিয়া।
অভাগিনী মায়ে ডাকে বিকল হইয়া॥
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ফাটয়ে আমার।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ জীবনকুমার॥
ক্ষীর সর ননী সব রেখেছি যতনে।
আইস বাছা দিব ননী তোমার বদনে॥
হেদেগো শ্রীদামের মা, শুন মোর বাণী।
তোমার ঘরেতে কিগো আছে নীলমণি॥
গোপ গোপীগণে রাণী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
আমার কানাই আছে তোমাদের ঘরে?
পুনরপি নন্দরাণী গৃহেতে আসিয়া॥
উদ্ধব নিকটে পড়ে আছাড় খাইয়া॥

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, ২৬৩-৪ পৃ:

যশোদার এইরূপ আক্ষেপ ভাগবতে বর্ণিত হয় নাই। রূপ গোস্বামীর উদ্ধব-সন্দেশেও কৃষ্ণ উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিতেছেন, এই বর্ণনাই রহিয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কোন আখ্যায়িকা তাহাতে স্থানলাভ করে নাই। অতএব বলিতে হইবে যে, ভাগবতের মূল আখ্যায়িকার সহিত ইহা যোজনা করিয়া গ্রন্থের বৈচিত্র্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

গোপীগণ এক হংসকে দূত করিয়া মথুরায় কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, ইহাই হংসদূতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পালা রচনাকারিদিগের মধ্যে নরসিংহই বোধ হয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই উভয় পালাই রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নরসিংহের উদ্ধবসংবাদ

এই কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, দ্বিজ নরসিংহ ও নরসিংহ দাস একই ব্যক্তি. কারণ তাঁহার উদ্ধব-সংবাদে দুই প্রকার ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে, যথা—

নরসিংহ দ্বিজ কয় শুন যশোমতি।
অন্তরে ভাবনা করি দেখ যদুপতি॥

ক: বি: ১০০০ সং পুথি, পৃ: ৪

অন্যত্র—

গোপীর চরণ বহু করি মনে আশ।
উদ্ধব-সংবাদ কহে নরসিংহ দাস॥

ঐ, ১১ পৃ:

অতএব বুঝা যাইতেছে যে কবি দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত তিনি "দাস" আখ্যা গ্রহণ করিয়াও ভণিতা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১০০ সং পুথিতে নরসিংহ কর্ত্তৃক রচিত রূপ

গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির আংশিক অনুবাদের "উজ্জ্বল-কিরণ" নামে এক গ্রন্থের অনুলিপি রহিয়াছে। তাহাতে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন —"ভাগ্যবন্ত মিশ্র পুত্র নরসিংহ দাস" (ঐ, ১৯ পৃঃ)। অতএব তিনি যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এক নরসিংহ দাস রচিত হংসদূতের পুথিও পাওয়া যাইতেছে। রূপ হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, অতএব কবির নাম সাদৃশ্যে মনে হয়, যিনি হংসদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনিই বাঙ্গালা উদ্ধবসংবাদের রচয়িতা, অর্থাৎ একই কবি রূপের এই দুইখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার আরও কারণ রহিয়াছে।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—ভক্তিরত্নাকরের দশম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য্যের খেতুরীর সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব উপলক্ষে নরোত্তম ঠাকুরের আলয়ে গমন-প্রসঙ্গে তাঁহার সহচর প্রধান শিষ্যগণের উল্লেখ আছে, উহাতে—

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥

এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।" (তরুর ভূমিকা, ১৩১ পৃঃ)

নরোত্তম-বিলাসেও খেতুরীতে সমাগত ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত লোকদিগের মধ্যে নৃসিংহ কবিরাজের উল্লেখ রহিয়াছে—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥

ঐ, বহরমপুর সং, ৮৬ পৃঃ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই সময়ে নৃসিংহের কবি-খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তিনি বিশ্বাস-ভাজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত নরসিংহের হংসদূতের ৯৮২ সংখ্যক পুথির অনুলিপির তারিখ ১০৭৫ সাল বা ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। অতএব কবির প্রাচীনত্বের নিদর্শনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার পক্ষে শ্রীনিবাসের শিষ্য হওয়া অসম্ভব নহে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে আটজন কবিরাজের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে নৃসিংহ অন্যতম। তাঁহাদের মধ্যে রামচন্দ্রকে অবশ্যই ব্যবসায়ের জন্য কবিরাজ বলা হইত। কিন্তু গোবিন্দ দাস কবিত্বের জন্য বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক কবিরাজ আখ্যায় ভূষিত হইয়া ছিলেন। কবি কর্ণপুরেরও কবিত্বের জন্য কবিরাজ উপাধি হইয়াছিল। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় "কবিরাজ মিশ্র বন্দ ভাগবতাচার্য্য" পাওয়া যায়। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাঁহার উপাধি ছিল "কবিরাজ"। জয়দেবকেও অনেকে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের পক্ষেও কবিরাজ উপাধি লাভ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু নরসিংহ যিনিই হউন না কেন, তিনি যে শঙ্কর কবিচন্দ্রের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নরসিংহের উদ্ধবসংবাদের প্রথম ভাগে আছে—

গোকুলে গোপীর সঙ্গে যত কৈলা লীলা।
সে সব স্মঙরি কৃষ্ণ অবস হইলা॥
সজল নয়ন দুটি বৃন্দাবন ভাবে।
নিজ কর্ম্মকথা কৃষ্ণ কহেন উদ্ধবে॥
শুন শুন মর্ম্মকথা প্রাণের উদ্ধব।
আমার লাগিয়া প্রাণ ধরে গোপী সব॥ ইত্যাদি

(কঃ বিঃ ১০০০ সং পুথি, ১ পৃঃ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কবিচন্দ্রের উদ্ধবসংবাদের ৭১৮ সংখ্যক পুথিতে এবং মুদ্রিত গোবিন্দ-মঙ্গলেও এই পালাটি নগণ্য পরিবর্ত্তনের সহিত এইভাবেই আরম্ভ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র পালাটিতে একই প্রকার রচনা পাওয়া যায়। নরসিংহ ধারাবাহিক রূপে দীর্ঘ পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবিচন্দ্রের পালাতে দেখা যায় যে, তিনি ইহা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া ভণিতা প্রদান করিয়াছেন। ১০০০ সংখ্যক পুথিতে আছে—

কৃষ্ণ তোমার পুত্র নহে জানিহ অন্তরে।
মনুষ্য হইয়া কেবা গিরিরাজ ধরে॥
এতেক বচন যদি উদ্ধব বলিল।
শুনিয়া সে নন্দরাণী দিব্যজ্ঞান পাইল॥
পুনর্ব্বার উদ্ধবে কহেন নন্দরাণী।
কহ বাছা কোথা মোর প্রাণ যাদুমণি॥

(ঐ, ৩ পৃঃ)

কিন্তু কবিচন্দ্রের গ্রন্থে পাওয়া যায় (মুদ্রিত সং, ২৬৪ পৃঃ)—

কৃষ্ণ তোমার পুত্র নহে জানিহ অন্তরে।
মনুষ্য হইয়া কেবা গিরিরাজ ধরে॥
এতেক বচন যদি উদ্ধব বলিল।
শুনিয়া সে নন্দরাণী দিব্যজ্ঞান পাইল॥

ইহার পরেই তিনি ভণিতা দিয়াছেন—

ব্যাসের ভাবিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।
উথলিছে শোক-নদী নহে নিবারণে॥

তৎপর—

উদ্ধব যোগের তত্ত্ব রাণীকে বুঝালো।
যত শোক নন্দরাণী সব পাশরিল॥

এই দুই পঙ্‌ক্তি রচনার পরে পুনরায়

পুনর্ব্বার উদ্ধবেরে কহেন নন্দরাণী।
কহ বাছা কোথা কৃষ্ণ প্রাণ যাদুমণি ॥

ইত্যাদি ক্রমে নরসিংহের রচনার অনুরূপ পালা আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এক কবি অপরের রচনা-কৌশল আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখন কে কাহার পরবর্ত্তী তাহা অনুসন্ধান করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নরসিংহের হংসদূতের ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। কবিচন্দ্রের গোবিন্দ-মঙ্গল দুর্জ্জন সিংহের রাজত্ব কালে প্রায় ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় (কবিচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। অতএব তাঁহাকে নরসিংহের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয়, কবিচন্দ্র নরসিংহের রচনা নিজের নামে চালাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

শিবরামের উদ্ধবসংবাদ

গৌরপদতরঙ্গিণী ও পদকল্পতরুর ভূমিকায় এক শিবরাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে! ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে নরোত্তমের শিষ্য এক শিবরাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার ॥

পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে শিবরামের অনেক পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন এই শিবরামের পক্ষে উদ্ধবসংবাদ রচনা করাও অসম্ভব নহে।

শিবরামের গ্রন্থে কিছু নূতনত্ব রহিয়াছে। তিনি শুকদেবের মুখে পরীক্ষিতকে উদ্ধবসংবাদ শুনাইয়াছেন, যথা—

গঙ্গাতীরে যোগাসনে রাজা পরীক্ষিত।
ব্রহ্মশাপে অভিসিক্ত হৃদএ কম্পিত॥
কহ শুকদেব মুনি দিন বয়্যা যায়।
সপ্তাহ হইল পূর্ণ না দেখি উপায়॥
না বুঝিয়া ব্রাহ্মণে করিলাম অপমান।
পরকালে কিরূপে পাইব পরিত্রাণ॥
শুকদেব বলে রাজা না কর রোদন।
উদ্ধব-সংবাদ কথা করহ শ্রবণ॥

ক: বি: ১৬৮০ সং পুথি, ১পৃ:

আবার গ্রন্থশেষে—

শুকদেব বলে ইহা পরীক্ষিত-স্থানে।
উদ্ধবসংবাদ কথা হইল সমাধানে॥

কবি ব্রহ্মণ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়—

গুরুভক্তি দেহ দ্বিজ শিবরামে কয়।
যার যেই ভাব তার লাভালাভি হয়॥

(ঐ, ৯ পৃ:)।

অন্যত্র—দ্বিজ শিবরামে কয়, যদি পার কর নিজগুণে।

(ঐ,৯ পৃ:)।

কবির উদ্ধবসংবাদ প্রধানত: ভাগবত অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছিল।

কবি পঞ্চাননের উদ্ধবসংবাদ

কবির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু ভণিতায় তিনি মুকুন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

শ্রীমুকুন্দ-পদদ্বন্দ্ব চিত্তে তারি আশ।
বিরচিলা পঞ্চানন শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

এই "মুকুন্দ" শব্দে নারায়ণকেও বুঝাইতে পারে, নতুবা তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের শিষ্য ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবি চৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গৌরভক্তবৃন্দের বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

তৎপর— মধুপুরে অবস্থিত দেব জগৎপতি।
নানা সুখে আছে প্রভু সভার সংহতি॥
বালবৃদ্ধ যুবা আদি মধুপুরে বৈসে।
কৃষ্ণ দরশন করে মনের হরিষে॥
এইরূপে বড় সুখে সর্ব্বজন আছে।
একদিন উদ্ধব গেলেন কৃষ্ণ কাছে॥

ক: বি: ৪৬৫৪ সং পুথি, ১-২ পৃ:

তখন কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে যাইতে অনুরোধ করিয়া বৃন্দাবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বড়ায়ের উল্লেখ রহিয়াছে ; যথা—

তালবন মধুবন খেজুরের বন।
দেখিবে বড়াই তথা আছেন কেমন॥

ঐ, ৩পৃ:

পালাটি ক্ষুদ্র, মাত্র ১০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ইহার আর কোন বিশেষত্ব নাই।

নরসিংহের হংসদূত

গ্রন্থের নাম দেখিয়াই বুঝা যায় যে, কবি রূপ গোস্বামীর হংসদূতের ভাবানুবাদ করিয়াছেন, বস্তুত: ঐ গ্রন্থের সহিত ইহার আখ্যায়িকার কিছু সাদৃশ্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কবি হংসদূত-কাব্য দাস গোস্বামীর রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

হংসদূত ইতিহাস দাস বিরোচন।
নরসিংহদাস কহে শুন সর্ব্বজন॥

ক: বি: ৯৮৩ সং পুথি, ৫পৃ:

আবার গ্রন্থের বন্দনা অংশে নরোত্তমের ভণিতাও পাওয়া যাইতেছে, যথা—

গোপীর বিরহ-কথা না যায় কথন।
শ্লোক ছন্দে দাস গোসাঞির বর্ণন॥
সংস্কৃতে করিল গ্রন্থ বুঝয়ে সুজনে।
মুর্খে ইহার কথা না জানে মরমে॥
দাস গোস্বামী জীউর চরণ বন্দিয়া।
ভাষা ছন্দে কহি কিছু তত্ত্ব না জানিয়া॥
শ্লোক ছন্দ শুনি মোর হইল প্রীতি আশ।
হংসদূত কথা কহে নরোত্তম দাস॥

আমরা হংসদূতের কয়েকখানি পুথি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাদের সবগুলিতেই নরোত্তমের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। বোধহয় লিপিকারগণ নরসিংহকে নরোত্তমে পরিণত করিয়াছেন, নতুবা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নরোত্তম হংসদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নরসিংহ এই বন্দনার অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রূপ গোস্বামীর হংসদূতের আখ্যায়িকা এই—কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে গোপীগণ বিরহে কাতরা হইয়া যমুনার তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে তাঁহাদের পূর্ব্ব লীলাস্থলগুলি দেখিয়া রাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ললিতার শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইলে একটি হংস যমুনার জলে দৃষ্টিগোচর হইল। তখন ইহাকে সম্বোধন করিয়া ললিতা তাঁহাদের দুঃখের কথা বর্ণনা করিয়া হংসকে দূতরূপে কৃষ্ণের নিকট গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হংসের গমন-পথ নির্দ্দেশ করিবার কালে ব্রজের বিবিধ লীলাস্থল এবং মথুরার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার ললিতার উক্তিতেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। হংস মথুরায় গিয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। চারি চরণের ১০১টি সংস্কৃত শ্লোকে রূপের গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

নরসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া হংসদূত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে অনেক নূতনত্বেরও সমাবেশ রহিয়াছে। হংস দর্শন পর্য্যন্ত আখ্যায়িকা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব লইয়াই রচিত হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে যে গোপীগণের বারমাসী বর্ণিত হইয়াছে তাহা রূপগোস্বামীর গ্রন্থে নাই। দশম অধ্যায়ে দেখা যায়, ললিতা কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত পথে হংস মথুরার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তৎপর তাহার মথুরায় গমন, কৃষ্ণের নিকট গোপীদিগের সংবাদ জ্ঞাপন, এবং কৃষ্ণের প্রত্যুত্তর প্রদানের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। কৃষ্ণ বলিতেছেন—

রাধার অন্তরে বান্ধা আছিএ সদাই।
কোন সন্তোষ এথা থাকিতে নাহি পাই॥
পূর্ণচন্দ্র চৌদ্দকলা তাহার অন্তরে।
দুই কলা লয়্যা আছি মথুরা নগরে॥
ললিতারে কহিবে এ সব কাহিনী।
রাধারে করিতে বল্য মুরুলির ধ্বনি॥

রাই-মুখে হইব যখন বংশী আকর্ষণে।
অন্তর হইতে কৃষ্ণ বেরাাব তখনে ॥

ক: বি: ৯৮৩ সং পুথি, ১৫ পৃ:

কৃষ্ণের এই সংবাদ লইয়া আসিয়া হংস গোপীগণের সন্তোষ-বিধান করিয়াছিল। এই সকল আখ্যায়িকা নরসিংহের কল্পনা-প্রসূত।

উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল

পদ-রচয়িতা উদ্ধব দাস সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"কবির অপর নাম কৃষ্ণকান্ত; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন; বাড়ী টেঞা (বৈদ্যপুর)।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২৯৩ পৃ:)। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন—"পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস অম্বষ্ঠকুল-সম্ভূত ও টেঞা বৈদ্যপুর নিবাসী। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইনি শকাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক, ইত্যাদি।" পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশ রায় মহাশয়ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে একটি পদের ভণিতায় কবি লিখিয়াছেন—

শ্রীল রাধাবল্লভ চাঁদ রায় প্রেমার্ণব
চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ যার ধন-সম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধব দাস ॥

ইহা হইতে বুঝা যায়, নরোত্তমের শিষ্য চাঁদরায়ের পরবর্ত্তী কালে কবি আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, এবং তিনি রাধামোহনের শিষ্য। অতএব কবি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধারণা করা

যাইতে পারে। রাধামোহন পরকীয়া মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের ১৬৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) উদ্ধবানন্দ ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া রাধিকা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন—

মনে মনে কৃষ্ণচন্দ্র ভাবয়ে হৃদয়।
পরকীয়া বিনে প্রেম না হয় উদয়॥
সতত যাহারে দেখি এক গ্রাম বাসে।
রাগ শান্তি হয় তার অনুরাগ কিসে॥
দূরে থাকি যত রাগ, নিকটে না হয়।
অপূর্ব্ব হইলে প্রেম বহুত বাড়য়॥
যার ঘরে ধন থাকে, ক্ষুধা শান্তি তার।
নির্ধন পুরুষের ক্ষুধা বাড়য়ে অপার॥

অতএব কবি এখানে স্বীয় গুরুর মত সমর্থন করিয়াছেন।

১৩০৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ১৯৭-২২৫ পৃঃ)। তাহাতে দেখা যায়, রাধা জন্মলাভ করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নারদ যাইয়া গোলোকে কৃষ্ণকে ইহা জ্ঞাপন করিলে তিনি ছদ্মবেশে আসিয়া রাধার নিকট দাঁড়াইলেন, তখন প্রেমময়ী চক্ষু মেলিয়া কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করেন। পালাটি ক্ষুদ্র হইলেও কবি ইহাতে রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—রাধার রূপ-বর্ণনায়—

এক চান্দ গগনে, আর চান্দ মহীতলে।
সোনার চান্দ উদয় কৈল কৃত্তিকার কোলে॥
নিষ্কলঙ্ক সোনার চান্দের গৌরব টুটিল॥

অন্যত্র—

কেহ বলে হেন রূপ কোথাও না দেখি।
হেন মনে করে গলে পদক করে রাখি॥

চাইতে না পারে কেহ ঝলমল করে।
গগন ছাড়ি চান্দ কি নামিল ভূতলে॥

(ঐ, ২১৫ পৃঃ)

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার আদর্শীভূত প্রেমের পরিকল্পনায় এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীতেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে, যথা—

শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥ ইত্যাদি

(দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী, ৬৫৬ পৃঃ)

দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকা-মঙ্গল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭৬২ সংখ্যক পুঁথিতে ইহার অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রারম্ভ এইরূপ :—

রাধার মঙ্গল গীত করহ শ্রবণ।
রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিলা ভঞ্জন।
বৃকভানু সুতা রাই বিরল মন্দিরে।
কেহো পাছে শুনে বলি কান্দে ধীরে ধীরে॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে যা করিলে শ্যাম।
তোমার লাগিয়া হৈল কলঙ্কিনী নাম॥

রাধার এই দুঃখ জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ তাহা মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি অসুখের ভাণ করিলেন, এবং বৈদ্যের ছদ্মবেশে আসিয়া বলিলেন যে, সহস্রছিদ্রযুক্ত কুম্ভে কোনও সতী নারী জল আনিয়া দিতে পারিলে কৃষ্ণ রোগমুক্ত হইবেন। জটিলা প্রভৃতি অনেকেই চেষ্টা করিয়া

অকৃতকার্য্য হইলে অবশেষে রাধিকা জল আনিয়া দিলে কৃষ্ণ নিরাময় হইলেন। গ্রন্থশেষে ভণিতা এই প্রকার :—

রাধিকা-মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
এত দূরে রাধার মঙ্গল হইল সায়॥

পুঁথি খানি ক্ষুদ্র, দশপত্রে সম্পূর্ণ। তারিখ ১১০১ সাল। ইহা রাধার কলঙ্কভঞ্জনের পালা, রাধিকা-মঙ্গল নামে প্রচারিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন

বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণে (ঐ, ১।১, পৃ: ৫৪-৫৬) এইরূপ একটি পালা মুদ্রিত হইয়াছে। "শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছার অপনয়ন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।" ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়, যথা—

চণ্ডীদাসে বলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥

রচনার নমুনা—

রাণী বলে বৈদ্যরাজ আমি ত না চিনি।
কি ঔষধে ভাল হয় আমার নীলমণি॥
রাণী বোলে—বৈদ্যরাজ নাম ধর।
নীলমণিকে রক্ষা কর॥
বৈদ্য বোলে নন্দরাণী কহি তোমার ঠাঁই।
কত ধন দিবা রাণী তাহা বোল চাই॥
রাণী বোলে নন্দপুরে জত রত্নমণি।
সকল দিলাম আমি যাদব নিছনি॥
এই সব ধন জদি মনে নাহি ধরে।
দাসী কর্য়া নিয়া যাও নন্দ-যশোদারে॥

রাধাকে জল আনিতে বলিলে তিনি বলিতেছেন—

রাধা বোলে কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি
সব লোকের ঠাঁই।
কেমনে আনিব জল যমুনাতে যাই॥
নিবেদি তোমার ঠাঁই।
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বলি খোটা দেহি মোরে॥
দুঃখ নিবেদিতে যাই।
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
যশোদায়ে বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥

কৃষ্ণরামদাসের রাধিকা-মঙ্গল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০৮২ সংখ্যক পুঁথিতে ইহার অনুলিপি পাওয়া যায়। পত্র সংখ্যা ১-২০। ইহা প্রকৃত পক্ষে উদ্ধব-সংবাদের পালা। যথা—

পুনরপি কহে হরি উদ্ধব সখাদি।
তুমি মোর প্রাণ-সখা জনম অবধি॥
তুরিতে চলিয়া যাও গোকুল-নগরি।
কহিও রাধার আগে আসিব মুরারি॥
জশোদা জননি মোর বাপ নন্দ ঘোষ।
মধুর বচনে সব করিবা সন্তোষ॥

(পৃঃ ২)

পরি-সমাপ্তিতে—

একমনে যেবা শুনে রাধিকা-মঙ্গল।
সর্ব্ব পাপ নাশ তার শরীর নির্ম্মল॥
এসব শুনিতে যার মনেতে উল্লাস।
শমন দমন করি বৈকুণ্ঠে নিবাস।
কৃষ্ণরাম দাস কহে রাধিকা-মঙ্গল।
শুনিলে পাতক হরে শরীর নির্ম্মল॥

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে (ঐ, ১।১, ৬৮ পৃঃ) এই ভণিতাটি এই ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে—

কৃষ্ণরাম দন্তে বোলে রাধিকা-মঙ্গল।
শুনিলে পাতক নাশে শরীর নির্ম্মল॥[1]

বৃন্দাবনদাসের রাধিকামঙ্গল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬০০ সংখ্যক পুঁথিতে ইহার অনুলিপি রক্ষিত আছে। গ্রন্থখানি ১৯৫ পত্রে সম্পূর্ণ। লিপির তারিখ ১২৬২ সন (১৮৫৫ খৃঃ) গ্রন্থের প্রথম ভাগেই কবি রাধাকৃষ্ণের বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের—

লতাপাতা বন্দো বিন্দাবনে যার বাস।
সভাই প্রসন্ন হয়্যা পূর অভিলাষ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ বুদ্ধিবল।
রচনা করিএ কিছু রাধিকামঙ্গল॥
দ্বিজ বৃন্দাবনে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
সভে মিলি আশাপূর্ণ করহ আমারি॥

তৎপর গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়া কবি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—

শিষ্য কহে শুন গুরু করি নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে রাধিকা-জনম ॥
কার ঘরে জন্ম হইল কেবা মাতা পিতা।
কোথা বা বিবাহ দিল কাহার বনিতা ॥
কিরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে হইল পীরিতি।
কিবা গুণ রাধিকার কেমন মূরতি ॥

গুরু কথা আরম্ভ করিলেন—

এককালে ভাস্কর ভাবনা করি মনে।
বাঞ্ছা করি গেলা তেঁহ তপস্যা কারণে ॥

তাঁহার তপস্যা দেখিয়া—"ইন্দ্র আদি দেবগণে হইল কম্পমান।" অবশেষে তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ বর দিতে আগমন করিলে সূর্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন—

এমন অপত্য মাগি মোর মনে বড় আশ।
সদত থাকহ যেন তুমি তার বশ ॥
কৃষ্ণ কহে আমি বশ কেবল রাধার।
প্রাণের অধিক তিহু হয়েন আমার ॥
প্রকট হইব আমি ভকত কারণে।
করিব মাধুরী রস জেয়্যা বৃন্দাবনে ॥
গোকুলে নন্দের ঘরে জনমিব আমি।
সম্পিতি বৈশ্য কুলে জনমহ তুমি ॥
সেখানে হইবে তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
বৃকভানু নাম তোমার হইব খিয়াতি ॥

বিবাহ করিবে তুমি গোপের বালিকা।
পরম সুন্দর তিহু নাম যে কীর্ত্তিকা॥
তার গর্ভে হইবেক রাধার জনম।
তার বশ হই আমি তিহু মোর প্রাণ॥ (৪ পৃঃ)

তৎপর পুরাণ অনুসরণ করিয়া দেবগণের প্রার্থনায় কৃষ্ণজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। পরে শুভক্ষণে রাধাঠাকুরাণী জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া—

বৃকভানু বলে বিধি কি লিখিলা ভালে।
হেন রূপবতী কন্যা আঁখি নাহি মেলে॥
সোনার প্রতিমা হেন কন্যার মূরতি।
দুগ্ধ নাহি খায় আর কি করি যুগতি॥

সেই সময়ে যশোদা কৃষ্ণকে কোলে লইয়া রাধিকাকে দেখিতে আসিলেন, তখন রাধা চক্ষু মেলিয়া সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করেন। ইহার পরে রাধার নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্যলীলা, অভিমন্যুর সহিত বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃত ভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

যদি ভানুরাজ কন্যা কৃষ্ণে সমর্পয়।
স্বকীয়া তাহার কহি পরকীয়া নয়॥
পরকীয়া ভাব স্থায়ী রাখিয়ে যতনে।
অতেব বিবাহ দিল অভিমন্যু সনে॥

উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গলেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে। রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক পরকীয়া-মত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়া

থাকিবে। এই অধ্যায়ের শেষে কবি গ্রন্থরচনার কারণ বিবৃত করিয়াছেন। যথা:—

অল্প কালে পুত্রশোক কৃষ্ণ দিল মোকে।
দিবারাত্রি নাহি জানি সদা থাকি দুখে॥
নিশাকালে নিদ্রা যাই নেত্রে ধারা বয়।
বিকল বিষাদে প্রাণ সদত্ত দহয়॥

কবির দুঃখ দেখিয়া রাধিকা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রাধিকামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহার পরে গ্রন্থের পরবর্ত্তী অংশে পৌর্ণমাসী, বৃন্দা দেবী এবং ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতিকা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, ইন্দুরেখা প্রভৃতির সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রীতির লীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০৮২ সংখ্যক পুঁথিতে ইহার এক অনুলিপি রক্ষিত আছে। পত্রসংখ্যা ১-২০। প্রারম্ভ—

সাবধানে শুন ভাই রাধিকামঙ্গল।
যাহার শ্রবণে হয় শরীর নির্ম্মল॥
ব্যাসের সংহিতা ভাগবত অনুসারে।
রচিল পাঞ্চালী কিছু ভক্তি করিবারে॥

ব্যাসদেব জন্মেজয় নৃপতিকে গল্পচ্ছলে বলিতেছেন, কি করিয়া উদ্ধব গোকুলে আসিয়া গোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ দৈবকীর বন্ধন মোচন করেন এবং উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন সময় রাধিকার রূপগুণের কথা মনে পড়াতে তাঁহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং তিনি উদ্ধবকে দূতস্বরূপ

বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। উদ্ধবকে দেখিয়া যশোদা পুত্রবিচ্ছেদে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনধারণের বর্ণনায় রহিয়াছে—

সদয় হইয়া বোলে দেব নারায়ণ।
কি করিতে পারি তোমা সহস্রলোচন॥
ঈষৎ হাসিয়া বোলে যশোদানন্দন।
বাম করে ধরিয়া তুলিলা গোবর্দ্ধন॥
অবহেলে ধরিয়া তুলিলা নরহরি।
কান্ধে করি লইলেন ছত্রপ্রায় করি॥
পর্ব্বতের আড়ে কৈলা যতেক গোয়াল।
কিবা ঝড় কিবা বায়ু আছিল জঞ্জাল॥
নাইক অন্যথা কিছু ইন্দ্রে পাইল লাজ।
মেঘগণ লইয়া ইন্দ্র গেল নিজ রাজ॥

তৎপর উদ্ধব যশোদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাধিকার গৃহে আসিলেন। উদ্ধবকে দেখিয়া বিরহিণী রাধা নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন—

নয়নে কালিয়া চাঁদ আছিল কিশোর।
কামিনী মোহন বেশে চিত্ত নিল মোর॥
যমুনার জলে যাইতেক যত জন।
বাজায় মোহন বাঁশী থাকি বৃন্দাবন॥
শরীর পুলক হএ মুরলীর সানে।
মরম বিদরে মোর মদনের বাণে॥
কি খেনে পীরিতি কৈল চিকণিয়া কালা।
গলায় বান্ধিয়া দিলুঁ কলঙ্কের মালা॥
আমার পরশমণি বিধি নিল হরি।
হেন সাধ করে মনে বিষ খাইয়া মরি॥

তৎপর অন্যান্য গোপীগণও কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যমুনা-বিহার হইতে সমগ্র লীলা বর্ণনা করিলেন। পরে উদ্ধব রাধিকাকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

আমারে পাঠাইল হরি করিয়া যতন।
তোমার বিচ্ছেদে প্রভু বিষাদিত মন॥
বিষাদ না ভাব মনে আর নাই ব্যজ।
অবিলম্বে আসিবে দেখিবা যুবরাজ॥
জগৎজননী মাতা তুমি ভাগ্যবতী।
তোমার মহিমা কৈয়ে কাহার শকতি॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী গোলক ঈশ্বরী।
যার অনুগত চিত্ত আপনি মুরারি॥

ইহার পরে উদ্ধব বিদায় লইয়া মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের মিলন এই পুঁথিতে পাওয়া যায় না। কবির ভণিতা—

কৃষ্ণরাম দত্তে কহে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে পাতক হরে শরীর নির্ম্মল॥

নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ

এই গ্রন্থের পরিচয় "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে" প্রকাশিত হইয়াছে। (ঐ ১-১, ৫, ২০২, ২৫৭ পৃঃ, এবং সাহিত্য ১৩০৭, ৫৫৯-৫৭৩, ৬০৬-৬০৯ পৃঃ দ্রঃ)। গ্রন্থকার নরোত্তম ঠাকুর। বর্ণিত বিষয়—"শ্রীকৃষ্ণ একদিন চন্দ্রাবলীর বাড়ীতে রজনী যাপন করিয়াছিলেন। এই দোষেই শ্রীমতী মানিনী রাধিকা সুন্দরী মান করিয়া বসিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সাগ্রহ কাতর প্রার্থনা, ললিতা

বিশাখাদির উপরোধ অনুরোধ কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে যোগিবেশে গিয়া রাধার নিকটে মানভিক্ষা চাহিয়া লন।" রচনার নমুনা এইরূপ—

মান করিয়া রাধে বসেছে বিরলে।
ধড়া চূড়া বান্ধি কৃষ্ণ গেল হেনকালে॥
সমুখে দাঁড়াইল কৃষ্ণ পূরিয়া মুরারি।
আড়নয়ানে গৌরী শ্যাম অঙ্গ নেহারি॥
হেদেগো ললিতা সখী।
কালরূপ না হেরব্যা আঁখি॥
শুনগো ললিতা সখী বলিয়ে স্বরূপ।
আর না হেরিব আমি কালা কানুরূপ॥
কালা বিষে জর জর হইল মোর তনু।
আমার আঙিনা হইতে যাইতে বল কানু॥
না হেরিব চিকন কালা।
অন্তরে বিষের জ্বালা॥
কালা সঙ্গে প্রেম আমি না করিব আর।
আপ্ত জ্ঞান অন্তরে নাহিক যাহার॥
পরের বেদনা যেই কিছুই না জানে।
তার সঙ্গে প্রেম করি মরি কি কারণে॥ ইত্যাদি

অন্যত্র—

নারী হৈল চক্রপাণি।
বৃন্দার বচন শুনি॥
দিব্য বেশ আভরণ করিল প্রচুর।
চরণে পরিলা হরি বাজন নূপুর॥

কালরূপ অঙ্গরাগ কৈল হরিতালে।
বনমালা তেজি গলে দিল রত্নমালে॥
ললাটে সিন্দুর ফোঁটা।
যেন রবি করে ছটা॥
সুচারু নারীয়া বেশে বানাইল বেণী।
মেঘের আড়েতে যেন ঘন সৌদামিনী॥ ইত্যাদি

ক্রিয়াযোগসার

পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসার অবলম্বনে অনেক কবি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, কবিগণ প্রধানতঃ উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত মাধব ও চন্দ্রকলার আখ্যায়িকাটিই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই মূল আদর্শকে অনুসরণ করা হইয়াছে। কবিগণের মধ্যে ১। প্রাণনারায়ণ, ২। রামসুন্দর, ৩। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়, ৪। অনন্তরাম দত্ত, ৫। রামেশ্বর নন্দী, ৬। হরেন্দ্র নারায়ণ, ৭। রিপুঞ্জয়, ৮। দ্বিজ রঘুরাম, ও ৯। দ্বিজ শচীনন্দের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রাণনারায়ণ সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এক প্রাণনারায়ণ কোচবিহারে ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোচবিহারের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে—"মহারাজ বীরনারায়ণ রাজ্যে শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রযত্নে তাহা অঙ্কুরিত এবং ক্রমশঃ শাখাপল্লবে সুশোভিত মহীরুহে পরিণত হইয়া সুফল প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী হইতে সভাসদগণ পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কৃতভাষী ছিলেন, এবং তাঁহার একটি "পঞ্চরত্ন" পণ্ডিত সভা ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ প্রাণ-নারায়ণের আজ্ঞায় কবিরত্ন "রাজখণ্ডম্" নামক রাজবংশের একখণ্ড ইতিহাস

সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। এই রাজার আজ্ঞায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত "বিশ্বসিংহচরিতম্" কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীনাথের লিখিত আদিপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-পুথি কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। এই সময়ে দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ, এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র "প্রহ্লাদচরিত্র" রচনা করিয়াছিলেন। বিশারদ কবি কর্ত্তৃক বিরাটপর্ব্ব এবং কর্ণপর্ব্ব অনুবাদিত হইয়াছিল। দামোদরচরিত অবলম্বনে লিখিত "গুরুলীলার" রচয়িতা রামরায়ও সেইসময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কবিতারচনায় এবং গীতবাদ্যেও তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থও ছিল, যাহার সাহায্যে রাগরাগিণী এবং তালমান সম্বন্ধে পাঠকের প্রচুর জ্ঞানলাভ হইত। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলি পরবর্ত্তিকালে গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে।" (কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ)। পরবর্ত্তীকালে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণও ক্রিয়াযোগসারের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নাম সাদৃশ্যে আমাদের মনে হয় কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণই বোধ হয় ক্রিয়াযোগ-সার রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলি গৃহদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসার

এই গ্রন্থ জৈমিনি ও ব্যাসদেবের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টি-বিবরণ, তৃতীয় অধ্যায়ে জৈমিনি কর্ত্তৃক ক্রিয়াযোগ জিজ্ঞাসা, গঙ্গামাহাত্ম্যকীর্ত্তন, চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়াগমাহাত্ম্য, ষষ্ঠ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে পুনরায় গঙ্গামাহাত্ম্য, নবম হইতে

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিষ্ণুপূজার বিধিব্যবস্থা, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে রামনামমাহাত্ম্য, পঞ্চদশ হইতে উনবিংশ অধ্যায়ে হরিভক্তি-মাহাত্ম্য, বিংশ ও একবিংশ অধ্যায়ে দানমাহাত্ম্য, দ্বাবিংশ হইতে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে একাদশীমাহাত্ম্য, চতুর্বিংশ অধ্যায়ে তুলসী-মাহাত্ম্য, এবং ষড়বিংশ অধ্যায় কলিযুগ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক অধ্যায়েই নানাপ্রকার আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত মাধব ও চন্দ্রকলার উপাখ্যানটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

তালধ্বজা নামে এক নগরী ছিল। ঐ নগরীর রাজার নাম বিক্রম এবং মহিষীর নাম হারাবতী। মাধব নামে তাঁহাদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এই কুমার একদিন মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে এক যুবতীকে সরোবরে স্নান করিতে দেখিতে পান। যুবতীর রূপে বিমোহিত হইয়া কুমার তাহার নিকটে প্রেমনিবেদন করিতে যাইয়া নিজের পরিচয় প্রদান করেন। তখন ঐ রমণী বলিলেন যে, তাঁহার নাম চন্দ্রকলা, এবং তিনি সুবাহুরাজার পত্নী। সমুদ্রপাড়ে প্লক্ষদ্বীপ নামে এক পুরী আছে। গুণাকর ইহার রাজা, এবং তাঁহার কন্যার নাম সুলোচনা। সে অপূর্ব্ব রূপবতী, চন্দ্রকলা তাহারই দাসী। চন্দ্রকলা আরও বলিলেন যে, উক্ত সুলোচনাই কুমারের পত্নী হইবার উপযুক্তা। এই কথা শ্রবণ করিয়া মাধব এক অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এক মালাকার পত্নীর বাড়ীতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মুখে শুনিলেন যে বিদ্যাধর নামে এক রাজকুমারের সহিত সুলোচনার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে এবং সেই দিনই তাহার অধিবাস হইবে। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সুলোচনার নিকটে এক পত্র লিখিয়া মালাকার পত্নীকে প্রেরণ করেন। পত্র পাইয়া সুলোচনা গোপনে আসিয়া মাধবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাহার রূপে বিমোহিত হন। তিনি বলেন যে, বিবাহের সময়ে বিদ্যাধরকে প্রদক্ষিণ করিয়া যখন তিনি বামভুজ উত্তোলন করিয়া থাকিবেন, তখন যেন

মাধব তাহাকে অপহরণ করেন। এদিকে মাধব সেই সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাহার ভৃত্য প্রচেষ্ট রাজকুমারের অশ্বে আরোহণ করিয়া বিবাহমণ্ডপ হইতে সুলোচনাকে লইয়া পলায়ন করে। দেশে উপস্থিত হইয়া প্রচেষ্ট সুলোচনার নিকটে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া প্রচেষ্ট যখন বিবাহের আয়োজনের জন্য প্রস্থান করিল তখন রাজকুমারী অশ্বে আরোহণ করিয়া সুসেন নামক রাজার দেশে যাইয়া উপস্থিত হন। সেখানে পুরুষের বেশ গ্রহণ করিয়া তিনি বীরবর নামে নিজের পরিচয় প্রদান করেন, এবং বলেন যে তিনি দুঃসাধ্য কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। কিছুদিন পরে সেই রাজ্যে এক গণ্ডার আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। রাজার আদেশে বীরবর সেই গণ্ডারকে হত্যা করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দেন। এইরূপে রাজকন্যাকে লাভ করিয়া বীরবর গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে যাইয়া নারায়ণের আরাধনায় রত হইলেন, এবং নিজের ভৃত্যগণকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ এখানে আত্মহত্যা করিতে আসিলে তোমরা তাহাকে বন্দী করিবে। সুলোচনার বিরহে প্রথমতঃ প্রচেষ্ট প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে বীরবরের ভৃত্যগণ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে। তৎপর বিদ্যাধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও বন্দী হইলে বীরবর তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অবশেষে আসিলেন মাধব। বীরবর তাহাকে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে তিনি সুসেন রাজার নিকটে নিজের ইতিহাস বর্ণনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয়কন্যা সুলোচনাকে মাধবের হস্তে প্রদান করেন। ইহাই পঞ্চম অধ্যায়ের আখ্যায়িকা।

প্রাণনারায়ণ ও রামসুন্দরের ক্রিয়াযোগসার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮৩২ সংখ্যক পুথিতে রামসুন্দরের, এবং ৬১২৪ সংখ্যক পুথিতে প্রাণনারায়ণের ক্রিয়াযোগসারের অনুলিপি রক্ষিত আছে। গ্রন্থদ্বয় মূল অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। উক্ত পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত চন্দ্রকলার উপাখ্যানে তাঁহার রূপে বিমোহিত মাধব বলিতেছেন—

স্তনদ্বয় স্বর্ণবর্ণ হৃদিমধ্যে সাজে।
কক্ষদেশে জলকুম্ভ তাহে কি বিরাজে॥
দিবাকর-তাপে ভূমি তাপিত হৈয়াছে।
জবার কলিকা পদাঙ্গুলি যে হৈয়াছে॥
আমার দর্শনে তব দুসুখ অবসানে।
হইল তোমার গো সুন্দরি এতদিনে॥
আমাকে ভজহ তুমি প্রীতযুক্ত হৈয়া।
কক্ষদেশ হৈতে শীঘ্র কুম্ভ তিয়াগিয়া।

(রামসুন্দরের পুথি, ২৬ পৃঃ)

ইহারই মূলে রহিয়াছে—

পয়োধরৌ সাতকুম্ভ-কুম্ভৌ বহসি বক্ষসা।
কক্ষেণ জলকুম্ভঞ্চ কোমলাঙ্গীদমদ্ভুতম্॥
দিবাকরতাপাত্যন্তসন্তপ্তে পথি লোহিতা।
পদাঙ্গুল্যস্তবাভান্তি জবানাং কালিকা ইব॥
সুভ্রু ত্বং ভজ প্রীত্যা ত্যজ কুম্ভং বরাঙ্গনে।
তব দুঃখাবসানোঽভূন্মম দর্শনমাত্রতঃ॥

(ঐ, ৫।৩২-৩৪)

আর ইহারই অনুবাদে প্রাণ-নারায়ণ লিখিয়াছেন—

পয়োধর কুম্ভ আর কুম্ভ কটিদেশে।
জল লেহ কোন লাজে লোকে উপহাসে॥
সূর্য্য তেজে পদ্মমুখ লোহিত বরণী।
পদের অঙ্গুলি রক্ত জবা-কলি জিনি॥
কুম্ভ তেজি প্রিয়া মোরে ভজ প্রীত মনে।
তোর দুঃখ দূর গেল মম দরশনে॥

(৬১২৪ সং পুথি, ১৪ পৃঃ)

বিবাহ-মণ্ডপ হইতে সুলোচনা অন্তর্হিত হইলে তাঁহার পিতার প্রে: মন্ত্রিগণ বলিতেছেন—

কেহ মন্ত্রী বলে শুন কহি আমি বিবরণ
সাপে লক্ষ্মী জন্ম হৈয়াছিল।
মনুষ্যে বিবাহ কেন হইবেক সেই জন
সেই হেতু অন্তর্দ্ধান হৈল॥
অপরে বলয়ে আর শুন কথা সারোদ্ধার
মায়াময়ী সুলোচনা নারী।
তব গৃহে জন্ম হৈয়া মায়া পুন দেখাইয়া
গেল রাজা দেশ পরিহরি॥
কেহ মন্ত্রী পুন বলে বসি সেই সভাতলে
মোর মনে এই অভিপ্রায়।
চন্দ্রতুল্য মুখ দেখি রাহু এখানে আসি
গ্রাস করি নিজ গৃহে যায়॥

৪৮৩২ সং পুথি, ৪৫ পৃঃ)

অপর পুথিতে আছে—

কেহ বোলে শাপ পাইয়া লক্ষ্মী জন্মিছিল।
তোমাকে ভাণ্ডিয়া পুনি বৈকুণ্ঠেতে গেল॥
কেহ বোলে মায়া করি ছিল তোমার ঘরে
মায়া দর্শাইয়া গেল আপন মন্দিরে॥
কেহ বোলে চন্দ্র জিনি মুখ-শোভা তার।
চন্দ্রে কিবা নিয়াছে পত্তয় জানিবার॥

(৬১২৪ সং পুথি, ২১ পৃঃ)

ইহারই মূলে আছে—

কেচিদ্বদন্তি সা লক্ষ্মীঃ শাপেনাগত্য ভূপতে।
তদীয়ং সৌধমেতর্হি স্বয়মন্তরধীয়তে॥
মায়াময়ী সা রমণী মায়য়া তদ্‌গৃহেস্থিতা।
মায়াং স্বীয়া দর্শয়িত্বা গতেত্যন্যে বদন্তি বৈ॥
তন্মুখং চন্দ্রবন্মত্বা বিনিন্দ্যাত্মালমাত্মনা।
কেচিদ্বদন্তি চন্দ্রো নীতা স্বপ্রতিপত্তয়ে॥
বদন্ত্যন্যোঽপি সা কন্যা রাহুণা দীর্ঘবাহুনা।
ভ্রান্ত্যা চন্দ্রমসো গ্রস্তা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা॥ (ঐ, ৫।২৮৬-২৯১)

তুং—চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস॥ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

এই দুই কবি-সম্বন্ধীয় আর কোন বিবরণ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না, কারণ উভয় পুথিই খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইঁহাদের ভণিতা এইরূপ—

জয়মুনিকে কহিছিলা ব্যাস শিরোমণি।
রচিলা সে বাক্য শ্লোকবন্দে সুতমুনি॥

পয়ার রচিয়া সেই শ্লোক অনুসারে।
প্রাণনারায়ণ কহে লোকে বুঝাবারে॥ (ঐ, পৃঃ ১৩)

এই গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে।

অন্যত্র—ব্যাসদেব চরণ মস্তকে বন্দিয়া।
শ্রীরামসুন্দর কহে পয়ার করিয়া॥

সংবাদপত্রের সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা) কলুটোলা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কৃত পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগ-সারের ভাষা পয়ারের এক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে অনন্তরাম দত্ত রচিত ক্রিয়া-যোগসারের বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ১-১, পৃ-৬-৮; ১-২, পৃ-৫২)। এই কবি সম্বন্ধে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্ল্লভ, কবি দুর্ল্লভের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি 'বিশারদ' উপাধিবিশিষ্ট কোনও লোকের শরণ লইয়া ক্রিয়া-যোগ-সার লিখিয়াছেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ষষ্ঠ সং, ৪২৮ পৃঃ)। কবির সুদীর্ঘ পারিবারিক বিবরণ 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ১-১, পৃঃ ৭)। উক্ত গ্রন্থের ৫১৫ সংখ্যক পুঁথির পরিচয়ে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"৩৫শ পত্র পর্য্যন্ত মাধব ও সুলোচনার কাহিনী শুনিতেছি। মাধবের বিবাহ-বাসর হইতে প্রচেষ্ট নামক কোনও সেবক সুলোচনাকে হরিয়া নিয়াছিল; মাধব নানা কৌশলে সুলোচনাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিল। আমরা আজও ক্রিয়াযোগসার পাঠ করিতে অবসর পাই নাই, তাই জিজ্ঞাসা করি, সুলোচনার হরণ বৃত্তান্তাদি কি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত?" ক্রিয়াযোগ-সারের যে বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,

মাধব ও সুলোচনার কাহিনী উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কবির ভণিতা এইরূপ :—

সেই শ্লোক বাখ্যান করিয়া পদ বন্ধে।
রচিল অনন্তরাম হরি-গুণানন্দে॥

অথবা—কহেন অনন্ত দত্তে কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি সেই দীনহীন মতি
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ॥

সংস্কৃত ক্রিয়াযোগসারের ২৬ অধ্যায়ের পরিবর্তে এই গ্রন্থ ষোড়শ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। রচনার নমুনা এইরূপ[১] :—

তদন্তরে নৃপসুত চিন্তিয়া মনেতে।
পত্র এক লেখি দিল পুষ্পক মালাতে॥
শুন সুলোচনা কন্যা অতি রূপবতী।
মাধব আমার নাম নৃপতি-সন্ততি॥
হারাবতী গর্ভে জন্ম বিক্রম ঔরসে।
তালধ্বজ পুরী নাম বসি সেই দেশে॥
মৃগ অন্যাসনে আমি গেছিলাম বনেতে।
চন্দ্রকলা সনে দেখা আছিল তথাতে॥
সেই কন্যা রূপবতী হএ তোমার দাসী।
তোমা রূপগুণ সেই কহিল বিমরশি (?)॥

১। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার গ্রন্থাগারের ৫১৫ সংখ্যক পুঁথি হইতে এই কয় পঙ্‌ক্তি নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

রূপগুণ তোমার শুনিআ তার স্থানে।
সমুদ্র লঙ্ঘিআ আইলুম তোমা অভ্যাসনে॥
তোমার সরণ লইলুম শুন রাজসুতা।
বর তেজি বর আমা না কর অন্যথা॥
তোমা রূপগুণ না জানে অন্যজনে।
পঙ্কজের গুণ না জানে অলি বিনে॥
আপ্ত-বিবরণ সব লেখিআ পত্রেতে।
সোবর্ণ অঙ্গুরি দিলা মালিনীর হাতে॥
তদন্তরে মালিনীএ সেই পত্র লইআ।
রাজকন্যার হস্তে দিল সঙ্কোচিত হইআ॥ ইত্যাদি

ইহারই মূল আদর্শে রহিয়াছে :—

এতদ্বিচিন্ত্য মনসা মাধবোঽসৌ পুনঃপুনঃ।
মালাপুষ্পচ্ছদে সর্ব্বং বৃত্তান্তং ব্যলিখৎ সুধীঃ॥
কন্যে মাধবনামাহং কুমারো ধরণীপতেঃ।
তালধ্বজাধিরাজস্য বিক্রমস্য মহাত্মনঃ॥
ত্বচ্চেটী তত্র কাপ্যস্তি কন্যে চন্দ্রকলাহ্বয়া।
তয়া তব গুণগ্রামঃ কথিতো মৎপুরোঽখিলঃ॥
তদ্‌গুণগ্রামসংলগ্নচিত্তোঽহং নিম্নগার্ণবম্‌।
বিলঙ্ঘ্য তুরগারূঢ়ঃ সমায়াতঃ পুরীং তব॥ ইত্যাদি

(শ্লোক সং ১০২—৫)

ইহা ব্যতীত রামেশ্বর নন্দী কর্ত্তৃক রচিত ক্রিয়াযোগসারের এক পুঁথির পরিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অতি সংক্ষেপে মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ১৩০৫, পৃঃ ১৯৭)। ইহাতে কবির ভণিতা এবং গ্রন্থের প্রারম্ভ ও শেষসূচক একটি করিয়া পদ মুদ্রিত রহিয়াছে। অতএব তাহা হইতে কবির রচনার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিয়াযোগসারের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা হইতে চারিজন নূতন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে প্রথম হইতে চতুর্থ, এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চম অধ্যায়, এবং নবম হইতে ত্রয়োদশ, ও অষ্টাদশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় রিপুঞ্জয় নামক এক কবি রচনা করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ হইতে সপ্তদশ অধ্যায় দ্বিজ রঘুরামের রচনা। ইহা ব্যতীত দ্বিজ শচীনন্দন নামে এক কবিও যে ক্রিয়াযোগসারের অন্ততঃ পঞ্চম অধ্যায়টি রচনা করিয়াছিলেন তাহারও সন্ধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

আমার পিতার প্রিয় মন্ত্রী গুণবান।
দ্বিজকুলে জন্ম শচীনন্দন আখ্যান॥
সুলোচনা মাধবের প্রস্তাব পয়ার।
করিছেন সেহি মন্ত্রিবর গুণাধার॥
এ কারণ আমি সে প্রস্তাব সমুদায়।
না করিলাম পদ সে যে পঞ্চম অধ্যায়॥
অন্যের কীর্ত্তির নষ্ট নিষ্টে না করেন।
নীতিশাস্ত্রাদিত হেন নিষেধ আছেন॥

(৫৭৭—৭৮ শ্লোক)

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত গ্রন্থে শচীনন্দনের রচনার পরিবর্ত্তে রিপুঞ্জয়ের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। অতএব শচীনন্দনের রচনা সম্বন্ধে ইহার বেশী আর আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। অন্যান্য কবিগণের রচনার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হে জৈমিনি শুনিলে সে পবিত্র আখ্যান।
সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয় সেহি জন॥

চন্দ্রবংশ অবতংস মনোভদ্র নাম।
নরেন্দ্র প্রবর গুণাকর পুণ্য ধাম॥
মহীতলে মহেন্দ্র সমান পূর্ব্বে ছিল।
সর্ব্ব ধর্ম্মময় সদাশয় বীর্য্যশীল॥
প্রেয়সী মহিষী তার হেমপ্রভা নামা।
অতি পতিব্রতা সতী সুচারু মধ্যমা॥

[হরেন্দ্রনারায়ণের রচনা] (ঐ, ১৮ পৃঃ)

ইহা মূলের ১৭ হইতে উনিশ শ্লোকের অনুবাদ। রিপুঞ্জয়ের রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সুলোচনার পিতার প্রশ্নে মন্ত্রিগণ বলিতেছেন :—

এক গুণতন্ত্রী মন্ত্রী বলিল সে বেলা।
শাপ পায়া আসিয়াছে ভূতলে কমলা॥
বুঝি তার শাপমুক্ত হইল অখন।
অন্তর্ধান হয়া গেল আপন ভুবন॥
মায়াময়ী সে রমণী মায়াশ্রয় করি।
তোমার গৃহেতে ছিল হে নৃপ কেশরী॥
স্বকীয় মায়াক তাঞ করায়া দর্শন।
অন্তর্ধান হৈল কৈল মন্ত্রী একজন॥
ওহে নৃপ গুণাধার তোমার কন্যার।
বদন মণ্ডল ছিল পূর্ণচন্দ্রাকার॥
আপনার তনু মনে মানি কলাকর।
আহরণ করি নিল আপন নগর॥
হে ভূপ তোমার দুহিতার সুখমুখ।
দর্শন করিয়া বিধু মনে পায় দুঃখ॥
দীর্ঘবাহু রাহু করি সে মুখ দর্শন।
ভ্রান্ত হয়া চন্দ্র বলি করিছে গ্রহণ॥ (মুদ্রিত গ্রন্থ ৬৫—৬৬ পৃঃ)

দ্বিজ রঘুরামের রচনার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভগবানের স্তুতিতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

জগৎপালক তুমি অখিলের পতি।
ত্রিদশবৃন্দের বন্দ্য তোমাক প্রণতি ॥
যমল অর্জ্জুন মহাবল দুয়োজনে।
বধিয়াছ তাক তুমি নন্দ-নিকেতনে ॥
দুষ্ট কালযবন বধিছ আর ধেনু।
তোমাক প্রণমি নবঘনশ্যাম তনু ॥
গোকুল-রক্ষার হেতু তুমি জনার্দ্দন।
নখাগ্রে ধারণ করি আছ গোবর্দ্ধন ॥
শক্রার্চ্চিত পদযুগ জগৎ-নায়ক।
ব্রজকুল সমস্তের উৎসব-দায়ক ॥
শ্রীদামের বন্ধু তুমি সুহৃদ অনন্ত।
ইন্দ্রের বিভূতি দাতা তুমি ভগবন্ত ॥

(মুদ্রিত গ্রন্থ ১৫৮ পৃঃ)

হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে এবং তাঁহার মন্ত্রিগণের সাহায্যে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে গীতাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডে ক্রিয়াযোগসার, এবং পঞ্চম খণ্ডে রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি বৃহদ্ধর্মপুরাণেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহার উৎসাহে মহাভারত, স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তর খণ্ড, এবং হিতোপদেশের অনুবাদও রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ রচনার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সর্ব্বত্রই সংস্কৃত মূল গ্রন্থ অনুসৃত হইয়াছে। ইহা আক্ষরিক অনুবাদের পর্য্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে মূলানুযায়ী এইরূপ অনুবাদের নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া যায়।

জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত কাশীখণ্ডের অনুবাদ

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থসমাপ্তির কাল এই ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে—

সন ১২২০ সালে
ছত্রে বস্তা বর্ষাকালে
শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীর যাম।
সমাপ্ত পুস্তক হয় পূরিল মনস্কাম॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ-রচনার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিবরণে ১৭১৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ গ্রন্থসমাপ্তির কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক জয়নারায়ণ যে ভারতচন্দ্রের অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র কাশীখণ্ড অবলম্বনে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত ব্যাসকাশী পালা রচনা করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণের রচনার সহিত তুলনা করিলে কবিত্বের হিসাবে ভারতচন্দ্রের রচনা যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে জয়নারায়ণ যথাসম্ভব মূলের অনুবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মূলে আছে—

ব্যাস উবাচ। শৃণু সূত মহাবুদ্ধে যথা স্কন্দেন ভাষিতম্।
ভবিষ্যং মম তস্যাগ্রে কুম্ভযোনে মহামতে॥ ১॥
স্কন্দ উবাচ। নিশাময় মহাভাগ ত্বং মৈত্রাবরুণে মুনে।
পারাশর্য্যো মুনিবরো যথা মোহমুপৈষ্যতি॥ ২॥
ব্যাস বেদান্মহাবুদ্ধির্নানাশাখাপ্রভেদতঃ।
অষ্টাদশ পুরাণানি সূতাদীন্ পরিপাঠ্য চ॥

কাশীখণ্ড, ৯৫ অধ্যায়।

ইহারই অনুবাদে জয়নারায়ণ লিখিয়াছেন—

দ্বৈপায়ন কহিলেন শুন ওহে সুত
আমার যে ভবিষ্যত কথা।
ষড়ানন যে কহিলা, ঘটোদ্ভব প্রতি
তোমারে তা কহিব সর্ব্বথা ॥
কার্ত্তিক কহেন ব্যাস শাখা ভেদ করি
চারি বেদ পৃথক করিলা।
অষ্টাদশ পুরাণাদি প্রকাশ করিয়া
সূত আদি শিষ্যে পড়াইলা ॥

—জয়নারায়ণের কাশীখণ্ড, ৩২৩ পৃঃ

অন্যত্র মূলে আছে—

বিনতা প্রাহ তং পুত্রং সম্প্রহৃষ্টতনূরুহা।
ভো সুপর্ণার্ণবং তূর্ণং যাহি মঙ্গলমস্তুতে ॥ ৬৩ ॥
সন্তি তত্রাপি বহুশো নিষাদ মৎস্যঘাতিনঃ।
বেলাতটনিবাসাশ্চ তান ভক্ষয় দুরাত্মনঃ ॥ ৬৪ ॥
পরপ্রাণৈঃ নিজপ্রাণান্ যে পুষ্ণন্তীহ দুর্ধিয়ঃ।
শাসনীয়াঃ প্রযত্নেন শ্রেয়স্তচ্ছাসনং পরম্ ॥ ৬৫ ॥

কাশীখণ্ডঃ, পঞ্চাশ অধ্যায়।

ইহারই অনুবাদে জয়নারায়ণ লিখিয়াছেন—

লোমাঞ্চিতা হৈয়া পুন কহেন বিনতা ॥
হে সুপর্ণ দক্ষিণ অর্ণবে যাহ তূর্ণ।
সেই স্থানে মৎস্যখাতি নিষাদ সম্পূর্ণ ॥
সিন্ধুতটে সে সকলে বসতি জানহ।
সেই সর্ব্ব দুরাশয় ভক্ষণ করহ ॥

পরপ্রাণে নিজ প্রাণ পোষণ যে করে।
তাহার শাসন শ্রেয়ঃ পরম বিচারে॥

কাশীখণ্ড, ১৮৪ পৃঃ

এইভাবে প্রত্যেক অধ্যায়ের শ্লোকগুলির ভাব অবলম্বনে জয়নারায়ণের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তিনি অনূদিত শ্লোকসংখ্যাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যথা—

ভূখ শশী শ্লোক পরিমাণ।
বায়ান্ন অধ্যায় সমাধান॥

প্রকৃতপক্ষে কাশীখণ্ডের দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায় ১০১ শ্লোকেই সম্পূর্ণ হইয়াছে। উদ্ধৃত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মূলের অনুবর্ত্তী হওয়াতে জয়নারায়ণের রচনা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদে যে সরসতার নিদর্শন পাওয়া যায়, জয়নারায়ণের রচনায় তাহা সম্পূর্ণই দুর্লভ।

দেবীভাগবতের অনুবাদ

কৈলাস বসুর "মহাভাগবত" পুরাণের বঙ্গানুবাদ

দ্রষ্টব্য :—পুরাণের মধ্যে দুইখানি ভাগবত পুরাণ আছে—কৃষ্ণ-ভাগবত ও দেবী-ভাগবত। তন্মধ্যে দেবীভাগবতকেই মহাভাগবত পুরাণ বলা হইয়া থাকে।

কবির পরিচয় :—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামে কবির বাস ছিল। তাঁহার পিতামহের নাম যাদবেন্দ্র, এবং পিতার নাম বারাণসী বসু। গ্রন্থরচনার সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদীশের পার্ব্বতীচরণ ও কুমুদাচরণ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিল। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভগবতী (চরণ), এবং কনিষ্ঠের নাম উৎপল। অপর্ণা, অম্বিকা, অভয়া ও অমলা নাম্নী তাঁহার

কন্যাগণের উল্লেখও কবি করিয়াছেন। তন্মধ্যে অম্বিকা ও অভয়ার চন্দ্রকান্ত ও অম্বিকাচরণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল।[১]

গ্রন্থ-রচনার সময় :—গ্রন্থরচনার সময় সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

গ্রন্থ-সমাপ্তির কহি দিন নিরূপণ।
পূর্ব্ব সমুদ্রের গর্ভে শশার গমন ॥
পশ্চিম জলধিপৃষ্ঠে শোভে বিন্দুগিরি।
দক্ষিণাস্থে বুদ্ধিমান বুঝিবে বিচারি ॥

১। মেদিনীপুর জেলা মধ্যে সরঙ্গ (?) পরগণা।
পিঙ্গলা নামেতে গ্রাম খ্যাত সর্ব্বজনা ॥
পিঙ্গলাক্ষী রূপে দেবী তথা অধিষ্ঠান।

* * * *

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বসুর নন্দন।
পিতামহ যাদবেন্দ্র শিব-পরায়ণ ॥
বারাণসী বসু পিতা...............।
জগদীশ নামেতে কনিষ্ঠ সহোদর।
তাঁহার গুণের কথা কহিতে বিস্তর ॥
উপস্থিত ভায়া জগদীশের নন্দন।
পার্ব্বতীচরণ আর কুমুদাচরণ ॥
..................মমাত্মজদ্বয়।
উৎপল কনিষ্ঠ ভগবতী জ্যেষ্ঠ হয় ॥
...............হৈতে পঞ্চম লৈয়া।
অথবা অপর্ণা আর অম্বিকা অভয়া ॥
কনিষ্ঠা কন্যার নাম অমলা সুন্দরী।
ইতিমধ্যে অম্বিকা অভয়া বিবাহিতা ॥
চন্দ্রকান্ত অম্বিকাচরণ দ্বি জামাতা ॥

সা-প-পু, ৭৯৯, পৃঃ ২২৮

শকের নির্ণয় এই বৎসরান্ত মাসে।
সুরগুরু বাসরেতে মাসান্ত দিবসে॥
সিতপক্ষে জানকীনাথের নবমীতে।
রচনা হইল সাঙ্গ প্রথম যামেতে॥

সা-প-পু, ৭৯৯, পৃঃ ২২৯

ইহা হেঁয়ালীরূপে লিখিত হইলেও অর্থগ্রহণ করা কষ্টকর নহে। প্রথমে "দক্ষিণাস্তে বুদ্ধিমান বুঝিবে বিচারি" ইহার অর্থ এই যে, দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া শকের বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বদিগ থাকে বামে, এবং পশ্চিম দিক থাকে দক্ষিণে। পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বপ্রান্ত (পূর্ব্ব সমুদ্র) হইতে শশী উত্থিত হয়। তিথি গণনায় পূর্ণিমা পঞ্চদশ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে, অতএব অঙ্কের বাম দিকের ১৫ সংখ্যা পাওয়া গেল। ইহার দক্ষিণে (অর্থাৎ পশ্চিম সাগরে) বিন্দু অর্থে শূন্য, এবং গিরি অর্থে সাত সংখ্যা লিখিলে ১৫০৭ শক পাওয়া যায়। ইহার চৈত্র মাসের শেষ দিনে বৃহস্পতিবার রাম-নবমী তিথিতে গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে গ্রন্থরচনার সময় ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়, অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পরিচয় :—নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণ ব্যাসশিষ্য সূতকে অনুরোধ করিলেন—

আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্ব্বসারাৎসার।
কহিবে তাঁহার কথা করিয়া বিস্তার॥

দেবী ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েই শৌনকাদির প্রশ্নে সূত কর্ত্তৃক "ভগবতীমাহাত্ম্যপরিপূর্ণ পবিত্র পঞ্চম পুরাণ ভাগবতই" বর্ণিত হইয়াছে। তখন সূত বলিলেন—

যেই কথা পূর্ব্বে শিব নারদে কহিলা।
মহা গুহ্য মহাভাগবত প্রকাশিলা॥

সেই কথা ভগবান ব্যাস মহামুনি।
জৈমিনীরে শ্রদ্ধা করি কহিলা আপনি॥
তোমাদের অগ্রে তাহা করি নিবেদন।
অতি গোপনীয় শাস্ত্র শুন দিয়া মন॥

সা-প-পু, ৮০১, ৫ পৃঃ

মন্দরপর্ব্বতে দেবগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে নারদ শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি আর ব্রহ্মাবিষ্ণু এই তিন জন।
ত্রিজগতে তোমা সভে করে আরাধন॥
ভক্তি মুক্তি প্রদায়ক তোমরা সে জানি।
তোমাদের আরাধ্য কে আশ্চর্য্য কাহিনী॥
করহ কঠিন তপ কাহার উদ্দেশে।
তোমাদের দেবতা কে কহিবে বিশেষে॥ ঐ, পৃঃ ৯

তখন শিব বলিলেন—

শিব বলে শুনহ নারদ তপোধন।
এই যুগ পূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥
নাহি ছিল সোম সূর্য্য তারকাদিগণ।
অহোরাত্রি নাহি ছিল দিগনিরূপণ॥
শব্দ স্পর্শ আদি অন্ত তেজ বিবর্জ্জিত।
একা তিনি ছিলা জিনি অতি বেদাতীত॥
ওঁকার তৎসৎ রূপে বেদে বলে যারে।
তিঁহ চিদানন্দরূপে আছিলা সংসারে॥ ঐ, পৃঃ ১১

তৎপর তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনা হওয়াতে তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির উদ্ভব হইল। পরমা প্রকৃতি তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিবার আদেশ

প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ধ্যানে নিরত হইলেন। তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য দেবী ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ভীত হইলেন, কিন্তু শিব ধ্যানযোগে সকল অবগত হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিলেন। তখন দেবী পত্নীরূপে শিবকে, সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মাকে, এবং লক্ষ্মী, স্বরস্বতীরূপে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিলেন। ইহার পরে সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইল। তৎপর এই গ্রন্থে শিবের বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি, তারকাসুর বধ, এবং রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি বর্ণিত রহিয়াছে। প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের উৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, মধ্যখণ্ড দ্রষ্টব্য)।

কবি ত্রিলোচন তর্করত্ন নামক এক পণ্ডিতের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

ত্রিলোচন তর্করত্ন গ্রন্থ-অর্থ করি যত্ন
উপদেশ করেন প্রদান।
শ্রীকৈলাস বসুদাস ভাষাতে করে প্রকাশ
মহাভাগবত সে পুরাণ॥ ঐ, ২ পৃঃ

এই গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বশেষে ইহার উল্লেখ করা হইল।

পরবর্ত্তীকালে রাধারমণ মিত্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যছন্দে রচিত এই পুরাণের এক অনুবাদ ১২৯৯ সালে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে কৈলাস বসুর গ্রন্থই উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়। পূর্ব্ববর্ণিত নারদের প্রশ্নে শিবের উত্তর এই গ্রন্থে এইভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর জানি আপনি দেবতা।
ভক্তিভরে আরাধয়ে সকল দেবতা॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই তিনের ভজনা।
আপনি করেন প্রভু কার উপাসনা॥ ৪ পৃঃ

ইহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, মিত্র মহাশয় আদর্শ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও কৈলাস বসুর ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অদ্ভুত রামায়ণের ন্যায় বসু মহাশয়ের মহাভাগবত আক্ষরিক অনুবাদ নহে, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ মাত্র।

ভবিষ্যপুরাণের অনুবাদ

বিশ্বকোষে ভবিষ্যপুরাণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"এই ভবিষ্যপুরাণ লইয়া ভারী গোল। আমরা চারি প্রকার ভবিষ্যপুরাণ পাইয়াছি। এই চারি-খানিতেই ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন লক্ষণ লক্ষিত হয়। ভবিষ্যে প্রথমেই এইরূপ পর্ব্ব-বিভাগের কথা আছে—

প্রথমং কথ্যতে ব্রাহ্মং দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবং স্মৃতম্।
তৃতীয়ং শৈবমাখ্যাতং চতুর্থং ত্বষ্ট্রমুচ্যতে॥
পঞ্চমং প্রতিসর্গাখ্যং সর্ব্বলোকৈঃ সুপূজিতম্।
এতানি তাত পর্ব্বাণি লক্ষণানি নিবোধ মে॥"

অন্যত্র—"নারদপুরাণের অনুক্রম অনুসারে ভবিষ্য পাঁচ পর্ব্বে বিভক্ত—ব্রহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও প্রতিসর্গ পর্ব্ব। প্রথম ভবিষ্যের (বিশ্বকোষে উদ্ধৃত) কেবল ব্রাহ্মপর্ব্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, এই পুথিতে আর চারি পর্ব্ব নাই। দ্বিতীয় ভবিষ্যে অষ্টমীকল্প হইতেই বিষ্ণুপর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইলেও এই পর্ব্বে বিশেষরূপে রুদ্রমাহাত্ম্য বর্ণিত থাকায় ইহার সহিত শৈবপর্ব্বও সম্মিলিত হইয়াছে বোধ হয়॥" অতএব ভবিষ্যের বৈষ্ণব পর্ব্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমরা চেষ্টা করিয়াও ইহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবিষ্যপুরাণের অনুবাদরূপে প্রচারিত যে দুইখানি অতি ক্ষুদ্র পুথি সংরক্ষিত রহিয়াছে, তাহাদের বর্ণিত বিষয় বৈষ্ণব পর্ব্বের

অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। আদর্শ পুথির অপ্রাপ্তিতে আমরা ইহাদের মূল-রূপের সন্ধান করিতে পারি নাই। তথাপি যেভাবে আমরা ইহা পাইয়াছি তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

ভবিষ্যপুরাণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সং—৩১৬৬, পত্র সংখ্যা ৭, অসম্পূর্ণ। ভণিতায় কবি-চন্দ্রের নাম পাওয়া যায়, যথা—

ভবিষ্য পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।

এই ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ পুথিতে কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্রাহ্মণ দ্বাদশীর পারণার জন্য যশোমতীর গৃহে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ তিনবার অন্নাদি রন্ধন করিয়া যখন আপন ইষ্টদেবকে নিবেদন করিতেছিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সেই অন্ন ভোজন করেন। ইহার পরেই পুথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের আখ্যায়িকাতেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। ইহা এই সকল সংস্কৃত পুরাণাদি-বর্ণিত ঘটনার অনুকরণ বলিয়াই বোধ হয়।

এই পুঁথিতে শুকদেব বক্তা, এবং শৌনকাদি মুনিগণ শ্রোতা। নন্দের গৃহে ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন—

ব্রাহ্মণ বলেন রাণি আছি উপবাসি।
পারণা করাহ কালি গেছে একাদশি ॥
বাসনা করিআ য়্যালাম তোমার মন্দিরে।
পুণ্যবতী ভোজন করাহ রাণি মোরে ॥

রাণী পা ধুইবার জন্য শীতল জল দিলেন। স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। তৎপর রন্ধনাদি শেষ করিয়া নিবেদন করিয়া দেখিলেন—

চেয়্যা দেখে অন্ন খায় যশোদা-নন্দন ॥

তখন ব্রাহ্মণ— যশোদা যশোদা বলি উচ্চস্বরে ডাকে।
ঝাট আইস প্রমাদ হইল প্রায় মোকে ॥

তখন বিপ্র বলিলেন—

বিপ্র বলে পরাণা করালি ভাল মোরে।
ছেল্যা ঠেকাইয়্যা তুমি বোস্যা থাক ঘরে॥

রাণী নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কৃষ্ণের হাত ধরিলেন। ইত্যাদি

দ্বিতীয় পুথি

পুথির ক্রমিক সংখ্যা—১৮০৯। পত্র সংখ্যা—১—৪ সম্পূর্ণ। কবির নাম নাই। নকলের তারিখ ১০৬১ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম পুথি হইতে এই পুথিখানি প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়।

হরগৌরীর কথোপকথন-ব্যপদেশে পুথিখানি লিখিত হইয়াছে—

শিব প্রতি গৌরী কহে এ সত্য বচন।

পুথির বর্ণিত বিষয় হিংসার তুল্য পাপ নাই, অতএব পশু বধ করা অনুচিত। ছাগ বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ, যথা—

জে জন বিক্রয় করে জে করে ছেদন।
হত্যাকারী সঙ্গে তার নরকে গমন॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে বাক্য হিংসা বড় পাপ।
তাহার অধিক পাপ জেবা কাটে ছাগ॥
দেখেন কৌতুক ভাবে তাহা জত জন।
একত্রে সকল জায় নরক ভুবন॥ ইত্যাদি

ইহাতে অন্য কোন বিষয়ের অবতারণা নাই।

বরাহ-পুরাণ

দ্বিজ তিলকরামের বরাহসংহিতা বরাহপুরাণের ছায়া অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। কবি বোধ হয় মদনমোহন বিগ্রহের পূজারী ছিলেন, যথা—

প্রথমে বন্দিব রাধা মদনমোহন।
যাঁহার সমান নাহি পতিতপাবন॥
সর্ব্বগুণহীন দেখি মোরে দয়া কৈলা।
পূজারী করিয়া মোরে পদছায়া দিলা॥

ইহার পরে গ্রন্থারম্ভে—

পূর্ব্বে পৃথ্বী হরিয়া অসুরে নিয়া গেল।
পৃথ্বী বিনা দেখি ব্রহ্মা ব্যাকুল হইল॥
তবে ব্রহ্মা ধ্যান কৈলা শ্রীবিষ্ণুচরণে।
লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু জানিলা তখনে॥
অন্তরীক্ষে থাকি বিষ্ণু কহে রহ রহ।
ব্রহ্মার নাসিকা হৈতে হইলা বরাহ॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্ব দেব করে নানা স্তুতি।
পৃথিবী আনিয়া দেহ করি যে বসতি॥

দেবগণের প্রার্থনায় বরাহ পাতালপুরে যাইয়া হিরণাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিলেন।

ক্রোধ করি ভগবান দুই হাতে ধরি।
দন্তাঘাতে অসুরের প্রাণ নিলা হরি॥
দৈত্যকে মারিয়া প্রভু সানন্দিত মনে।
পৃথিবী তুলিয়া নিলা আপন দশনে॥

বরাহপুরাণে দন্তের উপরে অবস্থিত পৃথিবীর প্রশ্নে বরাহ কর্ত্তৃক বিবিধ তত্ত্ব ও আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য পুথি ইহারই ছায়া অবলম্বনে রচিত। ইহা বরাহপুরাণের অনুবাদ নহে, জয়নারায়ণ ঘোষাল যেমন কাশীখণ্ডের প্রত্যেক শ্লোকের ভাবানুবাদ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেইভাবেও এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বরাহপুরাণের কোন কোন অধ্যায় অবলম্বনে সংক্ষেপে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার পরবর্ত্তী অংশে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরা-লীলাই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

সেই সিংহাসনে আছে বাসুদেবরূপ।
জগতের গুরু তিঁহো কৃষ্ণের স্বরূপ॥
তিন গুণাতীত সর্ব্ব কারণের কারণ।
ইন্দ্রনীল ঘনশ্যাম তাহারই বরণ॥
কুটিল কুন্তল শোভে অতি সে সুন্দর।
কমল নয়ান তিঁহো অতি মনোহর॥
মকর কুণ্ডল দোলে দুই শ্রুতিমূলে।
তার কান্তি শোভা করে শ্রীগণ্ড যুগলে॥
চতুর্ভুজ মহাতেজোময় নারায়ণ।
পরম পুরুষ জ্যোতি রূপ সনাতন॥ ইত্যাদি

১৭ পত্র

মথুরা-বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

এই বার বন হয়ে মথুরামণ্ডলে।
তাহা দেখে ভাদ্রমাসে অতি কুতূহলে॥
যমুনার পশ্চিমেতে সপ্তবন হয়ে।
আর পঞ্চবন পূর্ব্ব ভাগেতে রহয়ে॥

একে একে কহি শুন বনের সব কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে ভবদুঃখব্যথা ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথি।
তাল কুমুদবন দেখি মধুবনে স্থিতি ॥ ইত্যাদি

—ঐ, ৩ পত্র

বরাহপুরাণের ১৫৩শ অধ্যায় হইতে ইহার অনুরূপ শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল—

তেন দৃষ্ট্বা পুরী রম্যা বাসবস্য পুরী যথা।
তীর্থৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥
রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
তং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥
একাদশী শুক্লপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে তথা
তস্যাং স্নাতো নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥
যমুনায়াঃ পরো পারে দেবনামপি দুর্লভম্ ॥
অস্তি ভদ্রবণং নাম ষষ্ঠং বনমনুত্তমম্ ॥ (২৯-৩১, ৩৭ শ্লোক)

গ্রন্থশেষে লিখিত আছে—

শ্রীমদন গোপাল আগে আজ্ঞা যে মাগিয়া।
শ্রীবরাহসংহিতা কহি পয়ার করিয়া ॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের পায়ে সহস্র প্রণাম।
শ্রীবরাহসংহিতা কহে দ্বিজ তিলকরাম ॥

একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য

একাদশীর জন্মবিবরণ :—ভগবান জগৎসৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের শাসনের জন্য এক পাপ পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিহত্যা তাহার মস্তক, সুরা-পান নয়ন, সুবর্ণহরণ বদন, গোহত্যা বাহু, সুহৃদ্বধ উদর, স্মরণাগত হত্যা নাভি

ইত্যাদি। এইভাবে পৃথিবীর যাবতীয় পাপকার্য্যের সমষ্টিতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছিল। তাহার প্রভাবে মানবগণ মোহবশতঃ নানাপ্রকার পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যমপুরীতে অশেষ দুঃখ ভোগ করিত। একদা ভগবান বিষ্ণু যমপুরী পরিদর্শনে গমন করেন। তথায় পাপিগণের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদের দুঃখমোচনার্থে করুণাবশতঃ তিনি স্বয়ং একাদশীতে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং পাপিগণকে একাদশীব্রত করাইয়া পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতে জগতে একাদশীব্রত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই ব্রত করিয়া মানবমাত্রেই বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে দেখিয়া ঐ পাপপুরুষ বিষ্ণুর নিকট নিজের মনোদুঃখ নিবেদন করেন। ইহার প্রতীকারে বিষ্ণু এই ব্যবস্থা করিলেন যে, একাদশী তিথিতে পাপপুরুষ অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। যাহারা ঐ তিথিতে অন্নভোজন করিবে তাহারাই পাপপুরুষের প্রভাবাধীন হইবে। অতএব একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

ব্রতবিধি :—দশমীযুক্ত একাদশীতে ব্রত করিলে মহাপাতক হয়। দশমীতে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া একাদশী দিনে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, এবং হরির পূজা ও নৃত্যগীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া দ্বাদশীতে একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিলে বিধিমত ব্রতপালন করা হইয়া থাকে (পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসার—২২শ অধ্যায়)।

উপাখ্যান :—পুরাকালে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম চন্দ্রাবতী। উভয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া একাদশী ব্রত পালন করিতেন। এইরূপ এক একাদশীর রাত্রিতে রাজা রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই অপরাধে তিনি পরজন্মে গৃধ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। রাণী চন্দ্রাবতী বিরাট রাজার কন্যা-রূপে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বশে জাতিস্মর হইয়াছিলেন। অতএব তিনি নিয়মিত একাদশীব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিরাট রাজা তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু কন্যা বলিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বস্বামী

গৃধ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তিনি ঐ গৃধ্রকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। অবশেষে ঐ গৃধ্রের সহিতই কন্যার বিবাহ হইল। নিজের একাদশীব্রতের ফল ঐ গৃধ্রকে অর্পণ করাতে উভয়ে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

বিদিশানগরীর অধিপতি রুক্মাঙ্গদ নামে এক রাজা ছিলেন,তাঁহার মহিষীর নাম সন্ধ্যাবতী। উভয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া একাদশীর ব্রত পালন করিতেন। তাঁহাদের রাজ্যমধ্যে পশুপক্ষীও একাদশীর দিনে উপবাস করিত, এমন কি কোনও শিশু জন্মগ্রহণ করিলেও একাদশীর দিনে স্তন্যপান পর্য্যন্ত করিত না। এইজন্য এইরাজ্যে যমের অধিকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে যম বিষাদিত হইয়া নারদের পরামর্শে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। পরে ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মোহিনী-নাম্নী এক দিব্যাঙ্গনার সৃষ্টি করেন। নারদ এই মোহিনীকে লইয়া দণ্ডকারণ্যে যাইয়া উপস্থিত হন, এবং রুক্মাঙ্গদকে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা জ্ঞাপন করেন। ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া রুক্মাঙ্গদ পুত্র ধর্মাঙ্গদের উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করেন, এবং মোহিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। সেই সময়ে মোহিনী তাঁহকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে যে, তাহার কথা কখনও অবহেলা না করিলে সে রুক্মাঙ্গদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। রুক্মাঙ্গদ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মোহিনীকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর এক হরিবাসর-দিনে মোহিনী রাজাকে একাদশীব্রত পালন করিতে নিষেধ করিলে রাজা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অধোবদনে অবস্থান করিতে থাকেন। সেই সময়ে পুত্র ধর্মাঙ্গদ আসিয়া পিতার বিষাদের কারণ অবগত হন, এবং মাতা সন্ধ্যারাণীর নিকটে যাইয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যারাণী আসিয়া মোহিনীকে অনুনয় বিনয় করিলে মোহিনী বলিল যে, রাজা নিজহস্তে সন্ধ্যা অথবা তাহার পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে সম্মত হইলে সে তাঁহাকে একাদশী-

ব্রত পালন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে। রাণী এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত নিজের মস্তক প্রদান করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু ধর্মাঙ্গদের অনুরোধে অবশেষে পুত্রের মস্তক ছেদন করাই স্থিরীকৃত হয়। রাজা যথারীতি স্নানদান সমাপণ করিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পরমপদ প্রদান করেন। (নারদীয় পুরাণ, উত্তরখণ্ড)

এইরূপ বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে অনেক কবি একাদশীব্রত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত আখ্যায়িকার স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮৪১ সংখ্যক পুঁথি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

প্রারম্ভ—

হর প্রতি জিজ্ঞাসা করিলা হৈমবতী।
ব্রতমাহাত্ম্য কথা কহ পশুপতি ॥
কোন ব্রত শ্রেষ্ঠ হয় কহ দিগম্বর।
পার্ব্বতীর প্রতি তবে কহেন শঙ্কর ॥
একাদশী নামে ব্রত শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে।
নিষ্ঠা করি করিলে কি ভয় পুণ্যযুতে ॥
শুন প্রিয়া ব্রত-কথা কহিব তুমাতে।
রামায়ণে বাল্মীকি রচিলা বেদমতে ॥

এখানে রামায়ণের উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই আখ্যায়িকা রামায়ণে নাই। উক্ত পুঁথির শেষ ভাগে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীশ্রীনারদী-পুরাণে একাদশী-মহাত্ম্যে রুক্মাঙ্গদ-ব্রত-চরিত্রে কথনে একাদশী জন্ম বিবরণে" ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে নারদীয় পুরাণ অবলম্বনেই এই আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ উক্ত পুরাণের উত্তরভাগে রুক্মাঙ্গদরাজার উপাখ্যান

বর্ণিত রহিয়াছে। রাজার জন্ম অযোধ্যা নগরে। তিনি মহীসংযমের পুত্র এবং ত্রিসংযমের পৌত্র। সিন্ধুদেশের রাজার কন্যা সন্ধ্যাবতীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। রাজা দশমী তিথিতে এক সন্ধ্যা নিরামিষ হবিষ্যান্ন আহার করেন। একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করিয়া নৃত্যগীত এবং ভগবানের অর্চ্চনায় রাত্রিযাপন করেন। একাদশীর দিনে তাঁহার রাজ্যে পশুপক্ষীও নিরাহারে কালযাপন করে, এমনকি কেহ জন্মগ্রহণ করিলেও স্তন্য পান করে না। এই পুণ্যফলে সেই রাজ্যে যমের অধিকারপ লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইহাতে যম অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া নারদের পরামর্শে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন, তৎপর দেবগণের পরামর্শে ব্রহ্মা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে মোহিনী নাম্নী এক নারীর উদ্ভব হয়।

"দেবতা সকলে নাম থুইল মোহিনী।
নানা ভঙ্গে গীত গায় কামদেব জিনি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ ব্রহ্মা অচেতন।
বিষম মদন বাণে হরিল জীবন॥
একে সে মোহিনী তার প্রথম যৌবন।
কটাক্ষে মোহিতে পারে মহেশের মন॥
ক্রোধ করি দিল কন্যা বিধাতারে শাপ॥
পিতা হয়ে পাপাশয় চাহ কন্যা পানে।
অপূজিত হবে তুমি এ তিন ভুবনে॥
দুহিতার শাপে ব্রহ্মা হল অপূজনী।
অদ্যাপি ব্রহ্মার পূজা না হয় অবনী॥

মৃগয়া কারণে বনে আসিয়া রুক্মাঙ্গদ সেই কন্যার সাক্ষাৎ পান। তাহার রূপে বিমোহিত হইয়া তিনি এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, তিনি চিরদিন ঐ কন্যার

কথা প্রতিপালন করিবেন। এই সর্ত্তে কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একাদশীর দিনে কন্যা বলিলেন—

তপস্বীর ব্রত রাজা না করিহ আর।
বিশেষ যুবতী ভার্য্যা নিকটে তোমার॥

রাজা ইহা শুনিয়া প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া অবনত শিরে বসিয়া রহিলেন। সেই সময়ে রাজার মহিষী সন্ধ্যারাণী রাজাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ধ্যার প্রার্থনায় মোহিনী বলিল যে, সন্ধ্যার অথবা তাহার পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া দিলে তিনি রাজাকে একাদশী ব্রত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। অবশেষে রাজা পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ আবির্ভূত হইয়া রাজাকে বরদানে পরিতুষ্ট করেন। ইহার পরে এই গ্রন্থে অম্বরীষ রাজার আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিজ বাসুদেব রচিত একাদশী ব্রতের আখ্যায়িকার সন্ধান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬৩৫ সংখ্যক পুঁথিতেও পাওয়া যায়। এই পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট একাদশী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম চন্দ্রাবতী। রাজা পরম ধার্মিক। রাজা ও রাণী উভয়ে মিলিয়া একাদশীর উপবাস করিতেন। একদিন এইরূপ উপবাসের সময় রাণীর রূপে মোহিত হইয়া রাজা সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার ফলে তিনি গৃধ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। রাণী চন্দ্রাবতী বিরাটরাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জাতিস্মর হন। এই জন্য তিনি নিয়মিতভাবে একাদশীর উপবাস করিতেন। রাজকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হন। কিন্তু চন্দ্রাবতী তাঁহার পূর্ব্বস্বামী গৃধ্রকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে অসম্মত হন। অবশেষে গৃধ্রের সহিতই তাঁহার বিবাহ হইল। তখন স্বীয় একাদশীর পুণ্য ঐ গৃধ্রকে প্রদান

করাতে তাঁহারা উভয়ে দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। ইহার পরে এই পুঁথিতে রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

কবিচন্দ্রের নামে প্রচারিত আর একখানি পুঁথিতেও একাদশী-মাহাত্ম্য বর্ণিত রহিয়াছে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সং ৩৫৮১)। ইহাতেও চন্দ্রকেতু ও রুক্মাঙ্গদ রাজার উপাখ্যান বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়, আবার উক্ত উভয় পুথিতেই নারদীয় পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত মহীধর দাসের একাদশী-মাহাত্ম্য (বাঃ প্রাঃ পুঃ বিঃ ১—১,২১৭ পৃঃ) এবং শ্যামদাসের একাদশীর ব্রতকথা (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬, ৫০ পৃঃ) এবং শ্রীধরের একাদশীর পাঁচালী (শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গালা পুথির তালিকা, পৃঃ—২৩) প্রভৃতি গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

নারদীয় পুরাণের উত্তরভাগে যে রুক্মাঙ্গদ রাজার আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডের ১২শ অধ্যায়েও রুক্মাঙ্গদ রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বিদিশা নগরীর অধিপতি বলীর তনয়। তাঁহার পত্নীর নাম সন্ধ্যাবতী এবং পুত্রের নাম ধর্ম্মাঙ্গদ। গরুড় পুরাণের ১২৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই রুক্মাঙ্গদ একাদশীর উপবাস করিয়া মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন। অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অন্তর্গত কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ৫০শ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে। ভাগবতেও এই আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায় (ঐ, নবমস্কন্ধ, ৪—৫ অধ্যায়)।

উপরে কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের নামে প্রচারিত যে দুইখানি পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহাতে রচনা-সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। কৃত্তিবাসের পুথিতে আছে—

রূপে আলো করে কন্যা দেবতার পুরি।
কি দিআ গঢ়িলা বিধি আহা মরি মরি॥

চাহনি কেবল যেন খঞ্জনের পারা।
বদন মণ্ডল যেন পূর্ণ সোল কলা॥
কাকলি অত্যন্ত খিন মুষ্টিতে লুকাঅ।
বচন অমৃত তুল্য পিযূসের প্রাঅ॥
দেবতা সকল নাম থুইল মোহিনি।
নানাভঙ্গে গিত গাঅ কামদেব জিনি॥
দেখিআ কন্তার রূপ ব্রহ্মা অচেতন।
বিসম মদন-বাণে হরিল জিবন॥
একে সে মোহিনি তাহে প্রথম জৌবন।
কটাক্ষে মোহিতে পারে মহেশের মন॥
বিরহে ব্যাকুল ব্রহ্মা দেখিআ মোহিনি।
আলিঙ্গন দিতে চাঅ পসারিআ পানি॥

(ঐ, ৪ পৃঃ)

আর কবিচন্দ্রের পুথিতে আছে—

রূপে আলো করে কন্যা দেবতার পুরি।
কি দিআ গঢ়িল কন্যা আহা মরি মরি॥
চাহনি কেবলমাত্র খঞ্জনের রেখা।
বদন-মণ্ডল পূর্ণ রাহু দিল দেখা॥
কাকলিও অতি খিন মুটিতে লুকায়।
বচন অমৃত তুল্য মোহন সভায়॥
দেবগণ থুল্য নাম বলিআ মোহিনি।
আলিঙ্গন দিতে চাহে পসারিআ পানি॥

(ঐ, ৬ পত্র)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাসের পুথিতেই অধিকতর বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে, কিন্তু কবিচন্দ্রের পুথিতে তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইজন্য কবিচন্দ্রকেই অনুকরণকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আবার কৃত্তিবাস এই পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও বোধ হয় না। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার নামে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে।

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের ২৩৩—২৩৬ম অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মহর্ষি নারদ মর্ত্ত্যলোকে মানবগণের দুঃখ দেখিয়া নারায়ণের নিকটে ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইলেন। নারায়ণ বলিলেন, "এই কলিকালে স্বল্পায়াসে এক ব্রত উদ্যাপন করিয়া মানবগণ এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। এই ব্রতের নাম সত্যনারায়ণ ব্রত। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা দ্বারা ইহলোকে সুখভোগ এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হয়। ব্রত করিবার নিয়ম এই :—মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া যে কোনও দিনে এই ব্রত করিতে পারে, কিন্তু প্রদোষ সময়েই সত্যনারায়ণ দেবের পূজা প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণ সহ এই ব্রত আচরণ করিতে হয়। নৈবেদ্য উত্তম ভক্ষ্যযুক্ত হইবে, এবং ইহার পরিমাণ হইবে সপাদ। রম্ভাফল, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূমচূর্ণ অথবা তণ্ডুল চূর্ণ, শর্করা অথবা গুড় একত্র করিয়া নিবেদন করিতে হয়। তাহার পর স্বজনগণের সহিত কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমে দ্বিজগণ এবং পরে বন্ধুগণ ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ ভক্ষণ করিবে। এইরূপে ব্রত করিলে নিশ্চিয়ই মানবের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" ভূতলে এই ব্রত কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল এখন তাহাই বর্ণিত হইতেছে—কাশীপুর গ্রামে এক নির্ধন বিপ্র বাস করিতেন। এক দিন তিনি ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে নারায়ণ দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া বিপ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি কোথায় যাইতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্র বলিলেন—তিনি অতি দরিদ্র, তাই ভিক্ষার্থে বহির্গত হইয়াছেন।

তখন দ্বিজরূপী নারায়ণ তাঁহাকে সত্যনারায়ণ ব্রত করিবার উপদেশ প্রদান করেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পরে ঐ বিপ্র প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিপ্র এইরূপে ব্রত পালন করিতেছিলেন এমন সময়ে এক দিন এক কাঠুরিয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্রত করিলে অভীষ্ট লাভ হয়, ইহা জানিতে পারিয়া ঐ কাঠুরিয়া ব্রত করিবার সংকল্প করে, এবং সেই দিন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ মূল্য প্রাপ্ত হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সেই কাঠুরিয়া সত্যনারায়ণ ব্রত করিয়া প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে উল্কামুখ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ভদ্রশীলা। উভয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া নদীতীরে সত্যনারায়ণের ব্রত করিতেন। একদিন এক সদাগর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রার্থনা করিল যে, তাহার সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে এই ব্রত পালন করিবে। ইহার কিছু দিন পরে তাহার এক রূপলাবণ্যবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সদাগর পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই ব্রত পালন করে নাই, এই অপরাধে সত্যনারায়ণ তাহাকে কিছু দুঃখ প্রদানের সঙ্কলন করেন। জামাতা সহিত সদাগর বাণিজ্যে গমন করে। তাহারা চন্দ্রকেতু নামক এক রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন জনৈক তস্কর ঐ রাজার ধন চুরি করিয়া পলাইবার সময়ে সদাগরের বাসস্থানের নিকটে সেই ধন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে রাজপুরুষেরা সন্দেহবশে ঐ সদাগর এবং তাহার জামাতাকে বন্দী করিয়া রাখে। এদিকে সাধুর স্ত্রী ও কন্যা বিষম দারিদ্র্যে পতিত হয়। একদিন কোনও প্রতিবেশীকে সত্যনারায়ণের ব্রত করিতে দেখিয়া মাতা ও কন্যা ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সত্যনারায়ণ চন্দ্রকেতুকে স্বপ্নে আদেশ প্রদান করেন— "সদাগর ও তাহার জামাতাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি দ্বিগুণিত করিয়া প্রদান কর।" এইরূপে মুক্ত হইয়া সদাগর সত্যনারায়ণের

পূজা করিয়া জামাতাসহ নিজ দেশাভিমুখে যাত্রা করে। পথি মধ্যে নারায়ণ এক দণ্ডী সন্ন্যাসীরূপে সদাগরে নিকটে আসিয়া নৌকাতে কি আছে তাহা জানিতে চাহেন। সদাগর অবজ্ঞাভরে বলিলেন যে, নৌকাতে লতাপাতা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নৌকা লতাপাতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে জামাতার পরামর্শে সেই দণ্ডীর নিকটে যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে পুনরায় তাহার নৌকা পূর্ব্বসম্পদে পরিপূর্ণ হয়। ইহার পরে সে নিজের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সদাগরের স্ত্রী ও কন্যা সত্যনারায়ণের পূজা করিতেছিল। সাধু দেশে আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া কন্যা প্রসাদ ফেলিয়াই নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হয়। এই অপরাধে জামাতাসহ নৌকা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। তৎপর ইহারা আক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে দৈববাণী হয় যে, কন্যা যদি পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করে তাহা হইলে জামাতাসহ তরী পুনরায় উত্থিত হইবে। কন্যা তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলে জামাতার সহিত নৌকা উত্থিত হইল। ইহার পরে বংশধ্বজ নামক রাজার আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি অবহেলা করিয়া প্রসাদ পরিত্যাগ করাতে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।

অনেক কবি এই সকল আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে কবির পাঁচালী আমরা প্রথম জীবনে পাঠ করিয়াছি, তাহার প্রারম্ভ এইরূপ—

বন্দনার পরে কবি লিখিয়াছেন—

কলির মোচন যদি কৈলা নারায়ণ।
কর জোড়ে জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডব নন্দন॥
কহ কহ নারায়ণ প্রভু গুণনিধি।
কলিঅবতার যোগে কৈলা কোন বিধি॥

দুষ্টকলি-অবতারে মনে লাগে ভয়।
কহ কহ নারায়ণ কৃষ্ণ মহাশয়॥
কিরূপে হইবে সৃষ্টি কেমত প্রকার।
করিবেক কোন ধর্ম কিরূপ আচার॥
নৃপতি সকলে কোন্ ধর্ম আচরিবে।
পৃথিবীতে প্রজালোকে কিরূপে বঞ্চিবে॥ ইত্যাদি

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের প্রথমখণ্ডের প্রথম সংখ্যার ৬০ পৃষ্ঠায় সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত ইহা উদ্ধৃত রহিয়াছে।

এই কবির নাম দ্বিজ রঘুনাথ, যথা—
দ্বিজরঘুনাথে কহে শুন সভাগণ।
লাচাড়ী প্রবন্ধে কিছু কহিমু কথন॥

ভণিতান্তরে যে রামকৃষ্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহা পরবর্ত্তী সংযোজনা বলিয়াই বোধ হয়। যাহাই হউক ইহার পরে দরিদ্রব্রাহ্মণ, কাঠুরিয়া এবং সাধু ও তাহার জামাতার কাহিনী (স্কন্দপুরাণ অনুসরণে) এই গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু বংশধ্বংজ রাজার আখ্যায়িকা কোন পুথিতেই পাওয়া যায় না। সত্যনারায়ণের পূজা এইরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই সত্যনারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হইয়াছেন। হিন্দুমুসলমানের মিলন-সমস্যা এখন সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই এই সমস্যা সমাধানের এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রচিত পাঁচালীতে ইহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের পাঁচালীর প্রারম্ভ এইরূপ—

সত্যনারাণ পদ করিয়া বন্দন।
ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম যত সুরগণ॥
কলিকালে নারায়ণ পূজার কারণ।
হইলেন আবির্ভূত মরত ভুবন॥

দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক মথুরায় ছিল।
না দেখে সুখের মুখ দুঃখে কাল গেল ॥
একদা ব্রাহ্মণ সেই ভ্রমিয়া নগর।
ভিক্ষা না পাইয়া কিছু হইয়া কাতর ॥
তরুতলে বসিলেন বিষণ্ণ বদনে।
রোদন করেন কত দুঃখ ভাবি মনে ॥
কৃপালু হইয়া চিত্তে সত্যনারায়ণ।
ফকিরের রূপ ধরি দিলা দরশন ॥

এইখানে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ পরিহার করিয়া নারায়ণ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছেন। তৎপর—

ফকির কহেন বিপ্র যাহ নিজপুর।
আমারে অর্চ্চিলে হবে সব কষ্টদূর ॥
বিপ্র কহে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ।
তাহা বিনা না করি ম্লেচ্ছ আচরণ ॥
ফকির বলেন হাসি শুন বিপ্রবর।
বেদ বা কোরাণ কিছু নহে মতান্তর ॥
যেই রাম সেই রহিম, নাম একই হয়।
ত্রিলোকে নাহিক দুই কহিনু নিশ্চয় ॥
কহিতে কহিতে কথা অখিলের নাথ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মে শোভে চারি হাত ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এখানে কবি রাম রহিমকে অভিন্ন করিয়া ভগবানকে ফকিরে পরিণত করিলেও তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণই রহিয়া গিয়াছেন। যে বিভেদ এখন মহারথিগণকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে, তাহা দূরীভূত করিবার এক অতি সহজে পন্থা এইরূপে

উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহার পরে কাঠুরিয়া ও সদাগরের আখ্যায়িকাই এই গ্রন্থে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়। অতএব ইহাতেও স্কন্দপুরাণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিজরামেশ্বর ইহা হইতেও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমেই বন্দনার অংশে রহিয়াছে—

অতঃপর বন্দিনু রহিমরামরূপ।
স্বরগের নাথ বন্দ ভুবনের ভূপ॥
কোরাণ কেতাব আর কলমা সংহতি।
স্মরিয়া পীরের পায় করিনু প্রণতি॥
ফণীন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে।
সেই সত্যপীরে বন্দি ভক্তি সহকারে॥

অতএব এখানে প্রস্তাবনাতেই নারায়ণ সত্যপীর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তারপর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকটে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—

কপটে করুণাময় দ্বিজ-পাশে গিয়া।
কহে মুই ভুকা হোয় লাগে মেরা দোয়া॥
তোঞি বাবা বাম্ভর ধর্ম্ম দেখ তুঝে।
মেঞি ভুক ফকির খিলাও কুছু মুঝে॥
তামাম দুনিয়া হেরি সবি ইমান ঝুটা।
কিছু কভি খয়রাত না করে এক মুঠা॥ ইত্যাদি

পীরের ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের আখ্যায়িকা মূলতঃ স্কন্দপুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইলেও কবি প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য পুরাণ হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, যথা—

কলির মহিমা সাধু শুন শুন বলি।
পরীক্ষিত পতনেতে প্রবল যে কলি॥

একদিন পরীক্ষিত যিনি নরনাথ।
মৃগয়াতে কলিক্রীড়া দেখেন সাক্ষাৎ॥
গোরূপ হয়েছে ধর্ম্ম কলি হৈল নর।
নির্ঘাত প্রহার করে গোধন উপর॥
তিন পদ ভেঙ্গে গেছে এক পদ উবু।
সেই পায়ে প্রহারিছে দুষ্ট কলি তবু॥
অসি ধরি কাটিবারে যায় মহাবল।
ব্যঙ্গ হয়ে বলে কলি হাসে খল খল॥ ইত্যাদি

এই ঘটনা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ১৬-১৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে। তারপর কলিকালের ফলশ্রুতি, যথা—

এখন দমনকারী পরীক্ষিত নাই।
ধর্ম্ম নাশি ভ্রমে কলি ভুমে ঠাঁই ঠাঁই॥
সুজনের নিন্দা সদা, দুর্জ্জনের যশ।
বাপে মায়ে তুচ্ছ জ্ঞান, বনিতার বশ॥
পুত্র পিতা সদা দ্বন্দ্ব নাহি স্নেহ ভাব।
শাশুড়ী-বধূতে দ্বন্দ্ব সতীনের ভাব॥ ইত্যাদি

ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায় হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল পুরাণের প্রভাব বর্ত্তমান থাকাতেও সত্য-নারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ কল্পনা-বলে নব নব ঘটনারও সন্নিবেশ করিয়াছেন, যেমন বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত একখানি পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৭৭ নং পুথি) আছে—

(দরিদ্র ব্রাহ্মণ সত্যপীরের পূজা করিলে—)
কেহ বলে সন্ধা গায়ত্রী গেল ঘুসজিয়া (?)।
মাথা মুড়াইয়া মুখে দাড়ি রাখ গিয়া॥

একজন বলে জদি দেখাইবে মোরে।
সিরিণি খাইয়া তবে হাত মুছি শিরে॥
পরিহাস করিয়া বলিছে আর জন।
সত্যপীর সত্য জদি জানিব এখন॥
এক ঘরে বিষ্ণুশর্ম্মারে ভরিয়া।
দেহ ত আগুন তাহে, যাউক জ্বলিয়া॥

অবশেষে তাহাই করা হইল, কিন্তু ঘর ভস্মসাৎ হইলেও সত্যপীরের অনুগ্রহে বিষ্ণুশর্ম্মার গায়ের একগাছি লোমও পুড়িল না! অতঃপর কবি বলিতেছেন—

এত দূরে আদি কথা হইল তামাম।
সবে লহ সত্যপীর সাহেবের নাম॥
নিয়ত হাসিল সত্যপীরের কালাম।
কহে বিদ্যাপতি করি হাজার সেলাম॥

এই সকল পুথিতে সত্যনারায়ণকে সত্যপীরে পরিণত করা হইলেও ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে তিনখানি পুথি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার একখানিতেও এই পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র বন্দনার পরে এইভাবে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন—

কলিযুগে সত্য সত্য সত্যনারায়ণ।
সেবিলে সকল সিদ্ধি শুন সর্ব্বজন॥
নারায়ণ নামে নর নরক এড়ায়।
যেই নামে অজামীল তরিল হেলায়॥
শির্নি দিয়া সেবে যেই সেই দীননাথে।
দুঃখ-পারাবার তার খণ্ডে অচিরাতে॥

এখানে শির্নি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সং-ক্ষীর—ফা°-শীর হইতে শির্নি, শর্করামিশ্রিত নৈবেদ্য অর্থে। এইভাবে নৈবেদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ স্কন্দপুরাণেও

রহিয়াছে। বিশেষতঃ মুসলমানগণের আগমনের বহু পরে এই গ্রন্থ রচিত হওয়াতে ইহাতে ফার্সী ভাষার প্রভাব পড়া বিচিত্র নহে। যাহাই হউক, সত্যনারায়ণ যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকটে প্রথমে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার বাস দ্বারিকাভুবন, নাম হরিশর্ম্মা, পত্নীর নাম প্রভাবতী। এই সকল নাম স্কন্দপুরাণে নাই। অনেক কবিই আখ্যায়িকা-বর্ণনায় এইরূপ কাল্পনিক নামের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাই হউক, ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে নারায়ণ যে মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন, তাহার বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

কলিযুগে সত্য আমি সত্যনারায়ণ।
আজি তুষ্ট তুষিব তোমারে দিয়ে ধন॥
বলিতে বলিতে বসুদেবের তনুজ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হৈল চতুর্ভুজ॥
কিরীট কুণ্ডলহার শোভে পীতবাস।
তরুণ তমাল জিনি তিমির প্রকাশ॥

ইহাও নারায়ণের বর্ণনা। যাঁহারা পীরের পাঁচালী লিখিয়াছেন তাঁহারাও পীরকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই পরিণত করিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে হিন্দুর দেবতার সহিত মুসলমানের পীরের সংমিশ্রণ হইয়াছে। অযোধ্যারামের গ্রন্থে ইহার পরে কাঠুরিয়া ও সদাগরের কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। দ্বিজ রামভদ্রের পুথি বন্দনার পরে এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে,—

অবধানে সভাজনে শুন একচিতে।
সত্যনারায়ণ নাম হইল যেই মতে॥
হস্তিনাপুরেতে পুর পাণ্ডব ভূপতি।
একদিন যুধিষ্ঠির গোবিন্দ সংহতি॥

বিরলে বসিয়া বহু করে আলাপন।
করপুটে যুধিষ্ঠির করে নিবেদন॥
কলিকাল আরম্ভ কম্পিত কলেবর।
কি হবে জীবের গতি কহ গদাধর॥

উত্তরে তিনি বলিলেন যে, কলিকালে জীবের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি অবন্তী নগরে যাইয়া অবতীর্ণ হইবেন।

হেনকালে শুন কিছু অপূর্ব্ব কথন।
অবন্তিনগরে অবতীর্ণ নারায়ণ॥
সত্যনারায়ণ নাম হইল ভুবনে।
দেশে দেশে প্রচার হইল দিনে দিনে॥

ইহার পরে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া দরিদ্র বিপ্রকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং পরে ঐ ব্রাহ্মণের নিকটে কাঠুরিয়াগণ, এবং কাঠুরিয়াদের নিকটে সদাগর সত্যনারায়ণের পূজার বিধি অবগত হন। এই ভাবে পূজা ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যধামে প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিজ বিশ্বেশ্বর রচিত সত্যনারায়ণের পুথিতেও এই সকল আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব এই তিনখানি পুথিতে সত্যনারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হন নাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় আর একখানি পুথির সন্ধান মিলিতেছে শিবচন্দ্র সেনের রচনায়।

তাঁহার বংশধরগণ এখন আমাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া কবির সত্যনারায়ণের পুথির সারমর্ম্ম সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত হইল। প্রারম্ভ এইরূপ—

একদিন নারায়ণ যুধিষ্ঠির সাতে।
মহারঙ্গে বন্ধুসঙ্গে পুরী হস্তিনাতে॥

নানা মতে কৌতুকেতে আছে গদাধর।
মনে পৈল কলি রৈল বলীর নগর॥
দ্বাপরের অন্তে তার রাজ্য-প্রাপ্তি হবে।
ভাবি মনে নারায়ণে কহিছে পাণ্ডবে॥
চল ভূপ অপরূপ শুনিতে সুশ্রাব।
বলী-পাশ ইতিহাস ধর্ম্মের প্রস্তাব॥

এই উদ্দেশ্যে দুইজনে বলীর নিকটে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে—

দেখিতেছেন সেইস্থানে দুইয়ের বিবাদ॥
এক চাষা অতি খাসা ক্ষেত করে চাষ।
স্বর্ণভাণ্ড খণ্ড খণ্ড তাহাতে প্রকাশ॥
পেয়ে ধন সেই জন ব্রাহ্মণেতে কয়।
তব ভূমে মোর শ্রমে ধন লভ্য হয়॥
নেও ধন নিকেতন ঠাকুর গোসাই।
বিপ্র বলে মুর্খ-মেলে আর ঠেকি নাই॥
পেয়েছিস্ তুই দিস্ মোরে কি কারণ।
আমি নিয়ে হব এর পাপের ভাজন॥ ইত্যাদি

ইহার পরে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় বলী কলিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহারা পুনরায় সেই ক্ষেতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন শুনিতে পাইলেন—

বিপ্র বলে কোন কালে হয়েছে এমন।
ক্ষেত মোর বিত্ত তোর কে কবে কখন॥
ওরে বেটা চাষা ঠেটা ধন মোরে দে।
চাষা বলে বাক্য ছলে তুই বেটা কে॥

খিচরামি কর তুমি ধন বুঝি পেলে।
ভাগ্য তোর হেথা মোর নাহি জ্যেষ্ঠ ছেলে॥

তখন নারায়ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, কলির প্রভাবে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ইহার পরে কলিকালের বিশেষত্ব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কাঠুরিয়া ও সদাগরের আখ্যায়িকা এই পুথিতে বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব এই গ্রন্থেও পীরের প্রভাব লক্ষিত হয় না। পরবর্ত্তীকালে সত্যনারায়ণ সত্যপীরে পরিণত হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন মুসলমান-রচিত সত্যপীরের পুথি এ পর্য্যন্ত একখানিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

অন্যান্য কবিগণ

১। শিবরাম (কঃ বিঃ পুথি সং ৩৮১০)
২। বিজয় ঠাকুর (ঐ, ৫২২১)
৩। দ্বিজ হরিদাস (ঐ, ৫২২৭)
৪। কৃষ্ণবিহারী (ঐ, ৫৯২৩)
৫। বল্লভ দাস (ঐ, ৩৪৯৮)
৬। দৈবকীনন্দন (ঐ, ৪৯৬৩)
৭। গঙ্গারাম (ঐ, ৪৯৬৫)
৮। ফকিররাম (ঐ, ৩৩৬২)
৯। ভারতচন্দ্র (বা-প্রা-পু-বি, ১—১, পৃঃ ২১৯)
১০। দীনহীন দাস (ঐ, পৃঃ ২৪৩)
১১। কবি জনার্দ্দন (ঐ, ১—২, পৃঃ ৬১—৬২)
১২। অমর সিংহ (ঐ, ২—১, পৃঃ ৪৯)
১৩। দ্বিজরামচন্দ্র (ঐ, পৃঃ ১৪)

১৪। নিকুঞ্জ চক্রবর্ত্তী (ঐ, পৃঃ ১৪—১৫)

১৫। বিকল চট্ট (ঐ, পৃঃ ৩১)

১৬। নয়নানন্দ (বঃ সাঃ পঃ প, ৪, পৃঃ ৩১)

১৭। নরহরি (ঐ, পৃঃ ৩৪০)

১৮। ভৈরব ঘটক (ঐ, ১৩, পৃঃ ৫৭—৬০)

১৯। মধুসূদন (ঐ, পৃঃ ৫৭—৬০)

২০। দ্বিজ কালিদাস (ঐ, পৃঃ ৫৭—৬০)

২১। জয়মুনি (শ্রীহট্টের সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গলা পুথির তালিকা, পৃঃ ১০)

২২। দ্বিজ রামকৃষ্ণ (ঐ)

২৩। মনোহর সেন (ঐ, পৃঃ ৬)

২৪। কুমুদানন্দ দত্ত (ঐ, পৃঃ ২৭)

তুলসী-মাহাত্ম্য

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ত্রয়োদশ হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তুলসী-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও তুলসী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মধ্বজ রাজার ঔরসে তৎপত্নী মাধবীর গর্ভে তুলসীর জন্ম হয়। রূপে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন বলিয়া তুলসী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। জন্মের পরেই তিনি তপস্যার জন্য বনে গমন করেন, এবং নারায়ণকে স্বামিরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি কঠোর তপে রত হন। তাঁহার তপে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা আসিয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে, তিনি নারায়ণকেই পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বর প্রদান না করিয়া বলিলেন, "রাধার শাপে সুদামা গোপ শঙ্খচূড় হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি

এখন তাঁহার পত্নীত্ব স্বীকার কর, পরে নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে পারিবে।" ইহার পরে শঙ্খচূড়ের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। তুলসী রাধার অংশসম্ভূতা এবং প্রিয়তমা সখী ছিলেন। একদিন রাসে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিবার কালে তিনি মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে রাধা আসিয়া ক্রোধবশে তাঁহাকে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন। তাহারই ফলে ধর্ম্মধ্বজের কন্যারূপে তুলসী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করাতে সুদামা গোপ রাধাকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রোধান্বিতা হইয়া রাধা সুদামাকে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন। ইহারই ফলে শঙ্খচূড়রূপে দৈত্যকুলে তিনি আবির্ভূত হন। তুলসীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। কিন্তু শঙ্খচূড় দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার প্রতীকারকল্পে দেবগণ যাইয়া বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হন। তুলসীর সতীত্বের বলে শঙ্খচূড় প্রতাপশালী হইয়াছে জানিতে পারিয়া নারায়ণ তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবার সিদ্ধান্ত করেন, এবং শঙ্খচূড়ের বিনাশের জন্য মহাদেবকে এক শূল প্রদান করেন। শঙ্খচূড়ের এক অক্ষয় কবচও ছিল। যুদ্ধের সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে নারায়ণ তাহা প্রার্থনা করিয়া হস্তগত করেন, এবং সেই কবচ পরিধান করিয়া শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করতঃ তুলসীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হন। স্বামী যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া তুলসী অতিশয় আনন্দিত হন, এবং এই সুযোগে নারায়ণ তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। তুলসী এই প্রতারণার বিষয় জানিতে পারিয়া নারায়ণকে পাষাণ হইবার অভিশাপ প্রদান করেন, এবং নারায়ণও তুলসীকে বৃক্ষে পরিণত হইবার প্রত্যভিশাপ দেন। ইহার ফলে নারায়ণ গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলায়, এবং তুলসী বৃক্ষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তুলসীর স্বামী শঙ্খচূড় হত হইবার পরে সমুদ্রে যাইয়া শঙ্খরূপে পরিণত হন। শাস্ত্রের বিধি এই যে গৃহে শালগ্রাম শিলা, তুলসী ও শঙ্খ বর্ত্তমান থাকে তথায় স্বয়ং নারায়ণ বাস করেন।

তুলসীর মাহাত্ম্যসূচক দুইখানি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একখানি দ্বিজ ভগীরথ কৃত (ঐ, পুথি সং ৪৬০৬), এবং অপরটি দুর্গাদাস দত্ত রচিত (ঐ, পুথি সং ৩৪৬৫)। এই দুইখানি পুথির আখ্যায়িকা-অংশ প্রায় একই প্রকার। শঙ্খচূড়ের পত্নী তুলসী ছিলেন সতীশ্রেষ্ঠা। তাহারই তেজে শঙ্খ সর্ব্বত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন। দেবগণ পরাজিত হইলে তাঁহারা বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হন। তখন তিনি বলিলেন—

শঙ্খচূড়ের স্ত্রী আছে বৃন্দা নামে সতী ॥
তার সতীত্বের তেজে ত্রিভুবন জিনে।
সতীত্ব লঙ্ঘিলে পরাজয় হয় রণে ॥
বিষ্ণু বলেন যুক্তি করে চল দেবগণ।
করিব তাহায় আমি সতীত্ব লঙ্ঘন ॥

তৎপর—

যেই দেব কৈল মোর সতিত্ব লংঘন।
শিলারূপ হয়্যা সেই থাকুক এখন ॥
এত শুনি বিষ্ণু তখন মূর্ত্তিমান হয়্যা।
সম্পাত দিলেন তবে বৃন্দারে দেখিয়া ॥
বিষ্ণু বলেন মোরে শাপ দিলে বৃন্দা সতি।
আমি সাপ দিলু তুমি হও বৃক্ষ জাতি ॥
এত শুনি বৃন্দা সতি করেন ক্রন্দন।
এমত ব্যবহার কেন কৈলে নারায়ণ ॥
বিষ্ণু বলেন তোমার তেজে স্বামী তব তেজা।
অমরাবতি জিনিতে গেছেন ইন্দ্ররাজা ॥
সৃষ্টি নাশ করে সংখ তোমার কারণে।
অতেব সতিত্ব তব করিল লংঘনে ॥

বৃন্দা বলেন মোর পতির হব কিবা গতি।
কর প্রতিকার প্রভু দেব শ্রীপতি ॥
বিষ্ণু বলেন সংখাসুর সমুদ্রে জন্মিব।
তোমাতে আমাতে সংখে একত্র থাকিব ॥

ইহার পরে তুলসীর মাহাত্ম্য কবি দুর্গাদাস এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

একবার প্রদক্ষিণে যম কাঁপে ডরে।
দুইবার প্রদক্ষিণে বিষ্ণুলোকে তরে ॥
তিনবার প্রদক্ষিণে ভব ভয় পার।
চারবার প্রদক্ষিণে কুলের উদ্ধার ॥
পাঁচবার প্রদক্ষিণে শরীর নির্মল।
ছয় প্রদক্ষিণে পায় হরিপদতল ॥
সাতবার প্রদক্ষিণে বৈকুণ্ঠে গমন।
অষ্টবারের মহিমা না জানে নারায়ণ ॥ ইত্যাদি।

অক্রূরাগমন

কবি গুণরাজখান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সং-৩৫৪৭।

১ম পত্র—

রাজার বচনে অক্রুর ঘরকে আসিয়া।
কৌতুকে বঞ্চিলা নিসি হরষিত হয়া ॥
কালিত দেখিব গিয়া শ্রীমধুসূদন।
কোটি জনমের পাপ হবে বিমোচন ॥
পুলকে পূর্ণিত অক্রুর অশ্রু বহে ধারে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ শরণ করেন বারে বারে ॥

বড়ই বান্ধব মোর কংস নৃপবর।
তাহার প্রসাদে দেখিব দামোদর॥
নানা মনরথে অক্রুর রজনি বঞ্চিলা।
প্রভাতে উঠিয়া অক্রুর রথ সাজাইলা॥

ইহার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে (ঐ, ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তথাপি কোন কোন স্থানে কিছু পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

সভাবিদ্যমানে নন্দ এই কথা কয়।
সুনিল গোপিনী কৃষ্ণ মোথুরা-বিজয়॥
এ জায় উহার ঘর কহিতে বারতা।
কৃষ্ণ জাবেন মোথুরা পুরি শুনি এই কথা॥
অক্রুর আইল নিতে রামদামোদরে।
নন্দঘোষ কহিলেন সকল গোপেরে॥
এ বোল সুনিঞা সব গোপী অচেতন।
লাজ ভয় তিয়াগিয়া করেন রোদন। পুথির পাঠ

তুলনীয়—

এ বোল বলিল নন্দ সভা বিদ্যমানে।
সুনিল জুবতি কৃষ্ণ মথুরা গমনে॥
অচেতন হইল সকল গোপীগণ।
লাজ ভয় দুর করি জুড়িল ক্রন্দন॥

মুদ্রিতগ্রন্থ, ১৮৬ পৃঃ

মধ্যবর্ত্তী কয়েক পঙ্‌ক্তি মুদ্রিতগ্রন্থে বর্জ্জিত হইয়াছে। আবার স্থানে স্থানে নূতন সংযোজনারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তথাপি বলা যাইতে পারে যে অধিকাংশ স্থলেই রচনার মিল রহিয়াছে। কবিচন্দ্রের গ্রন্থের ন্যায় পয়ার ত্রিপদীতে পরিণত হয় নাই।

কবিচন্দ্রের অক্রূরাগমন

কবিচন্দ্রের অক্রূরাগমন ভাগবতামৃত বা শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই পালার অনেক পুথি সংগৃহীত রহিয়াছে। আমরা তুলনা করিয়া দেখিলাম যে, এই সকল পুথির রচনার সহিত মুদ্রিত পালার অধিকাংশ স্থলেই মিল নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইখানি পুথি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সং—৭৬৬

প্রারম্ভ—

অক্রূরে ডাকিয়া কংস কহে সবিনয়।
ভোজবংশে বৃষ্ণিবংশে তুমি হিতোদয়॥
মোর সখা প্রাণতুল্য তুমি জ্ঞানবান।
বৃন্দাবনে জাহ তুমি রামকৃষ্ণ স্থান॥

কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে আছে—

অক্রূরে বসায়ে কংস করিল সম্ভ্রম।
ভোজবৃষ্ণি বংশে তুমি বৈষ্ণব উত্তম॥
মম সখা প্রাণতুল্য তুমি জ্ঞানবান।
বৃন্দাবনে গিয়া তুমি রামকৃষ্ণে আন॥

ইহার পরে এই পয়ারের পরবর্তী অংশে কিছু মিল রহিয়াছে। ইহার পর ত্রিপদীর প্রারম্ভে পুথিতে আছে—

অক্রূর ভাবিয়া হরি রথে আরোহণ করি
শুভযোগে ব্রজপুরে যায়।

এবং শেষে—

অক্রূর গান্ধিনী সুত ভাবিতে ভাবিতে কত
প্রবেশ করিল বৃন্দাবনে।
সূর্য্য অস্ত হৈল প্রায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
গতি নাহি রামকৃষ্ণ বিনে ॥

আর মুদ্রিত গ্রন্থে আছে—

স্নান পূজা করি প্রাতেঃ অক্রূর চাপিয়া রথে
রামকৃষ্ণে আনিবারে যায়।

এবং শেষে—

পড়িব তাহার পায় হাতে ধরি যদুরায়
খুড়া বলে করিবেন কোলে।
যম হৈতে কিবা হয় এড়াব কালের ভয়
এ ভব তরিয়া যাব হেলে ॥

কিন্তু এই ত্রিপদীর মধ্যে মধ্যে রচনার কিছু কিছু মিল লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার পরেই পুথিতে ত্রিপদী ছন্দে যাহা রচিত হইয়াছে, মুদ্রিত গ্রন্থে তাহার ভাব মাত্র পয়ার ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

ভোজন করায়্যা তারে গোবিন্দ ... ...
সোআইআ পালঙ্ক উপরে।
প্রেমে অখিলের নাথ বুঝা নাহি যায় ভাব
অক্রূরে গোবিন্দ সেবা করে ॥ পুথি

তুলনীয়-

পালঙ্কে অক্রূর শুয়ে কৃষ্ণ জাঁকে পা।
চামর ধরিয়া বলরাম করে বা ॥ ইত্যাদি

মুদ্রিত গ্রন্থ

অথচ উদয় আদর্শেই পান্নুয়ার উল্লেখ করা কবিচন্দ্রের ভণিতা রহিয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে এই পালাতে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬৯ সং পুথি

ভণিতা—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ভাবি রোমাপতি।
সেগোর দক্ষিণ দিকে পান্নায় বসতি॥

অতএব কবিচন্দ্রের বিশেষত্ব সমন্বিত ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। অথচ এই পুথিতে একটিও ত্রিপদীতে রচিত ছন্দ নাই, এবং মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত রচনারও মিল নাই। পুথির প্রারম্ভ এইরূপ—

তবে রাজা অক্রূরেরে আনে ডাক দিয়া।
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই তরায় আন গিয়া॥
করিব ধনুক যজ্ঞ, করহ গমন।
এত শুনি অক্রুর হৈল আনন্দিত মন॥
রথ সাজাইয়া অক্রুর চলিল তরায়।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কার গোবিন্দের পায়॥

ইত্যাদি

পূর্ব্বোদ্ধৃত মুদ্রিত গ্রন্থের প্রারম্ভের সহিত এই রচনার মিল নাই, অথচ এই পালাটি কবিচন্দ্রের নামেই চলিয়া যাইতেছে। এই পুথির লিপিকাল ১১০৬ সন বা ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ। পরবর্ত্তী সংযোজনায় গ্রন্থ কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

অক্রূরাগমন

দ্বিজ মাধব রচিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সং—৯৭০

কংসের সভায় নারদ আসিয়া অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার পরামর্শ দিতেছেন—

ভক্তের অধিন কৃষ্ণ করুণা সাগর।
ভক্তের সহিত কৃষ্ণ থাকে নিরন্তর॥
অক্রুর মুনি ভক্ত বড় কৃষ্ণ-পরায়ণ।
তাহারে পাঠাইয়া দেহ গকুল ভুবন॥
জজ্ঞ আমন্ত্রণ কর গকুল নগর।
আমন্ত্রণ দিয়া কৃষ্ণ আনহ সত্বর॥
ব্রেজভুমি ছাড়ি কৃষ্ণ জদি আইসে এথা।
আপনার হাতে তুমি কাটিয় তার মাথা॥

অক্রূরাগমনের পরে কৃষ্ণ গোপনে রাধার মন্দিরে যাইয়া বলিতেছেন—

ছাড়িয়া না জাবে মোরে দুষ্ট কংসচর।
তোমারে ছাড়িয়া জাইব এহি দুঃখ মোর॥
মথুরাতে জাইয়া আমি ব্যাজ না করিব।
মারিয়া কংসেরে মাত্র এথায়ে আসিব॥
এহি কথা সুবদনি জখনে সুনিল।
আপন রিদয়ে রাই গণিতে লাগিল॥
কুকিলের স্বরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
জানিলাম প্রভু মোরে কর উপহাস॥

ব্রহ্মা সুরাসুর আদি কাপে জার ডরে।
দুষ্ট কংসের চরে তারে কি করিতে পারে॥

অক্রূর জলে নামিয়া স্নান করিবার কালে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুনি জলে দিল ডুব।
জলমধ্যে দেখে মুনি কৃষ্ণের স্বরূপ॥
মুনি বলে রামকৃষ্ণ জলে কি কারণ।
বুঝিতে না পারি আমি গোবিন্দের মন॥
উঠিয়া দেখিল কৃষ্ণ রথের উপর।
বিস্ময় হইল বড় মুনির অন্তর॥

দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলাম যে, এই রচনা সম্পূর্ণই নূতন। কৃষ্ণ যে গোপনে রাধার মন্দিরে গিয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনাও মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, দ্বিজ মাধব নামে অন্য এক কবি বর্ত্তমান ছিলেন।

অক্রূরাগমন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সং—৫৫৯১

কবির নাম হরিকৃষ্ণ বা হরিচরণ দাস, যথা—

শ্রীগোপাল পদদ্বন্দ্ব ভাবি মনে মনে।
অক্রূর গমন কথা হরিকৃষ্ণে ভণে॥

পৃঃ ৬

অন্যত্র— শ্রীগোপাল পদদ্বন্দ্ব ভাবি অনুক্ষণ।
হরিচরণ দাষ ভণে অক্রূর গমন॥

নারদ মুনি আসিয়া কংসকে ধনুর্যজ্ঞ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখন কংস অক্রূরকে আহ্বান করিয়া উপদেশ ছলে বলিতেছেন—

শুনিয়াছি পরদারে লোভী দুই জনে।
গোপাঙ্গনা আছে বহুত গোকুল ভুবনে ॥
অনেক সুন্দরি লঞা করে রঙ্গরস।
গোপাঙ্গনা নারি তার সব হয় বস ॥
নারি ছাড়া জদি তারা আসিতে না চায়।
সাবধানে শুন তার কহিএ উপায় ॥
মথুরা নাগরি সব রূপে বিদ্যাধরি।
জিতিন্দ্রিয় লোক জদি দেখে চক্ষু হেরি ॥
তা সভার মন হর্য়া লয় নারিগণে।
রস পরিহাস করে বসি একাসনে ॥
নন্দপুত্র দুইজনে শুনে জদি ইহা।
ক্ষেণে মাত্র অস্থির হইব নিজ দেহা ॥
তবে জদি বলে দোহে শুনি হেথা খাই।
নবনি ছাড়িয়া না জাব দুই ভাই ॥

তাহা হইলে বলিবে যে, কংসের ভাণ্ডারে প্রচুর মিষ্টান্ন আছে, অতএব তোমাদের কোন অভাব হইবে না। এই ভাবে নূতন পরিকল্পনার কিছু কিছু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

অক্রুরাগমন

ক: বি: পুথি সং—২১৪২

কবির নাম—চন্দ্রশেখর

রাজা কংসের সভায় নারদ মুনি আসিলে গোপনে উভয়ের পরামর্শ হইল। নারদ বলিলেন—

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ তুমি কর সমাবেশে।
এবং—উত্তম দূত পাঠাইয়া আন দুই ভাই।
এত বলি মুনিরাজ কৈল অন্তর্দ্ধান।

তখন—

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ আমি করিব এখন॥
কোন দূত জাবে কহো ব্রজের মাঝারে।

অবশেষে অক্রুরকে পাঠাইবার পরামর্শ স্থির হইলে কংস বলিলেন—

ব্রজের মাঝারে তুমি জাও দূত হঞা।
জত গোপালেরে আন শীঘ্র জাঞা॥
রামকৃষ্ণ আন গিঞা ভাগিনা আমার।
এবং বলিও যে—ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে মাতুল তোমার॥
অক্রুর—সন্ধ্যার সমএ আইলা নন্দের ভুবন॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠ হৈতে আসি।
আসিয়া দেখেন তবে অক্রুর আছে বসি॥

পরে দামামা বাজাইয়া রামকৃষ্ণের মথুরা গমনের সংবাদ ঘোষণা করা হইল। শুনিয়া গোপীগণ বিষাদিত হইলেন।

রাধা বলিলেন—

তুমি ছাড়ি গেলে মোর আর কেহ নাই।
পাথারেতে না ভাসাও শুনহে কানাই।

কৃষ্ণ বলিলেন—

ক্ষেণ এক তোমা ছাড়া রহিতে না পারি।
এতেক বিষাদ কেনে ভাবহ সুন্দরি॥

অক্রূর যমুনা স্নান করিবার কালে—

জলেতে ডুবিয়া দেখে কৃষ্ণবলরাম।

ভণিতা—শ্রীচন্দ্রশেখর কহে শুন বন্ধুগণ।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত কবিগণ-রচিত অক্রূরাগমনের পালাও পাওয়া গিয়াছে—

পঞ্চানন দাস—কঃ বিঃ ৪৩৪১ সং পুথি
রামচন্দ্র—এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।